এবং রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

পরিবেষক

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

নিউ দিল্লীর সুখ্যাত রহস্য স্রষ্টা

চিকু ও চেরী

এবং

বেনারসী রহস্যের বিখ্যাত গোয়েন্দা

সোনালি ও পিন্টু-কে

দাদু / জেঠু

সূচীপত্র

বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষ

এ তথ্য সর্বজনজ্ঞাত যে, বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রথিতযশা সাহিত্যিক বিহারের মাটিতে বসেই বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রতিভার ঐশ্বর্যে এবং রচনার প্রাচুর্যে এঁরা সকলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যস্মরণীয় নাম এবং এ বাবদে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পর্ধিত ঘোষণা "বাংলা সাহিত্যে বিহারীদের দান অবহেলা করার নয়। আমরা বিহার গ্রুপ যদি দল পাকিয়ে এক সঙ্গে স্ট্রাইক করি, তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, আমি, তার আগে শরৎ চাটুজ্যে এবং বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগলপুরের পর্বটার কথাও ভুলো না। আরও রয়েছেন—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী"[১] —আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-যজ্ঞে বিহারের এই দানটুকু পরোক্ষ। কিন্তু প্রত্যক্ষ দানটুকুও কিছু কম নয়। চৈতন্যদেব যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর শুধুমাত্র প্রেরণা-পুরুষ ছিলেন না, স্বয়ং সেই পদাবলীর বিষয়ীভূত হয়েছিলেন—কখনো মৃন্ময়রূপে, যেমন গৌরচন্দ্রিকায়, কখনো বা চিন্ময়রূপে, যেমন শ্রীরাধার রূপকল্পনায় ও ভাবসাধনায়, বিহারও ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যের শুধু সিদ্ধিক্ষেত্র নয়, সাধনক্ষেত্রও। বিহার বঙ্গভারতীর সাহিত্যযজ্ঞে শুধু ঋত্বিক দেয় নি, সমিধও দিয়েছে। ক্ষেত্র-বিশেষে মিস্ত্রী ও মালমশলা দুইই বিহারের। অবশ্য এর একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে। পৃথক রাজ্যরূপে ভারতবর্ষের মানচিত্রে বিহারের আবির্ভাব ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। তৎপূর্বে বিহার ছিল বৃহত্তর বাংলারই অংশ এবং স্বাভাবিক কারণেই বহু প্রথিতযশা বাঙালীর পদার্পণ ঘটেছিল এখানকার মাটিতে। এ বাবদে যাবতীয় তথ্য নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যক্ষ ডঃ নন্দদুলাল রায়ের পরিশ্রমনিষ্ঠ গবেষণার[২] কল্যাণে। কাজেই এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি। আমাদের পরিক্রমা কিঞ্চিৎ ভিন্নপথে। বাংলা সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিহারের মাটি ও মানুষের চিত্র দর্শন আমাদের অভীষ্ট। সবিনয়ে স্বীকার্য যে, আমাদের পরিক্রমা বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, অন্যান্য শাখায় আমরা পথ হাঁটিনি যদিও প্রয়োজনে উঁকি দিতে অবহেলা করিনি।

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাণপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাত ধরেই পরিক্রমা শুরু করা যেতে পারে। বিহারের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ ঐতিহাসিক এবং সেই ইতিহাসের সূত্রেই বিহারের বেশ কিছু জনপদ ও জাতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নিজেদের জায়গা দখল করে নিয়েছে। ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে যে অশ্বারোহী পুরুষের অশ্বক্ষুরধ্বনিতে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে অনন্ত সম্ভাবনাময় উৎসবের সূচনা, সেই অশ্বের গতিপথে বিহারের পাটনা এবং জাহানাবাদকে প্রত্যক্ষ করে পুলকিত হই।[৩] পাটনাকে আবার দেখি 'বিষবৃক্ষ' (১২৮০) উপন্যাসে। এ ছাড়া মুঙ্গের এবং রাজমহলকেও পাই যথাক্রমে 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬)।

বঙ্কিম সাহিত্যে শুধু পশ্চিমের মাটি নেই, মানুষও আছে এবং যথেষ্ট সংখ্যায়ই আছে। বিহারের ভোজপুর অঞ্চলের মানুষের শৌর্যবীর্যের স্বীকৃতি আছে 'সীতারাম' (১২৯৩) উপন্যাসে। রাজপুত এবং ভোজপুরী সৈন্যদের বাহুবলের খ্যাতি বিদেশী শাসকদের কাছে কতটা ভয়ের বস্তু ছিল তার প্রমাণ আছে ফৌজদারের ভীতিতে।

মিথিলা 'দ্বারবঙ্গ' হলেও এই ভোজপুরের মানুষেরাই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দ্বারপাল হয়ে আছেন সেই বঙ্কিমের যুগ থেকে। 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'সীতারাম' উপন্যাসে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। মানুষ যেখানে যায় সেখানে শুধু সে 'কপাল' টুকুই সঙ্গে নিয়ে যায় না, মুখের ভাষাটিকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। এই সুবাদে বাংলা কথাসাহিত্যে হিন্দী সংলাপ যুক্ত হয়েছে তার জন্মকাল থেকেই।

বিহারের ব্রাহ্মণদের সূক্ষ্ম জাতিভেদতত্ত্বের বাস্তবসম্মত বিবরণ পাই 'সীতারাম' উপন্যাসে—যেখানে পাঁচকড়ির মা মিশির দ্বারবানকে পাঁড়ে বলায় মিশিরজী রেগে গিয়ে বলেছেন, "হাম পাঁড়ে নেহি, হাম মিশর হোতে হেঁ।"

সুবিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যে বিহারের স্থান কিঞ্চিৎ স্বল্প বলেই মনে হয়। মাটি যদিবা আছে, মানুষজন বিরলদৃষ্ট—যদিও বিহারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই হিমালয় যাত্রার কাল থেকেই এবং বিহারের বেশ কিছু অঞ্চল সম্পর্কে কবির দৃষ্টি ও উপলব্ধি অবশ্যই ভালোলাগার ও ভালোবাসার। প্রয়োজনে তাঁর 'ছোটনাগপুর' প্রবন্ধটি পঠিতব্য। তাছাড়া মজফ্‌ফরপুর, সাঁওতাল পরগনা, হাজারীবাগ, গিরিডি ইত্যাদি স্থানগুলি তাঁর কাব্য-প্রবন্ধ-কথাসাহিত্যে বহুধা উল্লিখিত। তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসে লোহিত কঙ্করময় রাজমহলকে নিখুঁত-

ভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁর 'শেষকথা' গল্পে বসন্ত-মদির ছোটনাগপুরের প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পাই। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের আসরে বিহারের মানুষজনের অনুপস্থিতির বেদনা দূরীভূত হয় তাঁর কাব্যের প্রাঙ্গণে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে একটি সাঁওতাল কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে তার আশ্চর্য সরল জীবন ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে খাস সাঁওতাল পরগণার অরণ্যপটে। সেই সাঁওতাল কন্যার 'কালো গালে আলো করে' 'ক্যামেলিয়া' পেয়েছে তার কাম্য পরিণাম, কবিও হয়েছেন কৃতার্থ।

শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে ভাগলপুর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের পটভূমিকা বিহার, দ্বিতীয় পর্বেও বিহার অনুপস্থিত নয়। শ্রীকান্ত উপন্যাসে যে গঙ্গার বর্ণনা আছে সে গঙ্গা ভাগলপুরের এবং সেই বটগাছটি অদ্যাপি বর্তমান। শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ এবং কুমার সাহেব চরিত্র দুটি গড়ে উঠেছে ভাগলপুরের রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং মজফ্ফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহুর আদলে ও অনুকরণে। পাটনার নিকটবর্তী বাঢ়ের উল্লেখও এখানে পাই। পশ্চিমের মেয়েরা যে বাংলার মেয়েদের মতো শাঁখ বাজাতে পারে না সে কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। কথাটা সত্য। দ্বিতীয় পর্বে পূর্ণিয়ার জমিদারদের পরিচয় বাস্তবসম্মত। চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর স্মৃতিচারণায় মৈথিল রাজপুত্রের নিকট কন্যা বিক্রয়ের কথা আছে। 'দত্তা' উপন্যাসে বক্সারের উল্লেখ আছে, উপন্যাসের বেশ কিছুটা অংশ সাঁওতাল পরগনার পটভূমিকায় রচিত। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে 'ডিহরী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাস্থল। ডিহরীর শোনকেও এখানে লক্ষ্য করি। শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে দেওঘর একটি মধুর স্মৃতি, একটি স্মরণীয় নাম। শেষজীবনে অসুস্থ অবস্থায় শরৎচন্দ্র এখানে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘরেই যায়। শরৎ সাহিত্যে ভৃত্য এবং দারোয়ান জাতীয় চরিত্রগুলি, বেহারী এবং রতন ব্যতীত, সকলেই বিহারের মানুষ। বঙ্কিম সাহিত্যে বিহারের এই মানুষগুলির যেটুকু কলঙ্কের দাগ পাই শরৎ সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ অপসারিত। শরৎ সাহিত্যে এঁরা শৌর্যবীর্য, সেবাপরায়ণতা এবং প্রভুভক্তির নির্মল এবং নিরুপম নিদর্শন। পল্লীসমাজের ভজুয়া বা পথের দাবী'র অপূর্বর ব্রাহ্মণ তেওয়ারীর কথা এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে যিনি অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী সেই

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও (১৮৭৩-১৯৩২) বিহারের এই মানুষগুলিকে উপেক্ষা করেননি। তাঁর ছোটগল্পেই সর্বপ্রথম হিন্দী ও ভোজপুরী ভাষার সংলাপ শ্রবণ-গোচর হয়। 'নিষিদ্ধ ফল' গল্পের নায়ক হেমন্ত শুনেছে"—তাহাদের বাড়ীর মহাবীর সিং দুইজন দ্বারবানের সঙ্গে কনষ্টেবল বলিল, 'ভাগ গেলই কা?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদতে দেখলি হো, তোহর্ কির্।" তারপর " 'ধোগো হো পাকড়লি চোর' বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল, ধেক্রেম্নিকে-ই ত খালি লুগা বুঝাহে।"

বাংলা সাহিত্যে দাদামশাই নামে সমধিক পরিচিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯৪৯) শেষ জীবনে পূর্ণিয়াবাসী ছিলেন। 'আই হ্যাজ' উপন্যাসে তিনি বলেছেন, "পূর্ণিয়ার সঙ্গে আমার বিশ বছরের পরিচয়।" যোগাযোগ কিনা জানি না কিন্তু একথা উল্লেখ করতে উৎসাহ বোধ করছি, তাঁর 'আই হ্যাজ' উপন্যাসের যে সংস্করণটি (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬) আমার হাতের কাছে সেটি 'দি বিহার সাহিত্যভবন লিঃ' কর্তৃক প্রকাশিত। ঠিকানা অবশ্যই কলকাতার।

বিহারে অবস্থানকালে তাঁর দুটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল—'সন্ধ্যাশঙ্খ' (১৯৪০) এবং 'নমস্কারী' (১৯৪৪)। সন্ধ্যাশঙ্খের অন্তর্ভুক্ত 'ভোলানাথের উইল' গল্পটির ভূমিকায় ভাগলপুরের অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাস স্বল্প হলেও সুন্দর ও বাস্তব।

তাঁর 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫) উপন্যাসের পটভূমিকায় কাশীকে পাই কিছুটা কিন্তু বিহারকে পাই অনেকটা। বিহারের রেলযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন দাদামশাই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরেও তার সত্যতা সবিনয়ে স্বীকার করি। "বাজে খরচের বালাই নেই—ছড়া ঝাঁট পড়ে না। এ বছরের ছোলাভাজার খোসা আসছে বছর গাড়ীর মধ্যেই দেখতে পাবেন—কেউ ছোঁয় না—সত্যযুগ বললে হয়। মধ্যম শ্রেণীর সাদা ক্যাম্বিসের গদি (?) রদ হতে জানে না, ক্রমেই রং বদলাচ্ছে, আর ধূলায় কাদায় গতর গোচাচ্চে। ভক্তে খুঁজলে পাওয়ারী বাবার পায়ের ধুলো পর্যন্ত পেতে পারেন। জীবে দয়া যথেষ্ট—ছারপোকার ছত্র। গাড়ীগুলি প্রাচীন স্মৃতি-ভাণ্ডার বললে হয়, পরম সঞ্চয়ী, কিছু ফেলে না—সবই সযত্নে রক্ষা করে চলে।···কবে কোন্ এক হোলির দিন আনন্দোন্মত্ত যাত্রীরা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছিলেন, গাড়ীর ছালময় তার চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত হচ্চে। সেই ছালেই বড় বড় হরপের ছাপ্—'spit not' থুথু ফেল না।"

'আই হ্যাজ'-এ শুধু পূর্ণিয়া নেই, ছাপরা, কিষাণগঞ্জ, শোনপুর নওগাছিয়া, কাটিহার ইত্যাদিও আছে, ছাপরার চানা, ঘুগনি, দইবড়া, পুরি, লাড্ডু এবং 'দি গ্রেট মৈথিলী হোটেলে'র চিঁড়ে দইয়ের সুখ্যাতিও আছে। সেইসঙ্গে আছে বিহারের মানুষ এবং তাদের সঙ্গীতচর্চার পরিহাসস্নিগ্ধ বিবরণ।

এদেশের সঙ্গীতচর্চায় গলার জোরের প্রভাবটা যে কিঞ্চিৎ বেশী সে কথা শরৎচন্দ্রও বলেছেন। দাদামশাইয়ের আশঙ্কা—"আবার ভাগো যদি হোটেলে কোনো গাইয়ের আবির্ভাব হয় তাহলে এক বাগেশ্রীতেই অপঘাত। কি বুকের জোর! গান গায় যেন লাঠালাঠি করছে। বাঘ ভাল্লুকে তাড়া করলে প্রাণের জন্যেও অত চেঁচিয়ে কাকেও ডাকতে পারি না।"

গাড়ি ছাপরা ছাড়তেই যে মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক—তিনি কোর্টের উকীল, খাস বিহারের মানুষ। "দুদিন কোর্ট বন্ধ বারণীতে শিকারে চলেছেন, ও অঞ্চলে Games বহুৎ।" সঙ্গে বন্দুক। লেখকের মন্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—"বিহারে যার বাড়ীতে চাল আছে তার বন্দুকের চালও থাকা চাই, এটা সম্ভ্রমের সরঞ্জাম। কোথাও যেতে হলে অপ্রয়োজনেও বন্দুকের বাক্সটা সঙ্গে থাকা চাই এবং বলাও চাই—শিকারকা শওখ্। অবশ্য ব্যবহার হয় কেবল পাখীর আর মাছের প্রাণ নিতে, আর বিবাহের পটহ পীড়নে।"

ট্রেনে উকীলের সঙ্গে পেসকারও আছেন এবং তিনি এক টিন 'এম্পায়ার সিগারেট' নিয়ে মানিব্যাগ খুলে দাম দিয়েছেন। কেরানীবাবুকেও সেখানেই পাই একটা ফাউন্‌টেন পেন পছন্দ করে পেস্‌কার সায়েবকে বলেছেন "হর বখৎ সিয়াই উঠানেমে বড়া দিক্ লাগতা, ইয়ে বহুৎ আরাম দেতা…। পেস্‌কার বললেন, বে-শখ্।"

মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী (১৮৮২—১৯৫৮) দীর্ঘকাল মজফ্‌ফরপুরে বাস করলেও এবং অজস্র কাহিনী গল্প রচনা করলেও তাঁর রচনায় বিহার কিছুটা উপেক্ষিত বলেই মনে হয়। যেখানে আছে সেখানেও তা নেহাৎই অনুমানগম্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর 'উল্কা' (১৩২২) উপন্যাসের পটভূমিকা পাটনা হলেও এখানকার মাটি বা মানুষের পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য একটি "হৃষ্টপুষ্ট পাটনায়ে গাই ড্যাবডেবে চোক" মেলে তাকিয়ে আছে। আর আছে প্রবাসী বাঙালীর গোত্রান্তর প্রাপ্তির কথা। শৈলেনের বন্ধু মণ্টু-বাবুর মুখে চুমো খেলে সে কাঁদ কাঁদ মুখে বাপের কাছে নালিশ শুরু করে দিল—"বাবা, কাকাজী হামকো জুঠা কর দিয়া।"

শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একাধিক গল্প লিখেছিলেন বিহারের অর্ধশিক্ষিত অহঙ্কারী মানুষজনদের নিয়ে। এমনি দশটি গল্পের সঙ্কলন 'বেহারচিত্র' (প্রথম খণ্ড, ১৯২১)। এই গল্পগুলিতে বিহারের এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি ব্যঙ্গ যথেষ্টই আছে, তবে এ বাবদে লেখকের 'নিবেদনটুকু অবশ্যই স্মরণীয়। গ্রন্থের 'নিবেদনে' লেখক বলেছেন, "যখন এই চিত্রগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল[৪] তখন কোন কোন পাঠক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, আমি এই সকল চিত্রে বেহারী চরিত্রের কেবল অন্ধকার অংশমাত্র চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরা পুরুষানুক্রমে বেহার-নিবাসী। বেহার আমাদের মাতৃভূমিতে পরিণত।" শেষোক্ত কথাগুলি এখানকার বঙ্গভাষী মানুষের প্রাণের কথা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে বিহারের প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্য ও অন্তরঙ্গ সহাবস্থান। বিহারের মাটি ও মানুষের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় গভীর ও গূঢ়। তাঁর 'পথের পাঁচালী'র শুধু রচনাস্থলরূপে নয়, নির্মাণ-শিল্পের নেপথ্যেও ভাগলপুরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এখানের এক গ্রাম্য কিশোরীই দুর্গার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর উপন্যাসে। বস্তুত ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, ছোটনাগপুর—বিহারের এইসব অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষের কথাই বিভূতিভুষণের কথাসাহিত্যে উজ্জ্বল ও উজাগর। 'আরণ্যক' উপন্যাসে লবটুলিয়া, বইহার এবং আজমাবাদের অরণ্যপ্রকৃতি এবং আরণ্যক মানুষ অপূর্বভাবেই উপস্থাপিত। চিত্রে ও চরিত্রে 'আরণ্যক' আগাগোড়া বিহারের। "সভ্য জগতের চলাচল যেখানে কম, সভ্যজগতের আলো যেখানে অজ্ঞাত, পথ যেখানে জঙ্গলাকীর্ণ, জীবন যেখানে পশ্চাৎমুখী, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' সেখানকার স্মৃতির ধারক।"[৫] কুন্তা, নক্‌ছেদী ভকত, ধাওতাল সাহু, গনোরী তেওয়ারী, দোবরু পান্না, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে ইত্যাদি মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানুষের বর্ণময় মিছিলে সেই অজ্ঞাত-পথটি আলোকিত হয়েছে অপরূপ রূপে ও রঙে।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে ভাগলপুরের মাটি ও মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি কিন্তু তাদের মুখের ভাষা কর্ণগোচর করার সুযোগ পাইনি। সেই অপূর্ণতা দূর হয়েছে বনফুলের কল্যাণে। বনফুলের জীবনে ও সাহিত্যে ভাগলপুর এক অসামান্য মহিমায় বিরাজমান। তাঁর একাধিক উপন্যাসে বিহারের মাটি

আর মানুষের বুকের ভাণ্ডার ও মুখের ভাষার নিরুপম দৃষ্টান্ত এবং নির্ভুল উচ্চারণ দৃষ্ট ও শ্রুত। 'দ্বৈরথ', 'মৃগয়া', 'উদয়অস্ত', 'ভুবন সোম', 'অধিকলাল,' 'ডানা', 'হাটেবাজারে' ইত্যাদি উপন্যাসগুলির কথা এই সূত্রে স্মরণীয়।

'ভুবন সোম' উপন্যাসের পটভূমি সাহেবগঞ্জের গঙ্গার তীর। সোম সাহেবের দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে আমরা এই অঞ্চলের মাটির পথ হাঁটি, এই অঞ্চলের মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ উত্তাপ অনুভব করি।

প্রবাসী বাঙ্গালীর বা বঙ্গভাষী বিহারীদের গোত্রান্তর গ্রহণের যে ইতিবৃত্ত উপন্যাসটিতে আছে তার সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ। সোম সাহেব যথার্থ লক্ষ্য করেছেন যে, আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েই হেঁট হয়ে গুরুজনদের প্রণাম করে না। অনেকে 'কুড়ুলে পেন্নাম' করে। কেউ কেউ বিহারীদের নকল করে 'নমস্তে' বলতে শিখেছে, কেউ কেউ আবার 'জয়হিন্দ'। 'রাম রাম' শোনেননি এখনও কারও মুখে।"

এই উপন্যাসে বিহারের বেশ কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। তন্মধ্যে একজন 'ছপ্পর দেওয়া' গাড়ির চালক ভুট্টা। "ভুট্টার জন্ম নাকি ভুট্টা ক্ষেতেই হয়েছিল, ওর আসন্ন প্রসবা মা তখন ভুট্টা কাটছিল। ভুট্টাকে প্রসব করে সেই ক্ষেতেই মৃত্যু হয় ওর মায়ের। ওর মাসী তখন ওকে 'গোদ' নেয়, অর্থাৎ পোষ্যপুত্র হিসাবে মানুষ করতে থাকে। তারপর ওর 'মৌসা' অর্থাৎ মেসো যখন মারা গেল তখন ভুট্টার বাবা তার বিধবা শালীকেই বিয়ে করে ফেলল।" ভুট্টা খেতে ভালোবাসে 'বুটরো সাততু' অর্থাৎ বুটের ছাতু, ভাতের চেয়ে 'রোটি'র প্রতিই তার আকর্ষণ বেশী। তরকারীর মধ্যে প্রিয় 'করেলা', 'আলু পরবল' সে পছন্দ করে কিনা জানতে চাইলে তার উত্তর "হাঁ উসব কি কুছ কুছ। মগর করেলারো ছোকা পেয়াজরো সাথ, বুডি আচ্ছা ছে।"

বিহারের সাধারণ মানুষের প্রভুভক্তি ও বিশ্বাসপরায়ণতার কাহিনী বাংলা কথাসাহিত্য তার জন্মকাল থেকেই শুনে ও শুনিয়ে আসছে। 'ভুবন সোম'-এর ভুট্টা এ বাবদে নবতম সংযোজন এবং অবশ্যই প্রশংসনীয় সংযোজন।

এই উপন্যাসে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে বিদিয়া নামে একটি কিশোরী মেয়ে। বিদিয়ার বাবা চতুর্ভুজ গোপ। তিনি জাতিতে গয়লা কিন্তু গলায় পৈতে। তিনি রোজ ভোর তিনটেয় উঠে হাঁসবার যান, আবার দুপুরে বাড়িতে এসে খান। খেয়ে আবার যান, ফিরে আসেন রাত দশটায়। হাঁসবার

তাঁর বাড়ি থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে। তাঁর ভোজনের বহর দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ভুবন সোম। "আধ সের চিঁড়ে তো হবেই, তার সঙ্গে প্রায় সের-খানেক দই, পোয়াটাক গুড়, আর গোটা ছয়েক কলা, দেখতে দেখতে নিঃশেষ করে ফেললে চতুর্ভুজ। তারপর আলগোছে এক ঘটি জল খেয়ে সুদীর্ঘ ঢেকুর তুললে একটি।" তারপর তিনি তৈরী হলেন আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটার জন্য। মহিষের চামড়ার তৈরী নাগরা জুতো পরে বাইরে চালের বাতায় গোঁজা ছিল সে দুটি, আর প্রকাণ্ড একটা তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করে চতুর্ভুজ গোপ বেরিয়ে গেল।" এই চতুর্ভুজ গোপ এবং তাঁর দুরন্ত কিশোরী কন্যা বিদিয়া এই উপন্যাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, বাংলা কথাসাহিত্যের অমূল্য সঞ্চয়।

'ভুবন সোম' উপন্যাসে বিহারের কিছু পশু পক্ষীকেও পাই। 'বিহালিয়া' মোষ বা "Breeding Buffalo" শুধু লেখকের পথরোধ করেনি উপন্যাসের গতিপথকেও বদলে দিয়েছে। এছাড়া আছে 'ভরথা' অর্থাৎ ভরদ্বাজ পাখী যে পাখী ভুট্টার ভাষায় "গহমকা খেতো পর খোতা বানাই করিকে আন্‌ডা পারৈছে অর্থাৎ গমের ক্ষেতে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এ ছাড়া আছে নীলকন্‌ঠ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ, ধোবিন' অর্থাৎ খঞ্জন এবং 'খোকনা'—এক রকম বাজ পাখী যে "মরা পাখী দেখলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়।"

বিহারের এক অখ্যাত গ্রামের দরিদ্র অন্ত্যজ দোসাদ পরিবারের ছেলে অধিকলাল মল্ল 'অধিকলাল' (১৩১৩) উপন্যাসটির শিরোনাম। উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে নিম্নবর্ণের মানুষের লাঞ্ছনার চিত্রও এখানে পাই।

বনফুলের গল্পগুলিতেও বিহারের মাটি ও মানুষকে বারে বারেই প্রত্যক্ষ করি। 'মণিহারী' গল্পগ্রন্থে মণিহারীর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। তাঁর 'অধরা' গল্পের পটভূমিকা কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ক্রোশ দুই দূরের এক নির্জন বালির চরে।

বাংলা কথাসাহিত্যে অঙ্গিকা ভাষা অর্থাৎ ছিকা-ছেকি উপভাষা শ্রুত হয়েছে বনফুলের কল্যাণেই। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে নিজেদের ভাষায় কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষাসম্পদ বৃদ্ধির পথ সুগম করে দিয়েছেন। উদাহরণের মহাভারত সঙ্কলন করে লাভ নেই তবে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। বনফুল, সতীনাথ বা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠক মাত্রেই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এখানে শিল্পী এবং শিল্প-উপকরণ দুইই বিহারের, শিল্পটুকু শুধু বাংলার। এ যেন বিহারের চালচিত্রে বিহারেরই প্রতিমা, পুরোহিতও বিহার,

শুধু প্রতিমায় প্রাণ দান করা হয়েছে বাংলার মন্ত্রে। রাজনৈতিক মানচিত্রে বিহার বাংলার প্রতিবেশী, সাহিত্যিক মানচিত্রে বিহার বাংলার একান্ত আপন মনের মানুষ, ঘরের লোক।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যেও বিহারকে পাই নানারূপে ও নানাভাবে। তাঁর 'রোমান্স' (১৩৪৭) গল্পের পটভূমিকা ছোটনাগপুরের এক অখ্যাত স্টেশন। 'অষ্টমে মঙ্গল' (১৩৬১) গল্পে বিহারের এক গ্রামের চিত্র পাই। মংলু মুশহরের পত্নীপ্রীতির চিত্র বাস্তব ও সজীব। 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাসে এদেশের মানুষের বাঙালী-বিদ্বেষের কথা একটুখানি আছে।

শরৎচন্দ্র এবং বনফুল যেমন ভাগলপুর গোষ্ঠীর দুই গোষ্ঠীপতি, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তেমনি পূর্ণিয়া ও দ্বারভাঙ্গা দলের দুই দিকপাল। এঁদের কাহিনীর পটভূমিকায় পূর্ণিয়া ও দ্বারভাঙ্গার মাটি ও মানুষের একচ্ছত্র অধিকার।

সতীনাথ ভাদুড়ীর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'জাগরী' ভাগলপুর জেলে (১৯৪২-৪৪) এবং পূর্ণিয়ার পটভূমিকায় রচিত। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পূর্ণিয়া-প্রবাসী একটি বাঙালী পরিবারের কাহিনীর মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বিহারের নানা শ্রেণী ও বৃত্তির মানুষ—ভূমিহার ব্রাহ্মণের ঘরের কিশোরী মেয়ে, 'রাষ্ট্র গগনকী দিব্বিয় জিয়োতী'—জেলের এই প্রার্থনা গানটির সুর যিনি জানেন সেই মেহেরচন্দজী, সদাশিব, কমরেড সুখলাল, হরদাবাজারের দোকানদার দুবেজী এবং 'নিমক' সত্যাগ্রহে জেলখাটা তাঁর স্ত্রী দুবেইন, জেলের ওয়ার্ডার, সুবেদার ইত্যাদি।

এ কথা সত্য যে, "বাংলার মন্বন্তরের কথা বাদ দিলে এই আগস্ট বিক্ষোভের চেয়ে দুর্জয় ঘটনা আমাদের সামাজিক জীবনে সম্প্রতি ঘটে নাই। অথচ বাংলা কথাসাহিত্যে তাহার উপযুক্ত বিকাশ হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। ইহার একটি কারণ বোধহয় এই যে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে এই বিক্ষোভ তেমন গভীর স্তরে পৌছায় নাই। পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে ইহার বিস্তার ছিল অনেক বেশি। বিহার প্রবাসী বাঙালী লেখক তাই উপন্যাস রচনায় এমন একটি বিষয় পাইয়াছেন সাধারণ বাঙালী উপন্যাসকার যাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে।"

'জাগরী'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেকস্থানে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।" বস্তুত এ কাজটা বনফুল

এবং বিভূতিভূষণও করেছেন এবং এর পরিণামে কাহিনীতে শুধু যে আঞ্চলিকতার আভাস ফুটেছে তাই নয়, চরিত্র এবং ঘটনাও অনেক বেশী সজীব ও সরস হয়ে উঠেছে—আর এই সূত্রে বাংলার সঙ্গে হিন্দীর একটা অনায়াস যোগসূত্রও রচিত হয়েছে। ডি. পি. আই অফিসের সেই আর্দালিটির কথা মনে পড়ে যে, বিন্দুর বাপ 'স্বরাজী মে শরীক' হয়ে কাজে ইস্তফা দিচ্ছেন শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে এবং নিজেও 'স্বরাজীমে শরীফ' হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে। তার ইচ্ছা সামনের বছর তার ছেলেটা 'মিডিল ইস্তিহান' পাশ করলেই সাহেবকে ধরে তার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েই সে 'স্বরাজী মে' যাবে।

বিহারের সাধারণ মানুষের, তাদের সামাজিক রীতিনীতির এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক জীবন্ত অ্যালবাম এই উপন্যাসটি। বিহারের জাতপাতের লড়াই, সাধারণ মানুষের ইংরেজি-প্রীতি, বিহারের প্রবাদ-প্রবচন নিখুঁতভাবেই ধরা পড়েছে এখানে। বিশাল ভাণ্ডার থেকে দু একটা চিত্র তুলে ধরছি।

"সদাশিউ জবাব দেয়, 'চুপ কর্ 'লালদাসিয়া'। কথায় বলে বামুনকে খাওয়াইয়া, রাজপুতকে বাবুসাহেব বলিয়া, কায়স্থকে টাকা দিয়া, আর বাকি সব জাতকে প্রহার দিয়া, যে কোনো কাজ করাইয়া লওয়া যায়। কয়টি টাকা পাইলে তো এখনই পার্টি ছাড়িয়া দিতে ইতস্তত করিবে না। তোমাদের কায়স্থদের আর জানি না।'

বৈজনাথ কায়স্থ। মিথিলার কায়স্থদের প্রায়ই পদবী হয় লাল না হয় দাস। এইজন্য কায়স্থদের সাধারণ লোক অনেকসময় বলে 'লালদাসিয়া'। জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, পাটোয়ারি প্রভৃতি কাজ ইহাদেরই একচেটিয়া। সেইজন্য গরিব কিষানদের নিকট ইহাদের জনপ্রিয়তা কম। ইহা হইতেই 'লালদাসিয়া' কথাটির মানে আর কেবল স্থানীয় কায়স্থ নয়—উহার যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়াইয়াছে, একটি অর্থলোলুপ পাটোয়ারী মনোবৃত্তিযুক্ত জীব।

বৈজনাথ বলে, 'হাঁ, আর একটা প্রবাদ মনে আছে তো? গয়লার দেখা ঘাস, আর বামুনের দেখা দই—দুটি জিনিসেরই বরাত একই রকমের।'

সদাশিউ ভূমিহার ব্রাহ্মণ। সে জবাব দেয়—

'সে তো আমি স্বীকারই করি। দেখলে না আমার দেওয়া দই মাস্টার সাহেব খেলেন। কায়স্থরা 'কহাবতের সচ্চাই' (প্রবাদের সত্যতা) মানিয়া

লইতে রাজী নয় বলিয়াই তো কথা বাড়িয়া যায়।"

আর একটি চিত্র—শোষণের এবং শাসনের এবং সেই সঙ্গে মাটির সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের।—

"দহিভাত গ্রামের সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি, যে কংগ্রেস অফিসে প্রায়ই আসিত গলায় প্রচণ্ড গলগণ্ড—আসিয়াই কাঁদিতে বসিত, দাদাকে বলিত, 'তুমি ছাড়া এর বিহিত আর কেউ করতে পারবে না। আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে আমার উপর এই জুলুম। সওদেও-এর দাদা কপিলদেও আমার সব জমিজমা নিয়ে নিতে চায়। জমি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা। তার বাড়ির কাছে জমি কিনা, 'মান্ধাতা' তামাকের ক্ষেত চমৎকার হবে। তাই এই জমির উপর নজর। 'পুরুখ' ছিল তেলী। জোয়ান-ছেলে 'পুরুখ' থাকতেই মরে যায়। 'পুতহু'-র তখন ছেলে পেটে। এক বছরের মধ্যে আমার 'পুরুখ' মরল, তারপর গেল 'পুতহু'। বছর না ঘুরতেই একরত্তি নাতিটিরও 'বাই উখর গিয়া'। সে চব্বিশ ঘণ্টা দাদীর কোলেই থাকত। কত ওষুধ, কত চিকিৎসা হল। ব্যথা লাগবে বলে বাছাকে 'সুই' দিতে দিইনি। দিলে হয়তো বাঁচত। তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। পাড়ার গোরে গোপের ছেলে তার কিছুদিন পরে মারা যায়। তখন কপিলদেও পঞ্চায়তি করে আমার উপর 'ইলজাম' লাগাল যে আমি ডাইনী; আগে নিজের বাড়ি শেষ করেছে, এখন গোরে-লালের ছেলেকে 'বাণ' মেরে তাকে শেষ করল। আরে বেকুফ, এটুকু বুঝলি না, আমি যে স্বামী, পুত্তুর, নাতিপুতি সব খেয়ে বসে আছি; আমার পেটে আর জায়গা কোথায়? তারপর আমাকে গ্রামছাড়া করবার জন্যে সেদিন রাত্রে রাহো, শনিচরা, ছেদী এরা সব কপিলদেও-এর কথাতে আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একমুঠো ধান পর্যন্ত বাঁচাতে পারিনি। আমি কিন্তু আমার ভিটে ছাড়ছি না। শুনছি নাকি আবার কপিলদেও আমার উপরে সদরে 'ডিক্রী' করিয়েছে জমিটা নেওয়ার জন্য। আমি কি কচি খুকি যে এই কথা বিশ্বাস করব? জমি থাকল দহিভাত গ্রামে, আর ডিক্রী করবে পূর্ণিয়ায়। তা কি কখনও হয়?" বৃদ্ধার এই শেষ প্রশ্নটুকু একই সঙ্গে মোক্ষম এবং মর্মন্তুদ।

উত্তর বিহারে জাতপাতের বিচারবোধ যে কতখানি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী তাও এই প্রসঙ্গেই জানা যায়। হঠাৎ সহদেও এসে পড়ায় বৃদ্ধার কথা থেমে যায়। কারণ—"যত শত্রুতাই থাকুক, সহদেও ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণ—উঁচু জাত।

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। উহার সম্মুখে তেলী বৌ জোরে কথা বলিতে পারে না।"

'রামচরিত মানস'-এর সুরে বাঁধা সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বিহারের লোকজীবনের নব রামায়ণ। অন্ত্যজ তাৎমা ও ধাঙড়দের জীবনযাত্রা প্রণালী, আচার বিচার, প্রবাদ-প্রবচনের নির্ভরযোগ্য অথচ শিল্পসম্মত বিবরণ এর পাতায় পাতায়। মিসিরজী, ফুকন, বৌকা বাওয়া, ধন্নুয়া মহতো, রামিয়া, সাগিয়া, রতিয়া, ফুলঝরিয়া আদি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে শুধু যে ঢোঁড়াই-এর মানসিক বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তাই নয়, এখানকার মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের বিচিত্র ও বিভিন্ন মুখগুলির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর একাধিক ছোটগল্প ও বিহারের পটভূমিতে বিহারের মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 'গণনায়ক' (১৩৫৪), 'বন্যা' (১৩৫৩), 'আণ্টা-বাংলা' (১৩৫৪), 'চকাচকী' (১৩৬১), 'বৈয়াকরণ' (১৩৬২), 'অভিজ্ঞতা' (১৩৬৩), 'মহিলা-ইন-চার্জ' (১৩৬৭), 'চরণ দাস এম. এল. এ. (১৩৬৮) 'অজা-গড' (১৩৫৪) ইত্যাদি গল্পগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। 'গণনায়ক' গল্পের ঘটনাস্থল "পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী।" ঘটনাস্থলের মতো গল্পটিও একই সঙ্গে বিহারের গল্প এবং বাংলা ছোটগল্প। পূর্ণিয়াবাসী সাহিত্যিকের পক্ষে কুশীকে বাদ দিয়ে গল্প লেখা কঠিন। 'বন্যা' গল্পটি এই কুশীর বন্যাকে কেন্দ্র করেই। বন্যার বিভীষিকায় বিহারের জাতপাতের সনাতন বিচারবুদ্ধি কিভাবে ভেসে যায় এবং সেই বিভীষিকা কেটে গেলে সেই সনাতন বিচারবুদ্ধি আবার কেমন মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে তারই বিশ্বস্ত কাহিনী 'বন্যা'। "নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুইজনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।" বন্যার জল যখন বাড়ে "তখন সকলে একে একে গ্রামের উঁচু স্থানগুলিতে আসিয়া জুটে। উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে। নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে সুমৃৎ তিয়রের বাড়ি। মুসলমানরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়।" কিন্তু 'কৌশিকী মাঈ' এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। শেষপর্যন্ত সকলকেই আশ্রয় নিতে হয় রিলিফের নৌকায়। "হঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলিয়া উঠে। একদিকে কাত হইয়া যায়, মেয়েরা আর ছেলেপিলেরা চিৎকার করিয়া এ ওর গায়ে গিয়া পড়ে। নৌকাটি অন্যদিকে

কাত হয়। নৌকার ভিতর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিয়া ধরে। নৌখে ঝার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সুমৃৎ তিয়রের স্ত্রী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ব্রাহ্মণদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌখে ঝার পুত্রবধূকে কাঁধ ধরিয়া বসায়। শাশুড়ী বৌ দুজনকেই বলে, ভয় 'কী! কৌশিকী মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" পাঠক জানেন কৌশিকী মায়ের কৃপায় যা ঠিক হবার তা এখনি হয়েছে, কৃপা কেটে গেলে আবার সব বেঠিক হয়ে যাবে। প্রমাণ, জল কমার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের এই চিত্রটি—"তিয়রদের মধ্যে সুমৃৎ নৌকা আনাইয়াছে, অনুরূপ ঝা তাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। সুমৃৎ বলে, 'সরিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জায়গা নেই।' অনুরূপ ঝা কাকুতি মিনতি করে।—নৌখের পুত্রবধূ আর একটু ভাল না হইলে নৌখে ঝা যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর কাহারও নৌকা ভাড়া করিবার সংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিবার দেরি হইয়া যাইবে। শীত পড়িলে আর কলাই বুনিয়া কি হইবে? পাঁক শুকাইলে, কলাই বোনা না-বোনা সমান।

'ও সব আব্দার তোমার গুরু নৌখে ঝার কাছে গিয়ে করোগে যাও। শীগ্‌গির নামো বলছি।'

'আচ্ছা, ভগবান আছেন।'

'শাপ দেওয়া হচ্ছে! রাহিকপুরার বামুনদের দেওয়া শাপ সুমৃত তিয়র এই—ফুঃ ফুঃ বলিয়া হাতের তেলোয় ফুঁ দিয়া নদীর দিকে উড়াইয়া দেয়।"

'ডাকাতের মা' গল্পে জেলফেরৎ ডাকাত ছেলে সৌখীর পরদিনের আহারের সংস্থান করতে বৃদ্ধা মা মাতাদীন পেশকারের বাড়ির লোটা চুরি করে ধরা পড়ে। "এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারদুয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিসপিশ করে।"—গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বিহারের মানুষজনের-আচার ব্যবহারের এমন চিত্র সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে অল্প নয়।

'চকাচকী'—অর্থাৎ ধামদাহা হাটের 'চকাচকী'—অর্থাৎ সেই দুবেজী এবং দুবেনীর কাহিনী। বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলাল জানিয়ে দিতে ভোলেনি যে, "...একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু

দুবেনীর কোমরের লচক দেখে।"

'বৈয়াকরণ' গল্পের নায়ক পণ্ডিতজীর নাম শ্রীতুরন্তলাল মিশ্র। "মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি ; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।"

"নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজা আহ্নিক করেন শুদ্ধাচারে থাকেন কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাশীটা জল তুলে এনে দিত।" মেয়ে স্কুলের দাইদের হাতে তিনি জল খান না। তাই দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো জল-তুলবার দড়ি নিয়ে লোটা মেজে নিজের হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে খান তিনি। জল যে তুলে রাখবেন তারও উপায় নেই। কারণ বসার ঘরে সহকর্মী মৌলবী সাহেব "দিন রাত দাঁত খোঁটেন আঙুল দিয়ে"। হাত ধোন না, সেই হাতেই পান বের করে খান। "এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না।"

সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে দৃষ্ট উপরোক্ত ছবিটির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি'তে উল্লিখিত মৈথিলী পণ্ডিতজীর চিত্রটির। লেখককে সিগারেট খেতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন," —কথাটা হচ্ছে আপনারা বড্ড ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। আর সব কথা থাক, আচ্ছা, ঐ কী একটা মুখে দিয়ে ফক্‌ফক্ করে ফুঁকে যাচ্ছেন বলুন তো? একটা ম্লেচ্ছ নেশা, ক্রমাগতই হাত উচ্ছিষ্ট হচ্ছে—তার ওপর এই দুর্গন্ধ— ।"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও দ্বারভাঙ্গার মানুষ এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কথাসাহিত্যে বিহারের, বিশেষত দ্বারভাঙ্গার মাটি ও মানুষের অবাধ অবস্থিতি ও অক্লান্ত বিচরণ। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক কত গভীর ও গূঢ় তার পরিচয় পাই লেখকের এই উক্তিতে—"বাঙলা আমার চেয়ে বেশি করে বিনয় ঝার বাংলা, মিথিলা ওর চেয়ে বেশি করে আমার মিথিলা।" স্বাভাবিক কারণেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে স্ববাস ও স্বজনের স্থান অনেকখানি। তাঁর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' উপন্যাসটিকে মিথিলার মাটি ও মানুষের অবাধ বিহারভূমি বলে উল্লেখ করলে অন্যায় বা অতিশয়োক্তি হয় না। শুধু গিরিবালার কাছে নয়, লেখকের কাছেও মিথিলা "মা জানকীর দেশ।" মিথিলার বিবাহ প্রথা ভোজনবিলাস, রঙ্গরসিকতা—এক কথায় মিথিলার মানুষের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র এই উপন্যাসে এক নয়, অনেক। লোটন ঝা, লছমী, দুলারমন ইত্যাদি চরিত্রগুলি মিথিলার মাটি থেকেই উঠে এসেছে।

লেখক মিথিলার মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে তার মুখের ভাষাটিকেও তুলে ধরেছেন। দ্বিরাগমনের প্রাক্কালে তুলারমন তার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছে—"তোরা সবকে ছৈড়ক কোনা রহবৈ গে মাইয়া ?" বাংলা কথাসাহিত্যে মৈথিল সংলাপ সংযোজনার কৃতিত্বটুকু নিঃসংশয়ে উত্তর বিহারের লেখকদেরই প্রাপ্য।

'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' ভ্রমণকাহিনী হলেও বর্ণনানৈপুণ্যে এবং কাহিনী-বয়ন দক্ষতায় কথাসাহিত্যের পর্যায়বাচী। এই চিঠির কাহিনী ছড়িয়ে আছে "কিঞ্চিদধিক চার হাজার বর্গমাইলের এই বিরাট কুশীপ্রাঙ্গণে"। মানসী থেকে মাইল পঁচিশ ছাব্বিশ পরেই 'বাদলাঘাট'—"এখান থেকেই নাকি কুশীর এলাকা আরম্ভ।" বাদলাঘাটের পর ধামারঘাট,—তারপরেই সাহারসা। ভাগলপুর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন জেলায় পরিণত হয়েছে। এখন সে "শহর শাহ অর্থাৎ শহরের বাদশা', । "মধেপুরা আর সুপৌল হচ্ছে সাহারসার দুটি মহকুমা"। সাহারসায় যেমন বাঙালী আছেন, মধেপুরাতেও তেমনি আছেন। মধেপুরার "আকাশে বাতাসে মৈথিলী সুরটা বেশ প্রবল, তার সঙ্গে মিশেছে একটি বাঙ্গালী সুরের রেশ।" মধেপুরা থেকে বনগাঁও-মেহসী অর্থাৎ মণ্ডল মিশ্র খ্যাত সেই প্রাচীন বনগ্রাম-মহিস্মতী। তারপর সুপৌল এবং সিংগিওয়ালা গ্রামের পথ ধরে চলেছে এই ভ্রমণের কাহিনী। বিহারের মাটি শুধু নয়, মানুষগুলিকেও অবিকল ধরে রাখা হয়েছে এই কাহিনীর বুকে। মৈথিল পণ্ডিতজীর কথা পূর্বেই বলেছি। এছাড়াও আছেন অত্যধিক রোম্যান্স-প্রিয় আরদালী লছমী সিং, ঘটক টুনমুন ঝা পাঁজিয়ার। 'পাঁজিয়ার'-রা হচ্ছে মিথিলার ঘটক সম্প্রদায়। "ঐ যে পুঁথি, ওর মধ্যে রাশীকৃত কুলুজী মৈথিল পরিবারদের।" সৌরাঠে ঘরের হাটে এই পাঁজিয়াররাই লম্বা পুঁথি মেলে সম্বন্ধ বিচার করে। টুনমুন ঝার পরিচয়টুকু তার নিজের জবানীতেই ভালো শোনায়। "আমার নাম টুনমুন পাঁজিয়ার। আপনি তো শিশু—সাতাত্তর বছরের বুড়োর হাতে মেয়ে সম্প্রদান করিয়েছি আমি—অবিশ্যি এ-পানিতে নয়, নেপালে, হিন্দুত্বটা সেখানে তো এরকম একেবারে লোপ পায়নি। তবে এ-পানিতেও যে হাত গুটিয়ে বসে আছি এমন নয়—পঞ্চাশ থেকে ওপরে যারই পাত্রীর দরকার টুনমুন ঝাকে অনুসরণ করতে হবে, আপনি বাইরের লোক তাই জানে না—এই বছরই দিলাম পদুমঠাকুরের বিয়ে—তেষট্টি বছর, বিলটু ঝা উনষাট—পুরনো 'ঘর' মজুদ এখনও, পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে, বৌ, নাতি, জামাই

একটা শখ হোল—কাক-কোকিলেও-টের পেলে না, একদিন বৈদ্যনাথধামে যাচ্ছি বলে একটা চাকর সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল বুড়োউ, পাঁচদিন পরে ঘর-আলো করা এক দুলহীন নিয়ে হাজির !...ভেতরে এই টুনমুন পাঁজিয়ার।"

কিন্তু আমাদের পথ হাঁটা এখনও বাকি। কাজেই আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হলেও টুনমুন পাঁজিয়ার-এর কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতেও বিহারের মাটি ও মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিহারের দুটি রাজপুত পরিবারের বনেদিয়ানার প্রতি-যোগিতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তাঁর 'কুইট-ইণ্ডিয়া' গল্পটি। 'বিপন্ন' গল্পে বিহারী ছাত্রের দৃষ্টিস্নাত বাঙালীর মার্জিত রস ও রুচি আমাদের অহংবোধকে অবশ্যই তৃপ্ত করবে।

এ ছাড়াও যাঁদের কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা দেবী, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

সুবোধ ঘোষের একাধিক উপন্যাসের পটভূমি দক্ষিণ বিহার। এ বাবদে 'শিউলিবাড়ি', 'শতকিয়া' বা 'নাগলতা'র নাম অবশ্য স্মরণীয়। তাঁর অমর সৃষ্টি 'ফসিল' গল্পটির পদচারণাও বিহারের জনপদে। 'জতুগৃহ' গল্পের পট-ভূমিতে পাই রাজগৃহ অঞ্চল এবং রাঁচির অরণ্য অঞ্চলকে। হাজারিবাগের লাশকাটা ঘরের অভিজ্ঞতা দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর 'সুন্দরম' গল্পটি।

বিমল করের 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৩৫৪) উপন্যাসের পটভূমিকা ছোটনাগপুরের 'গুরুডিয়া' গ্রামে। "এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ চমৎকার। ছোটনাগ-পুরের পার্বত্য এলাকার প্রকৃতি যেমনটি হতে পারে। অজস্র বনসম্পদ। শাল পলাশ মহুয়ার যেন শেষ নেই, অজস্র হরিতকী আর অর্জুন গাছ ; ঘোড়া নিম আর গরগল। উঁচুনীচু প্রান্তর', কোথাও সেই অনুর্বর ভূমি ঢেউয়ের ফণার মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আনত নম্র হয়ে গেছে। মাটি শক্ত, কাঁকর আর নুড়ি ভরা, বাতাসে আর্দ্রতা নেই, শুকনো বনগন্ধে পরিপূর্ণ।" গুরুডিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানটুকুর সঙ্কেত হিসেবে পাই—"গুরুডিয়ার রাস্তটুকু ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই সরকারী পাকা রাস্তা। এই রাস্তা ধরে তিনদিকে চলে যাওয়া যায়, দক্ষিণ আর মধ্য বিহারের অনেকখানি এই রাস্তার জালে জড়ানো। গুরুডিয়া থেকে রেলস্টেশনও এমন কিছু দূরে নয়, ব্যাপারীরা আসা যাওয়া করে।"

এই গুরুডিয়াতেই সুরেশ্বরের 'অন্ধ আশ্রম'—এখানকার লোকে যাকে জানে 'দাবাইখানা' বলে। উপন্যাসটিতে 'নাওদা' (? নওয়াদা)-র উল্লেখও আছে।

বিহারের পটভূমিকায় রচিত হলেও এ উপন্যাসে বিহারের মানুষজন বিরলদৃষ্ট। তাঁদের মধ্যে শিবনন্দনজী, গয়ার যুগলবাবু, অন্ধাশ্রমের ভৃত্য ভরতু, অবনীর কাজের লোক মহিন্দর, ডাকপিওন রামেশ্বর মাত্র এই কয়জন। রামেশ্বরের মুখে সামান্য হিন্দী সংলাপ আছে।

প্রফুল্ল রায় বিহারের মাটি ও মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর একাধিক উপন্যাসের উপাদান ও উপকরণ। তাঁর 'আকাশের নীচে মানুষ', 'ধর্মান্তর', 'কিন্নরী', 'রামচরিত' (১৩৫৪) ইত্যাদি উপন্যাসে বিহারের মাটি ও মানুষের অবাধ অধিকার ও অত্যাশ্চর্য মিছিল। বিহারের মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগগুলি কান পেতে শুনেছেন তিনি এবং সেগুলিকে শিল্পের হিরণ্ময় পাত্রে অমর করে তুলে ধরেছেন।

সামন্ততন্ত্রের প্রকোপে এবং বর্ণহিন্দুদের প্রতাপে অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য জাতির মানুষগুলির নির্যাতন ও নিদারুণ জীবনের কথাকেই তিনি সাহিত্যরূপ দিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। 'আকাশের নীচে মানুষ'-গুলি হল সেই অস্পৃশ্য দোসাদরা যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণিয়া-ফরবেশগঞ্জের ভৌগোলিক বৃত্তে। 'ধর্মান্তর' উপন্যাসের পটভূমিতে আছে পূর্ববিহারের অখ্যাত জনপদ এবং ততোধিক অখ্যাত চামার সম্প্রদায়ের মানুষজন—উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও নিগ্রহের তাড়নায় যারা হিন্দুধর্মের বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁর 'কিন্নরী' (১৩৫৪) উপন্যাসের ঘটনাস্থল আরা জেলার একটি গঞ্জ—ধনমানিকপুর। "এ জায়গাটার ঐতিহাসিক গৌরব নেই" কিন্তু মানুষের ইতিহাস এখানেও থেমে নেই। সেই চলমান ইতিহাসের একটি অংশ তুলে ধরেছে 'কিন্নরী' ছিবলি নামে একটি ভিখারী মেয়ের মুখে আলো ফেলে। ছিবলি অন্ধপিতার আশ্রয়ে থেকে বুকে সস্তাদামের বেলোছেঁড়া হারমোনিয়াম রেখে গান গাইত। গানের পদে কখনো রামচরিতের চামর কখনো বা মানবচরিত্রের চটুলতা। 'বিলাখি বিলাখি রোয়ে রামসীয়া জানকিয়া', 'নয়না মারকে মাত যাও মাত যাও পিয়ারী, দিল তোড়কে মাত যাও মাত যাও পিয়ারী' এবং 'পত্‌লী কোমরি হ্যায়, তিরছি নজরী হ্যায়—মেরে লাল দোপাট্টা মলমল উড়ি যায়।" প্রথমটি শাস্ত্রগীতি, দ্বিতীয়টি পশ্চিম বিহারের পল্লীগীতি, তৃতীয়টি রেকর্ডগীতি—যা ছিবলি শিখেছিল নওল-

কিশোরের কল্যাণে। এই গানের সূত্রেই বিহারের জনপ্রিয় প্রমোদ-অনুষ্ঠান নৌটঙ্কীর নায়িকাপদে তার উত্তরণ এবং পরিণামে বিষণ্ণ-বিধুর পরিসমাপ্তি। "নৌটঙ্কী জিনিসটা চেহারায় এবং চরিত্রে বাঙলাদেশের যাত্রাপালার সহোদর। পৌরাণিক একটি পালাকে ঘিরে প্রচুর নাচ, প্রচুরতর গান, চড়াসুরের অভিনয় এবং ভাঁড়ামি—চতুরঙ্গে জনতার মনোরঞ্জন করা হয়।"

'বয়েল গাড়ি'তে করে নৌটঙ্কীর দল যাত্রা করে গঞ্জ থেকে গঞ্জান্তরে। "কোথাও পা পেতে বসার অবকাশ নেই। এক মেলা শেষ হতেই আরেক মেলায় তাদের ছুটতে হয়।" নৌটঙ্কীর দলে স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকে। নাচ গানের সঙ্গে নেশা, জুয়া এবং ব্যভিচারের উষ্ণস্রোত সেখানে সমানে প্রবহমাণ। 'কিন্নরী' উপন্যাসে বিহারের এই নৌটঙ্কী ঘরানার শিল্প ও শিল্পীর অন্তরঙ্গ রূপচিত্র বাংলা উপন্যাসের দিগন্তে নূতন রং ধরিয়েছে।

এই উপন্যাসে পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংলাপগুলি রচিত এবং সেই কারণেই সেখানে বাংলা ও হিন্দীর সহাবস্থান আদৌ শ্রুতিকটু নয়। সংলাপে শুধু যে বিহারের সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরটুকু ধরা পড়েছে তাই নয়, সামাজিক পটভূমিকাটিও যথেষ্ট আলোকিত হয়েছে। সুরতিয়া নামে একটি গ্রামের মানুষের সঙ্গে স্টেশনমাস্টার নওলকিশোর কথা বলেছেন—

'লড়কীর সাদি হল তোর?

সুরতিয়া নামে দেহাতী মানুষটা বলে, 'না, ভাল লড়কাই তো পাচ্ছি না। বহুত চিন্তায় আছি মাস্টারজী। আপনার খোঁজে লড়কা-উড়কা আছে?'

একটু ভেবে নওলকিশোর বলেন, 'আছে। তুই কালই রৌশনপুর চলে যা। ওখানে সখিলাল সাওয়ের সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবি। সখিলালের একটা লড়কা আছে; লিখি-পড়ী আচ্ছা লড়কা। ঘরও ভাল; খেতিবাড়ি আছে চল্লিশ বিঘা; বাগ বাগিচা আছে। ভঁইসা আছে বিশটা। বয়েল গাড়ি সাত আটটা। ছেলের সাদি দেবে বলে,সখিলাল একটা লড়কীর খোঁজ করছিল। জরুর তুই কাল চলে যাবি।"

লেখক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু 'কিন্নরী' উপন্যাসে একমুঠো বাংলার মাটি নেই, একটিও বাংলার মানুষ নেই। মাটিতে এবং মানুষে এখানে বিহারই উজ্জ্বল এবং উজাগর। এই মন্তব্য লেখকের 'রামচরিত্র' (১৩৫৪) উপন্যাস সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

'রামচরিত্র' উপন্যাসকে বিহারের সামাজিক জীবনের একটি ঐতিহাসিক

দলিল বলেও উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটির পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবেই দিচ্ছি।

উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে উত্তর বিহারের ছোট্ট শহর 'লখিনপুরা'র পট-ভূমিকায়। "লখিনপুরা টাউনের শেষ মাথায় বিশাল রামসীতার মন্দির।"… তার ঠিক উল্টো দিকে টাউনের আরেক মাথায়, "এখানকার সবচাইতে নোংরা সবচাইতে ঘৃণ্য এলাকা। শুদ্ধ ভাষায় জায়গাটা হল নিষিদ্ধ পল্লী। চালু কথায় রেণ্ডিকা ঘর বা রেণ্ডিটুলি।…শ চারেক বেশ্যার বিরাট কলোনি ওটা।"

এক প্রান্তে রামসীতা মন্দির, অপর প্রান্তে রেণ্ডিটুলি-দুটোই কাহিনীর নায়ক রামচরিত চৌবের ঠাকুর্দা রামসিংহাসনের অপার কীর্তি। এই বিশাল মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামসিংহাসন হিন্দুধর্মের এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিনে। তখন "নীচের স্তরের অচ্ছুৎ হিন্দুরা গোমাংস খেয়ে রাতারাতি ধর্ম বদল করে যাচ্ছিল।" এভাবে ধর্মান্তর ঘটতে থাকলে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবে। স্বাভাবিক কারণেই "উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাম-সিংহাসন তাই বিস্তর ভাবনা চিন্তা করে হিন্দু ধর্মের ভিত মজবুত করার জন্য চাঁদা তুলতে শুরু করেছিলেন। "ব্রাহ্মণ কায়াথ ক্ষত্রিয় রাজপুত দোসাদ কোয়েরি তাতমা ধাঙড়–হিন্দু হলেই হল। সবার কাছেই তিনি হাত পেতে-ছিলেন। পয়সার জাত-পাত নেই।" পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামসীতার এই সুবিশাল মন্দির—যেখানে "সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন বুড়ো ফাগুয়ান ঝা নিয়ম করে তুলসীদাসের রামচরিত মানস পাঠ করে। চারদিকে চারটি থামে লাউড স্পিকারের চোঙা লাগানো। কেননা এই মন্দিরে অচ্ছুৎদের প্রবেশ নিষেধ। অথচ ভজন এবং শাস্ত্রপাঠ থেকে তাদের বঞ্চিত করা ঘোর অধর্ম, তাই লাউড স্পিকারের ব্যবস্থা। লখিনপুরা এবং আশেপাশের অচ্ছুৎরা মন্দিরের বাইরে ফাঁকা মাঠে বসে ভজন আর শাস্ত্রের মহান ব্যাখ্যা শুনে যায়।"

রামসীতার মন্দিরটি যেমন রামসিংহাসনের ধর্মপ্রাণতার প্রতীক, রেণ্ডিটুলিটি তেমনি তাঁর যৌবন-যন্ত্রণার জারজ সন্তান। তাঁর স্ত্রী জানকী যখন পক্ষাঘাতে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন তখন রামসিংহাসন "আটাশ বছরের পুর্ণ যুবক —নীরোগ, সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান।" ইচ্ছে করলে আরো কয়েক গণ্ডা বিয়ে করতে পারতেন তিনি। এ ব্যাপারে কোনো বাধাও ছিল না। কেননা

"স্বাধীন ভারতবর্ষের যেদিকে পার্লামেণ্ট, হিন্দু কোড বিল, আইন-আদালত, সংবিধান তার উল্টোদিকে বিহারের এই সব অঞ্চল।"

"কিন্তু চতুর্বেদী বংশের পুরুষেরা খুবই একনিষ্ঠ। এক স্ত্রী থাকতে দু নম্বর বিয়ের কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না।" অথচ "জপতপ বা অন্যান্য পুণ্যকর্মের মতো শরীরের ধর্মপালনও অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং খুবই গোপনে ডাঁটো চেহারার উদ্দাম স্বাস্থ্যবতী একটি রাখনি বা রক্ষিতা তাঁকে পুষতে হয়েছিল। আওরতটার নাম কুঁয়ারী, জাতে গাঙ্গাতো অর্থাৎ অচ্ছুৎ। জল-অচল হলেও যুবতী আওরতের মারাত্মক দেহ হয়ত সবরকম ছুয়াছুতের বাইরে।" "তারপর একদিন জাগতিক নিয়মেই কুঁয়ারীর উদ্দাম শরীর ভাঙ্গতে থাকে, তার সম্বন্ধে রামসিংহাসনের আগ্রহও ফুরিয়ে যায়।" পেটের জ্বালায় কুঁয়ারীকে পৃথিবীর আদিমতম পাপ-ব্যবসায় নামতে হয়, জীবিকার অনিবার্য প্রয়োজনেই কমবয়েসী মেয়েদের দলে টানতে হয় এবং "এইভাবেই লখিনপুরার রেণ্ডিটুলির ফাউণ্ডেশন স্টোন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।" যে জমিতে এই পণ্যাঙ্গনারা পশরা দিয়েছিল সেটা ছিল রামসিংহাসনেরই জমি। কাজেই তিনি জমির ভাড়া চাইলেন। প্রথমে ভাড়া ছিল কম, "বাড়তে বাড়তে আপাতত হাজারে এসে ঠেকেছে।" "লখিনপুরার মান্যগণ্য" লোকেরা গোড়ার দিকে দাবী করেছিলেন —এই নোংরা পাড়াটা তুলে দিতে হবে। "রামসিংহাসন তাঁদের বুঝিয়েছিলেন, সোসাইটির স্বাস্থ্যরক্ষ্যার জন্যই ওটা থাকা দরকার।"

"রামসিংহাসন সকল অর্থেই ছিলেন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ। প্রায় হাজার বিঘা জমি ছিল তাঁর। এই জমিজমার সামান্যই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বেশির ভাগই নানা কূট কৌশলে আনপড় অচ্ছুৎদের সর্বস্বান্ত করে, তাদের পথে বসিয়ে দখল করেছিলেন। প্রচুর কিষান খাটত তাঁর ক্ষেতিতে, তাদের অনেকেই বান্ধুয়া মজদুর বা বেগার-খাটা ভূমিদাস।"

এই রামসিংহাসনের পৌত্র রামচরিতকে নিয়েই বর্তমান কাহিনী। সব ব্যাপারেই ইনিও পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। রামচরিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রী গোমতীর "পনের বছরে সাত সাত বার পেটে ছৌয়া এলেও কোনোটাই বাঁচেনি।" শেষপর্যন্ত গোমতী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা করে পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করলেও রামচরিত কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি।

রামচরিত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। প্রতিদিন প্রভাতে রামসীতা এবং কুল

দেবতাকে প্রণাম করে পাখীদের দানা খাওয়ানো এবং পথের তাবৎ বেওয়ারিশ জীবজন্তুকে ভোজন করানো তাঁর নিত্যকর্ম। এই অনাথ জন্তুজানোয়ারদের সেবা করার পথেও ঝামেলা প্রচুর। মাঝে মাঝেই হতচ্ছাড়া চেহারার সিড়িঙ্গে হাড্ডিসার ভিখমাঙোয়া (ভিখিরি) ছেলেগুলি ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে—'সরকার এক গো চাপাটি দো। ভগোয়ান রামজী তেরে ভালাই করেগা।'

"কেউ গুড়িয়ে গুড়িয়ে বলে, বহোত ভুখ। দো রোজ ছে নায় মিলা। বহোত ভুখ— ।"

রামচরিতের পার্শ্ব সহচর পোষা পালোয়ানরা তাড়িয়ে দেয় এইসব হতভাগাদের। "অনাথ অসহায় পশুদের খাদ্যে তিনি মানুষকে ভাগ বসাতে দেবেন না।"

লখিনপুরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে রামচরিতকে ধরলেন—নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। কারণ এবারও 'হিন্দুধরমের বহোৎ বিপদ।' "ষাট সাল আগে এই মহান ধরম একবার ভারি বিপদে পড়েছিল।" রামচরিতের ঠাকুর্দা "রামসিংহাসনজী তখন একে বাঁচিয়েছিলেন। লেকেন এবারের বিপদটা অনেকগুণে বেশী।" তাই চৌবেজীই ভরসা।

কথাবার্তা বলে যা জানা গেল তা হল এই যে, সামনে যে চুনাও আসছে তাতে একটা মারাত্মক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিধান মণ্ডলে এবং লোকসভায় এম. এল. এ বা এম. পি. হবার জন্য যারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে তাদের শতকরা পঞ্চাশ জনই হয় অচ্ছুৎ নয় বিধর্মী। "...মাইনোরিটি আর অচ্ছুৎরা চুনাওতে জিতে অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেণ্টে গেলে গর্ভনমেণ্ট, দেশ সব কিছু ওদের হাতে চলে যাবে।" কাজেই চৌবেজীকে চুনাও লড়তে হবে। ধর্মরক্ষার খাতিরেই এটা করতে হবে।

তবে প্রতিপক্ষও প্রবল। তারা সংঘবদ্ধভাবে চৌবেজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। চৌবেজী যে রেণ্ডিটুলির মালিক সে কথাও তারা পোস্টার দিয়ে জানিয়ে দিল। তাছাড়া নির্বাচনী প্রচার নিয়েও চৌবেজী কিছুটা বেকায়দায় পড়লেন। ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর পক্ষে অচ্ছুৎপাড়ায় বা বেশ্যাপল্লীতে ভোট চাইতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই চুনাওয়ে বেশ্যাপল্লীর ভোটগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কাজেই শেষপর্যন্ত ঠিক হল চৌবেজী ওসব পাড়ায় যাবার আগে মাথায় পবিত্র গঙ্গাপানি ছিটিয়ে নেবেন। তাছাড়া তিনি "যে সব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবেন আগে থেকেই সেখানে গঙ্গাপানি ঢেলে শুদ্ধ করে

রাখা হবে। ফিরে আসার পর গায়ের জামাকাপড় ফেলে দিয়ে স্নান করে আবার মাথায় গঙ্গাপানি ছিটোবেন। রেণ্ডিটুলিটিকেও তিনি সরিয়ে দিলেন রাতের অন্ধকারে এক বেনামী জমি থেকে আর এক বেনামী জমিতে —লখিনপুরা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এ ব্যাপারে সামান্য যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও কেটে গেল রেণ্ডিটুলির নতুন আমদানী রতিয়ার উত্তপ্ত যৌবনের উন্মুখ আত্মসমর্পণে। নির্বাচনে জয়লাভ করলেন চৌবেজী। হিন্দুধর্ম আর একবার রক্ষা পেল মহতী সর্বনাশের হাত থেকে।

লক্ষণীয় যে, উত্তর বিহারের মাটি ও মানুষের জীবনকথা এখানে বাংলা সাহিত্যের কথাকলি হয়ে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের মাটি-মানুষ-আকাশ-বাতাস সব কিছুই বিহারের দখলে।

বিহার জাতপাতের দ্বন্দ্বে জীর্ণ, সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত, যেখানে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা - সেই বিহার প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসগুলিতে প্রবলভাবে বিরাজমান।

প্রফুল্ল রায় তাঁর কাহিনীর পটভূমিকা খুঁজে পেয়েছেন উত্তর বিহারে। দক্ষিণ বিহারকে পটভূমিকা করে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। ছোটনাগপুরের অরণ্যপ্রকৃতি বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টাদের চিরদিনই আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই অরণ্যপ্রকৃতির অন্তরালে যে আরণ্যক জীবন শোষণে ও শাসনে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় মহাশ্বেতা দেবীর মাধ্যমেই উপলব্ধ। এ বাবদে তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' (বেতার জগৎ ১৩৫৪) উপন্যাসটি একাই এক শো। "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসামুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও আর্থনীতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশী সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও।" এই বীরসা মুণ্ডার কাহিনীর সূত্রে ছোটনাগপুরের মাটি ও মানুষের ইতিহাসসম্মত রূপচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এখানে। মুণ্ডা সমাজের আচার-আচরণ, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মায় তাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত লেখিকা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন 'অরণ্যের অধিকারে'। আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের কথা সুবিদিত; আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এঁদের দান অসামান্য। আমাদের সাহিত্যে এঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এক অর্থে ঋণশোধেরই নামান্তর।

'অরণ্যের অধিকার' বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিহারের একটি মূল্যবান অথচ উপেক্ষিত ভূখণ্ডের এবং সেই ভূখণ্ডের মধুর মানুষগুলির চিরন্তন যোগসূত্র রচনা করেছে।

ভাগলপুরের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মিথিলার গল্প ঝার কাহিনী রচনা করে বাংলার গোপাল ভাঁড়ের সহোদরকেই শুধু আবিষ্কার করেননি, মিথিলার সঙ্গে বাংলার সুপ্রাচীন সম্পর্কটিকেও সুমধুর করে তুলেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষের কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েই প্রবন্ধের প্রারম্ভ। পরিশেষে যদি কিছু পরিবর্তন ঘটে—তার দায়িত্ব বর্তমান প্রবন্ধলেখকের নয়, তার দায়িত্ব পরশুরামের। বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের মাটি ও মানুষের কথা শুধু নেই, ভূতের কথাও আছে। পরশুরামের 'ভূশণ্ডির মাঠে' বাংলার ভূত এবং বিহারের ভূত এক অভূতপূর্ব ভূত-সম্মেলনে একত্রিত হয়েছে। বিহারের এই ভূতটির পূর্বজন্মের ঠিকানা—জেলা ছাপরা। "দেশে এক সময় তাহার জরু গরু জমি জেরাৎ সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কসাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা।" তারপর মিলে কাজ করবার সময় লোহার কড়ির চোট লাগে মাথায়। একমাস শয্যাশায়ী থেকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় এবং ভূশণ্ডির মাঠে প্রেতরূপে তালগাছে বাসা বাঁধে। ভূতজন্মে তার নাম 'কারিয়া পিরেত।' কিন্তু নামরূপের পরিবর্তন ঘটলেও সে তার পূর্বজন্মের ভাব এবং ভাষা আদৌ বিস্মৃত হয়নি। তার মনের কোঠায় ভজুয়ার ভগ্নী এবং ঠোঁটের ডগায় ভোজপুরের ভাষা বহাল তবিয়তেই বিরাজমান। প্রমাণ তার স্বকণ্ঠের এই গীতটি—

"আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া
ভগলুকে বিটিয়া,
কেকরাসে সাদিয়া হো—ও—ও—ও।"

ভজুয়ার বোনের বিয়ে কার সঙ্গে হয়েছিল রাজশেখরের চলন্তিকায় তার নামটি খুঁজে পাইনি তবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিহারের মাটি ও মানুষের সম্পর্ক যে জন্ম জন্মান্তরের তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে প্রবল পুলক অনুভব করেছি।

কালীকৃষ্ণ দাসের "মানভঞ্জন"

কিছুকাল পূর্বে জনৈক কালীকৃষ্ণ দাস রচিত 'মানভঞ্জন' পালার একটি পুথি দেখেছিলাম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালীকৃষ্ণ দাস নামটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। তবে সেটি একজনের নয়, দুজনের নামের সমাহার। "কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন, শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীনহীন" এই "দুই নামে এক নাম কালীকৃষ্ণ দাস"।[১] এই কালীকৃষ্ণ দাস রচিত 'কামিনীকুমার' আখ্যায়িকাটির কথা অনেকের জ্ঞাত। কিন্তু 'মানভঞ্জন' পুথির রচয়িতা কবি কালীকৃষ্ণ দাস এক পৃথক ব্যক্তিত্ব। পদরচনার লালিত্যে ও কল্পনার অভিনবত্বে মধ্যযুগের কবিকুল তালিকায় তাঁর নাম নিতান্ত নগণ্য নয়। অন্তত পুথিটি সেই কথাই বলে।

সৌভাগ্যের বিষয়, কালীকৃষ্ণ দাস রচিত 'মানভঞ্জন' পুথিটি আদ্যন্ত অবিকৃতরূপেই উপলব্ধ। পুথিটির কাগজ পাতলা, রং হলদে এবং সেটা কালেরই রিপুকর্ম। পুথিতে মোট ৬১ পাতা, পাতার আয়তন ১৩½″ × ৪½″। পুথিটি উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। লিপিকাল ১২৭৩ সন (৩রা বৈশাখ); লিপিকর শ্রীজগন্নাথ সিংহ সরকার, সাং বাবদাড়ি, পরগণা পাতকুম। বর্তমানে স্থানটি বিহারের সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত।

কালীকৃষ্ণ দাস যেই হোন তিনি যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, সঙ্গীতজ্ঞ এবং লিপি-কুশল ছিলেন সে কথা অস্বীকারের হেতু নেই। তাঁর রচিত 'মানভঞ্জন' পালা-গীতিটি কতকগুলি পালা বা লীলায় বিভক্ত। যেমন—গোষ্ঠলীলা ("অথ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন"), পূর্বরাগ ("অথ গোপাঙ্গনাদিগের দর্শন") ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জনই পালাগীতিটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও কবি গোষ্ঠলীলা থেকেই সরগম সুরু করেছেন। প্রত্যেকটি পালায় তাল এবং রাগিণীর উল্লেখ আছে। যেমন—"শ্রীমতীর খেদ", তাল তিওট, রাগিণী বেহাগ। 'মানভঞ্জনে' চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের অভিসার এবং রাধার প্রতীক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তিনি পালাটিকে পুষ্ট করলেন। কৃষ্ণ

নির্দোষ। তিনি রাধার কাছেই যাচ্ছিলেন।

হরষিত পীতবাস পুরাতে গোপীর আশ
আসিছেন সঙ্কেত স্থানেতে।
করিতে নূতন লীলা বিধি আনে মিলাইলা
চন্দ্রাবলী পথের মাঝেতে॥

চন্দ্রাবলী সোজাসুজি প্রণয় প্রার্থনা করলেন।

ছেড়ে নাই দিব নাথ শুধু হও রাধানাথ
ব্রজনাথ এ কোন ব্যবহার।
রমণী যাচিকা তায় ধরেছে হে রাঙ্গা পায়
মনবাঞ্ছা পুরাও য়ামার॥

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী কৃষ্ণকে অগত্যা আনন্দিত-রজনী অতিবাহিত করতে হল চন্দ্রাবলীর সঙ্গে। ওদিকে বাসকসজ্জিকা রাধা ক্রমেই উৎকণ্ঠিতা হয়ে উঠেছেন। রজনীর পরমায়ু প্রায় শেষ। রাধার আক্ষেপ –

ঝিল্লির ঝঞ্জন করিছে গঞ্জন
ডাকিছে সারঙ্গ পাখী।
সঙ্কেত করিয়া অরণ্যে আনিয়া
কোথা রৈল বাঁকা আঁখি॥

ললিতা প্রবোধ দেন। কৃষ্ণকেও গুরুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে হবে। হয়তো তাঁরা এখনো জেগে আছেন।

সেই হেতু ব্যাজ সে নহে নিলাজ
ব্যক্ত হৈলে লাজ পাবে।
আছে গো যামিনী হও না রাগীণী
বঁধু এস্থে মধু খাবে॥

এদিকে রজনী অন্ধকার থাকতে থাকতেই কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়তে চান। চন্দ্রাবলী কিন্তু নাছোড়বান্দা। কৃষ্ণ লোকলজ্জার ভয় দেখান। কিন্তু চন্দ্রাবলীকে ভোলানো এত সহজ নয়। তাঁর সাফ জবাব –

কে দেখিবে কে শুনিবে পাছে ব্যক্ত হয়।
সে ভয় আমার আছে শুধু তব নয়॥
নষ্টারূপ হঞে এত নষ্টা কর কারে।
সব জানি জানাইতে হবে না আমারে॥

কৃষ্ণ যে রাধার কুঞ্জে যাবার জন্যই ব্যাকুল চন্দ্রাবতী সেকথা জানেন। জানেন বলেই কৃষ্ণকে ধরে রাখার ইচ্ছা আরো প্রবল। তাছাড়া—

অনাআসে কৃষ্ণধন পায় যেই জন।
সে কি কভু সে রতনে করে অযতন ॥
যতনে পাএেছি নাথ যতনে রাখিব।
থাকিতে শর্বরী হরি কভু না ছাড়িব ॥

প্রভাতে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে বিদায় নিলেন। অতৃপ্তহৃদয়া চন্দ্রাবলী হাসিমুখে বিদায় তো দিলেনই না, অধিকন্তু দিলেন অভিশাপ।

যেমন য়ামারে বধু করিলে দুঃখিত।
ধর্ম যদি থাকে ফল পাইবে নিশ্চিত ॥

এদিকে বংশীধারীর প্রস্থান, ওদিকে মান। রজনী গতায়ু, কৃষ্ণ, অনাগত উৎকন্ঠিতা হলেন মানিনী। বিরহ-সন্তপ্তা, মানদগ্ধা রাধা সখীদের বললেন—

নিকুঞ্জে আইলে তারে বাহির করিবে।
যদি কোন কথা কয় নাইক শুনিবে ॥

আদেশানুসারে রাধা-মিলনোৎসুক কৃষ্ণের পথরোধ করলেন ললিতা। কৃষ্ণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে বললেন,

জান না রাখাল জে বংশে ভূপাল
জমের প্রতাপ তার ॥
সকলে যাইয়া কংসকে কহিয়া
তোমারে সিখাব তবে।
সেথা নাগরালি কর গিয়া কালি
দেখিবে কি হন্যে হবে ॥

শ্যাম কহে কংস ভএ বলে কি দেখাও ভয়।
আমার বিক্রম বিধিমতে সে জানয় ॥
আঘাবকা তৃণাবর্ত য়াদি কংসচর।
সকলে মারিনু তার কি দেখাও ডর ॥

এরপর পনেরটি (১৯-৩৩) পাতা নেই। ৩৪ পৃষ্ঠা থেকে পাচ্ছি কৃষ্ণবিরহকাতরা রাধার প্রহরানুক্রমিক ব্যথা ও বেদনার লিপিচিত্র। বর্ণনাকারী ললিতা স্বয়ং। শ্রীমতীর প্রথম প্রহরের বিবরণের শেষে প্রজ্বলন্ত আক্ষেপ ও অভিযোগ জ্বলন্ত জিজ্ঞাসায় কঠিন ও কঠোর।

কেন আসি বলে　　　কামিনীর গলে
আসারূপ ফাঁসি দিলে।
ওহে বনমালী　　　হেন নাগরালি
বল কোথায় শিখিলে ॥

দ্বিতীয় প্রহরে—

রঙ্গে ভঙ্গে তব সঙ্গে অনঙ্গে তুষিতে।
সাজায় বাসর সয্যা রাজার দুহিতে ॥

এবং

তরুর পল্লব পড়ে হয় বা ঝঙ্কার।
এল বলে ঘর বাড়ি হৈল কতবার ॥

শ্রীমতীর তৃতীয় প্রহরের বিবরণে চমৎকারিত্বের পরিচয় প্রকট। এই অংশে বিরহিণী নায়িকা কামের শিকার হয়েছেন, শেষপর্যন্ত বৃন্দার পরামর্শে শিব সেজে আত্মরক্ষা করেছেন উদ্যতধনু মদনের নিশ্চিত আক্রমণের হাত থেকে।

সঙ্গে সঙ্গি লয়ে রঙ্গে অনঙ্গ প্রবল।
অনাথিনী দেখি কুঞ্জ আইলা করি বল ॥
সবাই রমণি মোরা দেখিয়া মদন।
পাইনু প্রাণেতে ভয় কি হবে এখন ॥
কে আজি রক্ষণ করে কামের করেতে।
রক্ষক আছিল জে সে নাই নিকটেতে ॥
...　　　..　　　...
ভাগ্যে ছিল বৃন্দা দুতি মনে বিচারিয়া।
লয়ে গেলা শ্রীমতিরে গোপন করিয়া ॥
বস্ত্র আভরণ সব খসাঞ্চ পেলিল।
সোনা অঙ্গে বৃন্দা দুতি ছাই মাথাইল ॥
...　　　...　　　...
সিববেশ রাধার দেখিয়া রতিপতি।
দলবল লইয়া পালায় সিঘ্রগতি ॥
তুমি ত রক্ষক স্যাম আছ গোপিকার।
কালি কাম হাথে ভাল কর্যো ছিলে পার ॥

শ্রীমতীর চতুর্থ প্রহরের বিরহার্তির বর্ণনে ললিতার কণ্ঠ বেদনায় বিধুর, কটাক্ষে কর্কশ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে তীব্র ভৎর্সনা করে ললিতা বলেছেন,

কার কুঞ্জে সুখ ভুঞ্জে বঞ্চিলে রজনি।
কোথায় পাইলে বঁধু এমন রমণি॥
সর্ব্বরি করিলে সেস রহস্য কৌতুকে।
কি দুঃখে ত্যেজিয়া হেথা আইলে কী সুখে।
সিঘ্র তথা জাও বঁধু করি নিবেদন।
পাছে তার দসা হয় রাধার মতন॥

অগত্যা কৃষ্ণ, ব্রজের চিরাচরিত প্রথায়, রাধার পায়ে ধরলেন। তবু মানিনীর মান ভাঙল না। কৃষ্ণ আঁখিজলে বিদায় নিলেন। কালীকৃষ্ণ দাসের কাহিনীতে কলহান্তরিতা রাধার চোখের জলের কথা নেই, পক্ষান্তরে আছে প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্মর প্রতিজ্ঞা।

আমারে জেমন করেছে দহন
জলন্ত বিচ্ছেদানলে।
সে জ্বালা সকল করিব সিতল
শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু জলে॥

কবির কৃষ্ণ শ্রীমতীর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন। কাহিনীর পরবর্তী অংশের অধিকাংশ পাতাই তাঁর নয়নজলে আর্দ্র ও আকুল। অনেক ভেবেচিন্তে বিদেশিনী বেশে কৃষ্ণ শ্রীমতীর নিকটে গেলেন। নিজেকে কলহান্তরিতা রমণীরূপে তুলে ধরলেন রাধার কাছে, শোনালেন কল্পিত দুঃখকাহিনী।

দৈবে এক রজনিতে নাহি পারিল আসিতে
আমার নিকটে প্রাণপতি।
বিধির নির্বন্ধ জাহা কে খণ্ডিতে পারে তাহা
তাহে মোর হইল কুমতি॥
নিসি জাগি একাকিনি মানে হঞা অভিমানি
না দেখিল পতির বদন।
মান ভাঙ্গিবার তরে নানা মত জত্ন করে
শেষে সাধে ধরিয়া চরণ॥
তবু না ভাঙ্গিল মান পতি হঞে অপমান
সে রাগেতে বিরাগি হইয়া।

চলি গেলা প্রাণনাথ সিরে হানি বজ্রাঘাত
পুনঃ নাই আইলা ফিরিয়া ॥

বিদেশিনীর জীবন-কথার সঙ্গে নিজের বুকের ব্যথার মিল খুঁজে পেলেন রাধা। ধীরে ধীরে তিনিও অনাবৃত করলেন নিজেকে। বিদেশিনী নানা দৃষ্টান্তে কৃষ্ণের অপরাধ-ক্ষালনের প্রয়াস করলেন।

দেখ প্রত্যক্ষেতে নিষ্কল চাঁদেতে
আছে কলঙ্কের দাগ।
সোল কলা নয় হ্রাসবৃদ্ধি হয়
তবু চকরিনি নিরাগ ॥
ওগো কমলিনি দেখ কমলিনি
ফুটে রবি উদএতে।
তার মুখ চায় সে দেখ তাহায়
দগ্ধ করে কিরণেতে ॥

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। পক্ষান্তরে রাধার সন্দেহ হল কৃষ্ণের অপরাধ-ক্ষালনে বিদেশিনীর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে। তিনি ক্রোধে কটূক্তি করলেন,

এক কাল দায় প্রাণ জ্বলে যায়
ওই সে কাল রমনি।
কপট ছলায় ভুলাবি আমায়
ওরে বুঝেছি তখনি ॥

শ্রীমতীর মুখে কালো রূপের নিন্দা শুনে ছদ্মবেশী বিদেশিনী কালোরূপের গুণ-কীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন –

যে ভুরভঙ্গিমাতে ভুলে ত্রিভুবন।
গৌর বর্ন্ন নহে সেহ কালিয় বরণ ॥
চক্ষের পুত্তলি তারা কালরূপ ধরে।
আর দেখ কাল কেসে মুখ শোভা করে ॥

শ্রীমতী আর সহ্য করতে পারলেন না; তিনি বিদেশিনীকে তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করে চলে যেতে বললেন। কৃষ্ণের কৌশল ব্যর্থ হল। কবি জানালেন –

গোস্বামির গ্রন্থে আছে এই সে প্রমাণ।
বিনা বাজাবার ছলে তথা ভাঙ্গে মান ॥

কিন্তু পুরানেতে তার প্রমান না পাই।
যাহা আছে পুরানেতে রচিলাম তাই ॥

এর পর আরম্ভ হয়েছে "বসন্ত আগমনে শ্রীমতির বিরহ" বর্ণনা। শ্রীমতীর –

সজল জুগল আঁখি কাঁপে ওষ্ঠাধর।
চঞ্চল হইল চিত্ত কামেতে কাতর ॥
... ...
অন্তর আকুল অতি কৃষ্ণের কারণে।
প্রকাশ করিতে নারে মান পড়ে মনে ॥

একদিকে মিলনের দুর্মর বাসনা, অপরদিকে মানের দুর্বিষহ যন্ত্রণার যুগপৎ প্রকাশে শ্রীমতীর অবস্থা দাঁড়াল –

অবরূপ ভাব তার হইল তখন।
দ্বিভাগ হইল তার অঙ্গ সহ মন ॥
অর্দ্ধমনে কৃষ্ণধনে আনিবারে চায়।
অর্দ্ধমন মানে মগ্ন মানা করে তায় ॥

শেষপর্যন্ত প্রাণের দাবীর কাছে মনের অহঙ্কার পরাজয় স্বীকার করল।

কিন্তু প্রান প্রেমপক্ষ্যে হইল রাধার।
সে হেতু মানের গর্ত্ত খর্ব্ব হইল তার ॥
বিসম কামের বানে অস্থির করিল।
প্রকাসিতে নারে দুঃখ অন্তরে রহিল ॥

জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই আরম্ভ হল "শ্রীমতির মানত্যাগারম্ভ আবর্ত্তন"। বৃন্দা সুসময় জেনে কৃষ্ণের নিকটে গেলেন পরামর্শ দিতে। কৃষ্ণকে পরামর্শ দিলেন,

জোগিবেশ হয়ে তুমি রাই গৃহে জাও।
ভিক্ষার ছলেতে তার মান ভিক্ষা চাও ॥

বৃন্দার পরামর্শে কৃষ্ণ যোগীবেশ ধারণ করে রাধার নিকটে গেলেন ভিক্ষা চাইতে। প্রথমে কুটিলা এগিয়ে এল ভিক্ষা দিতে।

জোগি বলে তব হস্তে ভিক্ষা লব নাই ॥
স্থনিয়া কুটীলা কহে কুণ্ঠীত হইয়া।
দুঃখিনির ভিক্ষা নাই লবে কি লাগিয়া ॥

জোগি বলে আমার আছে এই পন।
সতি হস্ত ভিক্ষ্য কভু নাইল ভোজন॥

শেষপর্যন্ত রাধা এগিয়ে এলেন ভিক্ষা দিতে। ভিক্ষুক পেশ করলেন তাঁর প্রার্থনাপত্র।

দয়া করি যদি মোরে ভিক্ষা দেহ দান।
তবে সে লইব ভিক্ষা জদি দেহ মান॥

রাধা—"ইঙ্গিতে ইসত হাঁসি তথাস্তু বলিল।" রাধাকৃষ্ণের মিলনের মাধ্যমে পালা সাঙ্গ হল।

পুথির ভাষায় ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রমাণ ও পরিচয় সুপ্রচুর। অস্থানে চন্দ্রবিন্দু অজস্র। যেমন, পুঁথি, জঁটা ইত্যাদি। 'কেন' সর্বত্র 'কেনে"। ও>উ (তুমার<তোমার, পুহাইল<পোহাইল)। মধ্যস্বর ও>অ (কিসরি∠ কিশোরী) হঞে, পাঞে, ধাঞে, খসাএ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ এই উপভাষার সুনিশ্চিত প্রমাণ।

কালীকৃষ্ণ দাস শক্তিশালী কবি। তাঁর কল্পনাচাতুর্য এবং সরস বর্ণনাভঙ্গি অবশ্যই প্রশংসনীয়। ভক্তের দৃষ্টিতেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণনা করেছেন তিনি। কিন্তু তাই বলে সহজ কৌতুকবোধটুকু বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বৃন্দার পরামর্শে শিবের বেশ গ্রহণ করে শ্রীমতী যখন মদনের আক্রমণ প্রতিহত করলেন এবং মদনকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন অনেকখানি কৌতুক কণ্ঠে নিয়ে কবি তখন আমাদের শোনালেন—

কালীকৃষ্ণ দাস বলে কথা মিথ্যা নয়।
আমিহ সাজিয়া ভূত দেখাইছি ভয়॥

কবির কল্পনাশক্তি ছিল এবং সে কল্পনাকে রূপদানের উপযুক্ত বাণী সাধনাও ছিল। পুথিটি অবশ্যই বিশদ গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

সঙ্কেত সূত্র—

১, শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

বঙ্কিম রহস্য

শিরোনামটি সম্পর্কে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতুক-প্রিয়তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো 'রহস্য' নেই। কথাটি বলতে হল এই কারণে যে, গ্রামে-গঞ্জে 'রহস্য' শব্দটি এখনো তার একদা-প্রচলিত অর্থ টি ধরে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস করলেও শহরজীবনে শব্দটি ক্রমেই গোয়েন্দা গল্পে জাঁকিয়ে বসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও হাস্যকৌতুক বা ঠাট্টা তামাসা অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। দীনবন্ধু সম্পর্কে তাঁর কথা 'দীনবন্ধু চিরকাল রহস্য-প্রিয়…।' 'লোক রহস্যে'র কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[১]

বন্দে মাতরম মন্ত্রের স্রষ্টা, মানবভাগ্যের দুর্নিরীক্ষ ট্রাজেডির নিপুণ ভাষ্যকার, বাংলা উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের পথদ্রষ্টা এবং সার্থক স্রষ্টা, আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের অখণ্ড রূপকার এবং অতন্দ্র প্রহরী অভিজাত রাজপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাসকুশলতার বিচিত্র পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শতধা বিকীর্ণ।

পরিহাস রসিকতা শুধু যে মানসিক ঔদার্য এবং চারিত্রিক মাধুর্যের প্রভা ও প্রত্যয় তাই নয়, যে-কোনো বড়ো মাপের সাহিত্যিকেরই তা অনিবার্য ও আকর্ষণীয় চরিত্র লক্ষণ। হাসির তুলনায় অশ্রু যত মহৎ, মনোজ্ঞ বা অভিজাত হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, অশ্রু নয়, হাসিতেই মানুষের যথার্থ পরিচয়। অশ্রু যত মহৎ ও মূল্যবান হোক না কেন চোখের কোণে বাসা বাঁধতে তার বড়ো একটা বিলম্ব হয় না। অন্ততঃ এ বাবদে ইতর প্রাণীকুলের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য যৎসামান্য। পশুর চোখেও জল ঝরে। কিন্তু হাসি সম্পূর্ণরূপে মানুষের নিজস্ব। অবশ্য হায়েনার হাসির কথা শোনা যায়। তবে সে হাসি বড়ো ভয়ঙ্কর। অস্‌কার ওয়াইল্ড যথার্থই বলেছেন যে, বন্ধুর বিপদে যে-কোনো মানুষ সহানুভূতি বোধ করতে পারেন কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানুষ না হলে বন্ধুর সম্পদে সুখানুভূতি কিছুতেই সম্ভব হয় না। বান্ধবের সংজ্ঞা নিরূপণে চাণক্য যে সর্বাগ্রে উৎসব দিনের আপনজনদের

কথা স্মরণ করেছেন সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। আসল কথা এই যে, প্রশস্ত বক্ষেই পরিহাসপ্রিয়তার নিত্য অধিবাস। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, বাংলা সাহিত্যের সেই প্রশস্ত বক্ষ এবং উন্নত ললাট মানুষটিকে প্রথম দর্শনের মুহূর্তটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে চিরদিন অম্লান ছিল। পরিহাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের সম্পদ কিন্তু রস ও রুচিতে তিনি অভিজাত রাজপুরুষ। এখানেই গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে বা সতীর্থ দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের স্মৃতি-ধৃত একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে বিনা মন্তব্যে তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, "শৈশবে আমার পিতৃদেবের কাছে গল্প শুনেছি কোনও এক সময়ে বঙ্কিম ও দীনবন্ধু একই সঙ্গে খুলনায় কর্মরত ছিলেন। দীনবন্ধু পোস্টাল সুপার আর বঙ্কিম ডেপুটি কালেক্টর। বাঙ্কমের আদালতে কোনও এক রমণী শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনয়ন করেন। মামলায় বাদিনীকে উপস্থিত হতে বলা হয়। বাদিনী রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারের কন্যা ও বধূ এবং সে-কারণে পর্দানশীন। আদালত কক্ষে শুধু হাকিম, উকিল ও পেস্কার উপস্থিত। লজ্জাবতী বাদিনী কথা বলেন না শুধু ঘোমটা টানছেন অথচ তিনি বেশ সুঠাম দেহের অধিকারিণী। অকস্মাৎ হাকিম মামলা স্থগিত ঘোষণা করে আদালত কক্ষ ত্যাগ করলেন। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞ হাকিমী-দৃষ্টিতে বাদিনীর মুখে দীনবন্ধুর গোঁফ জোড়া দেখতে পেয়েছিলেন। দীনবন্ধু স্বরসিকতায় পুলকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে বশে আনতে নিমচাঁদের পিতার রীতিমত আযাস স্বীকার করতে হয়েছিল।"[২] রবীন্দ্রস্মৃতির সঙ্গে এই স্মৃতিকথার গভীর মিলটুকু লক্ষণীয়।

দীনবন্ধু বা ঈশ্বর গুপ্ত যে ভিন্ন জাতীয় রহস্যরসিক, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'ব্যঙ্গ-প্রণেতা' ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও সে কথা স্বীকার করেছেন এবং সেই-সূত্রে ইংরেজ-বর্জিত বাংলার সঙ্গে ইংরেজ-অর্জিত বাংলার রঙ্গরসের প্রকৃতিগত পার্থক্যটুকুও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। "আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া. কখন কুচ করিয়া

ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি —লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভয়ে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে।"৩

বঙ্কিম-রহস্যে পূর্বাপর দুই রীতিরই সাক্ষাৎ পাই। যেখানে তিনি পূর্বরীতিকে অনুসরণ করেছেন সেখানে তাঁর হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, বাহুতেও অমিত বল এবং শিক্ষাও বিচিত্র—ঠিক প্রবীণদেরই মতো; পার্থক্য শুধু এই যে তাঁর রুচিবোধে নবাগত যুগের অসংশয়িত ছাপ। স্থূল উদাহরণ হিসেবে পাঠককে মুচিরাম গুড়ের কথা স্মরণ করতে বলি। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পাকা লাঠি, লক্ষ্য অভ্রান্ত, মারও মোক্ষম। অপরদিকে কমলাকান্তের হাতের সরু লান্‌সেটখানি কখন যে ব্যথার স্থানে কুচ করে বসে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই হৃদয়ের অনেকটা শোণিত ক্ষতমুখে বের হয়ে যায়। মোট কথা রস ও রুচিগত উৎকর্ষে বঙ্কিম-রহস্য পূর্বগামীদের মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যে পরিহাসরসের এক নতুন জাত ও ধাত সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীল প্রবন্ধরাজ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র 'রহস্য' লীলার রসাস্বাদনই প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য।

আমরা জ্ঞাত আছি যে, বঙ্কিম-রহস্যের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে তিনটি রচনা বিদ্যুচ্চমকে স্মরণপথকে আলোকিত করে সেগুলি হল লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। লোকরহস্যে রঙ্গের সঙ্গে ব্যঙ্গ বাক্যের সঙ্গে অর্থের মতো ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। কমলাকান্তের দপ্তরে অশ্রুস্নাত হাস্যের অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য। মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত রঙ্গের তুলিতে আঁকা উপভোগ্য ব্যঙ্গের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। কমলাকান্ত চক্রবর্তী এবং মুচিরাম গুড় বঙ্কিম-রহস্যের স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপে সাহিত্যের অমরাবতীতে চির অমর। কিন্তু শুধু এই তিনটি চিরস্মরণীয় রহস্য-গ্রন্থে নয়, তাঁর উপন্যাস এবং মননধর্মী প্রবন্ধ নিবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয়তার প্রশ্নাতীত পারঙ্গমতা এবং পরম রমণীয় পরিচয় রচনাটিকে আলোকিত এবং পাঠককে পুলকিত করে। বঙ্কিম উপন্যাসে হাস্যরস সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন; কাজেই সে প্রসঙ্গে না গিয়ে শুধুমাত্র তাঁর মননধর্মী এবং গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলির মধ্যেও

রহস্যের যে ফল্গুধারা ভাবনার ভূমিকে পেলব এবং সেই ভূমিখণ্ডে জাত চিন্তাক্রম গুলিকে কৌতুককলিতে নয়নাভিরাম করে তুলেছে তার কথাই বলব। হাকিমী গাম্ভীর্যের অন্তরালে রহস্য-মনস্ক বঙ্কিমচন্দ্রকে বারংবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই তাঁর গুরুগম্ভীর রচনার তর্ককণ্টকিত পথে। এতে শুধু যে পথিকের পথ চলা সহজ ও সুগম হয়েছে তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তর্কগুলি সুবোধ্য এবং চিন্তাগুলিও সুপাচ্য হয়েছে। হাস্যরস যে গুরু বিষয়ের গৌরব-অপহারক নয়, পক্ষান্তরে পরম পরিপোষক, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত তাঁর এই মননশীল প্রবন্ধগুলি। সূর্য-রশ্মিমণ্ডিত মেঘখণ্ডের মতো রহস্যমণ্ডিত উক্তিগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার আকাশকে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যদান করেছে যা অন্য কোনোভাবে কদাচ সম্ভব বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'নামঞ্জুর গল্পে'র নায়ক বলেছে, "...আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে—যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।" একথা বঙ্কিমচন্দ্রও অনায়াসে বলতে পারতেন।

সর্বপ্রথম কৃষ্ণচরিত্রের কথাই উল্লেখ করতে হয়। স্মরণীয় যে, 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ও প্রয়াস 'প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস'। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেসব অলৌকিক আখ্যান ও উপাখ্যান সেগুলিকে তন্ন তন্ন করে যাচাই করে তিনি যথার্থ কৃষ্ণস্বরূপ আবিষ্কারে কৃতসংকল্প। আধুনিক পরিভাষায় এ এক অত্যন্ত পরিশ্রমী গবেষণা। স্বাভাবিক কারণেই এখানে রহস্য করার অবকাশ অল্প। কিন্তু রস যার সহজাত, রসিকতা তাঁর স্বভাবধর্ম। কৃষ্ণা চতুর্দশীর সর্বনাশা রাতেও চাঁদের মুখে একফালি হাসি আমৃত্যু বজায় থাকে। কথাটা আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের, অমিতের মুখে শোনা। কিন্তু খাঁটি কথা। তর্ক ও তত্ত্বের কাঁটাবনেও বঙ্কিমচন্দ্র দুহাতে কৌতুকের ফুল কুড়িয়েছেন। এই গুরুতর প্রসঙ্গ বিবেচনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় এরূপ ক্ষেত্রগুলি পরিহাসের শ্রীক্ষেত্র, বঙ্কিম-রহস্যের রমণীয় বিহারভূমি।

কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমণিকার শেষাংশে বিদেশী মনোভাবাপন্ন স্বদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে তিনি যে 'রহস্য' করেছেন তাতে রঙ্গের সঙ্গে ব্যঙ্গের ভাগ সমান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা

ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারিকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না।"

বেবর সাহেবের মতবাদের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যের লগুড় তুলে ধরেছেন। বেবর সাহেব বলেছিলেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণে অর্জুন শব্দ থাকলেও তা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত এবং তদ্দ্বারা তৃতীয় পাণ্ডবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও বলেছেন, "কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন ; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ" কিন্তু কাজে-কর্মে তিনি পরিহাসের তূণ থেকেই প্রতিবাদের শর নিক্ষেপ করেছেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'রহস্য' করেছেন। বলেছেন, "আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অর্জুন, কেননা ফুল শাদা ; ইহার নাম ফাল্গুন, কেননা, ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ইন্দ্রের নামও অর্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।" এ একেবারে বুনো ওলের মুখের মতো বাঘা তেঁতুলের জবাব। এক কথায় অকাট্য বঙ্কিম-রহস্য।

পুরাণের পল্লবিত কল্পনার পক্ষচ্ছেদনে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নিঃসন্দেহে কৌতুকাক্রান্ত। পূতনার অর্থ পরিবর্তনের তাবৎ পথটাই কৌতুকের রাজপথ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "পূতনা যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনিকেও বলে ; অতএব মহাভারতে পূতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল ; রূপকে পরিণত হইল। পূতনা 'বালঘাতিনী' অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায় ; 'অতিভীষণা' ; তাহার কলেবর 'মহৎ' নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী। হরিবংশে দুটি কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিনী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই ; এখন আখ্যান বা ইতিহাস। তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পূতনা রোগও নয়, মায়াবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলা এক একটা লাঙ্গল-

দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ এতবড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।" পুতনার এই চতুর্থ অবস্থাতেই পরিহাস কিন্তু পঞ্চমে।

কৃষ্ণের একাধিক বিবাহের স্বপক্ষে প্রমাণাভাব এবং এ বাবদে বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্তের অভাবের কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যে যে তাঁহাকে স্যমন্তকমণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।" শ্লেষগর্ভ-কৌতুকযুক্ত বঙ্কিম-রহস্যটুকু পাঠককেও খুসী করে।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের পরিণামে অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কারণে ক্রুদ্ধ বলরাম যখন লাঙ্গল তুলে ভীমবধে ধাবমান তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে কৌতুকের সুর। তাঁর সরস সংযোজনটুকু স্মরণীয়—"বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই লাঙ্গল, এইজন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁর এই বিড়ম্বনা, যদি কেহ একথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না।" নির্ভেজাল কৌতুক এবং নিখাদ বঙ্কিম-রহস্য।

মহাভারতের কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বারংবার 'রহস্যের' গন্ধ পেয়েছেন এবং স্বাভাবিক কারণেই সেইসব প্রসঙ্গ বর্ণনায় বঙ্কিম-রহস্যও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। নিম্নোদ্ধৃত উদ্ধৃতিগুলি দীর্ঘ হলেও বঙ্কিম রহস্যের সম্যক রসাস্বাদনের জন্য অপরিহার্য।

(ক) "বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।....দ্রুপদরাজ কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি কেন কাঁদিতেছ?" তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, "আইস, দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশাক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা

পাশাক্রীড়া করিতেছিলেন তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারটি ইন্দ্র আছেন। শেষে মহাদেব পাঁচজন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।" সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, "ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন" !!! সেই পাঁচজন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মহাদেব মেয়েটিকে হুকুম দিলেন যে, "তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও।" সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছি পাকা। পাকা গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন !!!"

(খ) "স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিৎ প্রথা একালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যেদিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সেদিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেইদিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না ; এদিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্যন্ত নিমগ্ন হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না—গোপীদিগের 'কর্মফল' দিবার ইচ্ছা আছে। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন-মতেই প্রকাশ করিতে পারি না।"

এই শেষোক্ত উপাখ্যানে বঙ্কিম-রহস্য যে প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠেনি শুধু রুচির মুখরক্ষার খাতিরেই, সতর্ক পাঠককে নিশ্চয়ই সে কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "...ঘটোৎকচবধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।" লক্ষণীয় যে, এই 'বীভৎস কাণ্ডে'ও তিনি তাঁর রহস্য ভাণ্ডের

অনেকটা রসই অকাতরে বর্ষণ করেছেন। সেই কাণ্ডবেষ্টিত বঙ্কিম-রহস্য-লতিকার বর্ণশোভা নিম্নরূপ—

"হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটিকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তারপর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থে দলবল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধি বিপর্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতিযোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানুষ যুদ্ধ করিতেছিল।...

এখন এই দিন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্যদিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য হইল।...শেষ কর্ণও আর সামলাইতেই পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, একজনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না...। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জুন বধার্থে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদ পরিমিত শরীর ধারণ করিল এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল!

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তারপর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধহয় তাঁহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোকাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে, এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপরে নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন!"

গল্পটিকে রসিয়ে রসিয়ে বলার পর বঙ্কিম রহস্য শেষপর্যন্ত ব্যঙ্গের লগুড়া-

ঘাতে প্রাচীন হিন্দু কবিকে ধরাশায়ী করেছে।

লক্ষণীয় যে, পুরাণের অলৌকিক কাহিনীগুলির বিচার সভাতেই বঙ্কিম-রহস্য গূঢ় ও গাঢ় হয়েছে। খাণ্ডবদাহ এই রকম একটি কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "গল্পটা বড আষাঢে রকম।" বঙ্কিম-রহস্যের আখরে গল্পটা এই রকম—

"ঘোরতর যজ্ঞ—বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! বড় বিপদ, খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা যেরকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা Similia Similibus Curanter হিসাবে। তিনি বলিলেম, "ভাল খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে।" শুনিযা অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন।...আগুন সাতবার জ্বলিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার?" তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনা জানাইলেন—খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে—খাইতে দেয় নাই।" তখন কৃষ্ণার্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত।...ইন্দ্র পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিলেন—অর্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইলওয়ে টনেল্ করিবার বড় সুবিধা হইত।) শেষে ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নর-নারায়ণ প্রাচীন ঋষি। দৈববাণীটা বড় সুবিধা—কে বলিল, তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

স্বাভাবিক কারণেই এইসব প্রসঙ্গে বঙ্কিম-রহস্য শুধুমাত্র কৌতুক কটাক্ষে সীমাবদ্ধ থাকেনি, শ্লেষ-ব্যঙ্গে ক্ষিপ্ত ও দীপ্ত হয়েছে। 'কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত ও মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাজক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র;

তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।"

'অর্ঘ্যাভিহরণ' প্রসঙ্গে বলেছেন, "মহারাজা শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন' তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে 'প্রিয়চিকীর্ষু", "অপ্রাপ্তলক্ষণ" ইত্যাদি চুটকিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড বড গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুক্কুর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব ইত্যাদি।"

বঙ্কিম-রহস্য ভাগবতকেও পরিহার করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "...ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তারপর একদিন, দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবাদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণব চূডামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।"

পুরাণের অলৌকিক বা প্রক্ষিপ্ত কাহিনীর শবব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থানেই তাঁর মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারেননি। ফলে 'রহস্য' ও খোশমেজাজ হয়নি। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলির উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র তিক্ত-বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন, "প্রায় সবগুলিতেই একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে।" এ রঙ্গ নয়, কঠিন ব্যঙ্গ; স্মিতহাস্য রহস্য নয়, তীব্রঘাতী শ্লেষ।

বিবিধ প্রবন্ধের নানাস্থানে, নানা প্রসঙ্গে বঙ্কিম-রহস্য রঙ্গেব্যঙ্গে উতরোল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাচর্চার মধ্যেও রহস্য রসের অন্তঃশীলা প্রবাহ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। সেই সূত্রেরই বঙ্কিম-টীকা—"বাঙ্গালী "সপ্ সপ্" করিয়া খায়, "গপ্ গপ্" করিয়া গেলে, "হন্‌হন্" করিয়া চলিয়া যায়, "দুপ্ দাপ্" করিয়া লাফায়।"[৪] শুধুমাত্র সূত্রবিস্তারের প্রয়োজনেই এরূপ উদাহরণ একথা ভাবা ঠিক হবে না। এর মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ বঙ্কিম-রহস্যেরও অনিবার্য এবং অনুপম আত্মপ্রকাশ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও সময় ও সুযোগমতো হাস্যরসের অবতারণা রবীন্দ্রনাথের রচনারীতিরও লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য।

"বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের কটাক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "...বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃত-বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।"

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার প্রশংসা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের। আলালী ভাষার প্রশংসা এবং উক্ত ভাষায় গ্রন্থরচনার স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া।" কণ্ঠে বিরক্তির চিহ্ন থাকলেও ওষ্ঠাধরের হাসিটুকুও লক্ষণীয়।

বিবিধ প্রবন্ধের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে দেশের তথাকথিত শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিগূঢ় ব্যঙ্গ—"মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল।...বিলাতে কানা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন, ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিক-চাঁদের সেই ভাবনা।" শুধুমাত্র নামোচ্চারণের মাধ্যমেই 'রহস্য' কতখানি গূঢ় ও গাঢ় হতে পারে 'নদের ফটিকচাঁদ' তারই প্রমাণ।

বিবিধ প্রবন্ধের 'রামধন পোদ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "একটি রোমশূন্য গৃহমার্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উঁচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস

করিয়া গেল সন্দেহ নাই।" মার্জারীর মনের কথা আমরা জানি না, তবে বঙ্কিমরহস্য যে গূঢ় শ্লেষযুক্ত সে কথা বুঝি।

বিবিধ প্রবন্ধের বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্কিম-রহস্য মূলত ব্যঙ্গমূলক।[৫] 'সাম্যে'ও তাই। 'সাম্য' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বড়লোক ছোটলোকের পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে ছোটলোকের দুর্গতির চিত্র রচনায় বঙ্কিম-রহস্যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাত্রাই বেশী। তিনি বলেছেন, "কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড়লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।"

কল্পিত নিন্দকের দৃষ্টিতে বড়লোক ছোটলোকের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি প্রকারান্তরে ব্যঙ্গমূলক পরিহাসকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। "যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বড় লোক।"

বঙ্কিম-রহস্যের 'সাম্য'-দৃষ্টি চরমে উঠেছে হাকিমের চোখে দেখা আদালতে, "আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই।"

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে।"

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গুরুতর বৈষম্যের কথা বলার সময়েও বঙ্কিম-রহস্যের ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ—"একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয়-স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন,…।" প্রবন্ধটির শেষাংশে

বঙ্কিম রহস্য-শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে, "আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি!" উত্তরটাও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, "যায় না; কেননা, তাহাতে রঙ তামাসা কিছু নাই।"

তা না থাক, কিন্তু বঙ্কিম-প্রশ্নে রঙ তামাসা যে মারাত্মকরকমভাবেই আছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

সে তুলনায় 'বিজ্ঞান রহস্যে' বঙ্কিমচন্দ্র নেহাতই কৌতুকপ্রিয়। 'বিজ্ঞান রহস্য' বর্ণনায় বঙ্কিম-রহস্য কান্তকোমল কৌতুকে উচ্ছ্বসিত। 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই শুনি—"এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোসামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্যসামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে, সাহেব অক্রুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংসবধ করিতে হইবে।" নির্ভেজাল এবং নিরুপম বঙ্কিম-রহস্য।

'গগন পর্যটন' প্রবন্ধের প্রারম্ভাংশটিও কৌতুকদীপ্ত, বঙ্কিম-রহস্যের রমণীয় অবতরণিকা। "পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার ন্যায় স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন; কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন।"

'পরিমাণ-রহস্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব গণনা করেছেন এইভাবে—"অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য পর্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কতকালে সূর্যালোকে যাইতে পরিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেন অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে,

তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্যালোকে পৌছান যায়। তর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেনে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেনেই গত হইবে।" অনায়াস-সাধিত বঙ্কিম-রহস্য, এর মধ্যে নিছক কৌতুক ছাড়া আর কিছু নেই। 'বিজ্ঞান রহস্যে' ক্বচিৎ কৌতুকের সঙ্গে কটাক্ষ আছে এবং সে কটাক্ষে ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে, তবে তা মারাত্মক কিছু নয়। 'গগন পর্যটনে' প্রথম ভূপতিত ব্যোমযানকে কেন্দ্র করে বিদেশীদের বিস্ময় ও বীরত্বের কাহিনী কৌতুক-কণ্ঠে বর্ণনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এদেশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন।"

স্মরণীয় যে, বিজ্ঞান রহস্য, 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ' কিন্তু লক্ষণীয় যে, বঙ্কিম-রহস্য সুযোগ পেলে সেখানেও আসর জমাতে কুণ্ঠা বা দ্বিধা অনুভব করে না।

তাছাড়া শুধু কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে, 'ধর্মতত্ত্বে'ও বঙ্কিম-রহস্য সুযোগের বিন্দুমাত্র অসদ্ব্যবহার করে না। 'ধর্মতত্ত্বে'র দশম অধ্যায়ে সমকালে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তির অভাব লক্ষ্য করে বলেছেন, "পিতা এখন "My dear father"—অর্থাৎ বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না।" শতাব্দী পূর্বে রচিত হলেও এ যে বর্তমানের রেখাচিত্র। সন্দেহ হয়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের বেনামীতে অনাগত-কালের কথাই বলেছেন। 'আত্মপ্রীতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুকে দিয়ে বলিয়েছেন, "যদি পরকে দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই 'না কুলায়" কথাটাই যত অধর্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঠা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না।" বঙ্কিম-রহস্য এখানে হিসাবশাস্ত্র বগলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত মানুষকে এক হাত নিয়েছেন—"এই প্রতিমা পূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাঁহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ—বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে

নিন্দা করে, তাহা আমাদের "অবশ্য নিন্দনীয়।" যুক্তিযুক্ত বঙ্কিম-রহস্য, একই সঙ্গে মধুর এবং মর্মান্তিক।

'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের' আলোচনার আসরেও বঙ্কিম-রহস্য সুযোগ পেলেই দন্তরুচিকৌমুদীর প্লাবন সৃষ্টি করেছে। ঋগ্বেদের এক অধ্যায়ের দেবতাদের তালিকা দিয়ে বলেছেন, "বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, ইঁহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব, আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের এবং মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবী দাওরা থাকুক, বেদ-কর্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?"

বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। তাছাড়া শুধু বেদে নয়, শতপথ ব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটি মাত্র দেবতার কথা আছে। অথচ হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। এই রহস্যের মীমাংসা আছে বঙ্কিম-রহস্যে "—এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত—"এক মে হাজার লাখ নেয় কহা বনায়কে।" দেবতত্ত্বের মীমাংসা বিদ্যাসুন্দরের ভাটের মুখে, বঙ্কিমরহস্যের অবিস্মরণীয় কারুকার্য। অঙ্কশাস্ত্রেও এই রহস্যের দখল পাকা।

ইন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চৌর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দনকাননে উর্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীডা করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী,—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্বল, কখন অসুর কর্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্তৃক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্তৃক পরাজিত, কখন দুর্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের

অভিশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন।" এখানে বঙ্কিম-রহস্যের মুখে বিদ্রূপের হাসি, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি।

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের রঙ্গরসিকতার পরিচয় অবিরল। "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।" তিক্ত বিদ্রূপ, এ রহস্যে রঙ্গ নয়, ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য।

"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের" ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ প্রসঙ্গে যে রহস্যের অবতারণা করেছেন তাতে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের অনুপান প্রায় সমান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নইলে বোধ হয় সরস্বতী অনেকদিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না।" বিড়াল এবং বানরের কথা স্মরণ রেখেই বলছি, গর্দভের প্রতি বঙ্কিম-রহস্যের বেশ কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে। গর্দভের গাত্রসৌরভের গন্ধ পুরাণ প্রসঙ্গে পেয়েছি, সরস্বতীর পালিত গর্দভগুলিকে এখানে দেখেছি। 'লোকরহস্য' আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত, তবু বৃহন্মুণ্ড, মহাপৃষ্ঠ, প্রকাণ্ডোদর, রজকগৃহভূষণ গর্দভের বঙ্কিম প্রশস্তির শেষটুকু স্মরণ করার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না—"বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এ জন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এ জন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এ জন্য তুমি বিদ্বান্, এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি মন্তব্যে শুধু রঙ্গরসিকতা নেই ভবিষ্যৎদৃষ্টির পরিচয়ও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই, তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি

কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিনী সভা, হাটে হাটভঙ্গিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কল্পতরু' গ্রন্থের একটি চরিত্রবিশেষের আলোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'একে পিসী, তায় বয়সে বড়' সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহি পাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী আপনাদের 'পরমারাধ্য পরম পূজনীয়' পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে ; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায়, দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে ? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায় পিসী কোন্ ছার ?" পুরো কাহিনীটিই পরিহাসের সুরে বর্ণিত, বঙ্কিম-রহস্যে রঞ্জিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে এক-একটি পঙ্‌ক্তি যেন পরিহাসের রসার্ণব থেকে সযত্নে সেঁচে তোলা বঙ্কিম-রহস্য-মুক্তা। কিছু নিদর্শন—"যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার শিখতে না শিখতে বধূরূপ পাথর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে ? (রামধন পোদ / বিবিধ প্রবন্ধ) ; "নৈবেদ্যে বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ ..।" (ঐ) ; "—রামমোহন রায় হইতে ফটিক চাঁদ স্কোয়ার—।" (লোকশিক্ষা / বিবিধ প্রবন্ধ) ; "—কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে।" (ঐ) ; "—যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ পদরজ ইহজন্মের সারভূত করে—" (সাম্য, প্রথম পরিচ্ছেদ) ; "...দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া অপ্সরানূপুরনিক্কণনিন্দিত মধুর আর্যভাষায় গ্রন্থিত কর।" (ঐ)

অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। আমরা সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ও প্রকাশিত

একটি 'মাসিক সংবাদ' উল্লেখ করেই কথা শেষ করব। এটি ঠিক সংবাদ নয়, সংবাদভাষ্য, বঙ্কিমরহস্যভাষ্য। "কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া দিল; অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্যসহ স্ত্রীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃতবোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অম্ল রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল "এখন থাকুক আগে ও মাছটি খান।" গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"উটি যদি না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।" আমরাও চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানব্বইটির মাথা খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।"[৩] রঙ্গ-ব্যঙ্গ-শ্লেষ-বিদ্রূপের চতুরঙ্গে সজ্জিত বঙ্কিম-রহস্যের এই শক্ত-সুন্দর রূপটি তাঁর সৃষ্টির বিশাল প্রাঙ্গণে বারংবার দীপ্ত ও দৃষ্ট।

বাংলা ও ভোজপুরী বিবাহগীত

বিবাহে মঙ্গলগীত গানের প্রথা সুপ্রাচীন এবং এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।[১] গাথা সপ্তশতীতে বরের নাম সমন্বিত নারীকণ্ঠে গীত এই গানের সুরে ভাসা কথাগুলি ভাবী-বধূর দেহে ভাব-কদম্বের কলি হয়ে ফুটেছে।

"সিজ্জন্তে মঙ্গল-গাইআঁহি বর-গোত্ত-দিন্ন-অন্না এ।
সোউংব নিগ্‌গও উঅহ হোন্ত-বহুআই রোমঞ্চে॥"

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও বিবাহ উৎসবে মঙ্গলগীত গানের সুর অশ্রুত নয়। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' থেকে জানা যায় যে, বিবাহ উপলক্ষে যেসব এয়োরা মঙ্গলগান গাইতে আসতেন তাঁদের তেল, সিঁদুর, পান ইত্যাদি দিয়ে সমাদর করা হত। সেই সম্বলটুকুও ছিল না বলেই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করে শিবকে চণ্ডীর কাছে মুখঝামটা খেতে হয়েছিল। শিব যখন কন্যার বিবাহ স্থির করে চণ্ডীকে বিবাহের আয়োজন করতে বললেন তখন—

"হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো আইসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে,
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে।"

যে-কোনো কারণেই হোক পরবর্তীকালে বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজে বিবাহে মঙ্গলগীত গানের প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী উচ্চবর্ণের বাঙালী সমাজে বিবাহ গীতের প্রচলন নেই। উচ্চবর্ণের বাঙালীর বিবাহে মন্ত্র আছে, শঙ্খ আছে, উলু আছে কিন্তু বিবাহগীত নেই। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দীভাষী অঞ্চলে উচ্চ-নীচ সমাজ নির্বিশেষে বিবাহগীত শুধু যে প্রচলিত তাই নয়, এগুলি এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের এক অত্যন্ত প্রিয় ও অপরিহার্য অঙ্গ। বিহার এবং বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজের বিবাহরীতির এই পার্থক্যটুকু চমৎকার ধরা পড়েছে বিহারবাসী বাংলার সদ্যপ্রয়াত সুখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে। তাঁর স্বর্গাদপি গরীয়সী

উপন্যাসে একটি বধূবরণ অনুষ্ঠানে বাংলার এবং মিথিলার বিবাহরীতির পার্থক্যটুকু কৌতুকে সিক্ত এবং পরিহাসে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালী কন্যার মুখে শঙ্খ ও উলুধ্বনি এবং মিথিলাবাসিনীদের কণ্ঠে বিবাহগীত এক উপাদেয় অম্লমধুর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী কন্যা বলেছে,—ইঃ হসৈছি কিয়্যা ? আঁহা লোকৈন— আহে-মাহে কি গবৈৎ গাইছি (ইস্ হাসছ কি ? তোমরাই বা আগড়ম বাগড়ম কি গাইছ ?)।" মৈথিল নারী জবাবে বলেছে, "ই ত মনুখ্যক্ গীত ছিয়েই হে, আঁহা লোকৈন্ গিদড জঁকা কি হুক্কি পাড়ৈৎছি ? (এতো মানুষের গান গো, তোমরা শিয়ালের ডাক কি তুলেছ ?)"। লক্ষণীয় যে, বাঙালী কন্যাটি দীর্ঘকাল মিথিলার মাটিতে বাস করে সেখানকার ভাষাটিকে আয়ত্ত করলেও রীতিনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু নিজস্ব মাটির বুকেই দাঁড়িয়ে আছে।

পশ্চিমাঞ্চলের বিবাহরীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিবাহরীতির মিল পাই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত মানুষের জীবন-ভূমিতে। সীমান্তবঙ্গের অনভিজাত মানুষ গীতের মালা নিয়েই ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ায়, গীতের শতদলে পা ফেলেই বধূ আসে বরের বাড়িতে। এখানকার বিবাহ অনুষ্ঠান আক্ষরিক অর্থেই এক অনবদ্য গীতানুষ্ঠান।

লক্ষণীয় যে, ভোজপুর এবং সীমান্ত বাংলা উভয়ক্ষেত্রেই বিবাহগীতে রাম-সীতা বা শিব-পার্বতীর কথা বারংবার এসেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের কথা আদৌ উচ্চারিত হয়নি। স্মরণ করা যেতে পারে যে, লোকগীতের অন্যান্য ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রচুর ও প্রধান। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত প্রণয়গীতে রাধাকৃষ্ণ কথাই সার কথা এবং শেষ কথা। অথচ এখানের বিবাহগীতে রাধাকৃষ্ণের নাম প্রত্যক্ষভাবে না হোক—রূপক-উপমার সূত্রেও সহজে শ্রুত হয় না। কারণ স্পষ্ট। লোকায়ত জীবন অসামাজিক প্রণয়ের প্রতি যত আকর্ষণই অনুভব করুক না কেন বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্র হিসেবে সমাজের বেদীটির উপরেই তারা তাদের সবটুকু শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। এই বিবাহ নিছক দুটি নরনারীর বন্ধন নয়, দুটি পরিবারের মিলন। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা নির্বাচিত পাত্রপাত্রীর মিলনেই এখানে বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। রামসীতার বিবাহ বা হরগৌরীর বিবাহে এই সমাজবন্ধনের স্বীকৃতি আছে, অপরদিকে রাধাকৃষ্ণের ব্যাপারটা সেই সমাজবন্ধনেরই ঘোরতর অস্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "...যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই এক বাক্যে নিন্দিত সেই অভ্রভেদী কলঙ্ক-চূড়ার উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার

অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।"[২] তাছাড়া আর একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিবাহগীতে, কন্যার কথা, কন্যার ব্যথা বারংবার শোনা গেলেও সেগুলি কন্যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না, কন্যার আত্মীয়াদের কণ্ঠেই সেগুলির কলরব। এঁরা সমাজেরই সরব প্রতিনিধি। স্বাভাবিক কারণেই বিবাহগীতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গটুকু সন্তর্পণে পরিত্যক্ত। ভোজপুরী লোকগীতে বর মাত্রেই রাম, বরের পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা; কন্যা সীতা এবং কন্যার পিতা জনকরূপে অভিহিত ও উল্লিখিত। উত্তর ভারতের শিষ্ট সাহিত্যে রাম-কথার প্রাবল্য ও প্রাচুর্যের কথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে বলেছি।[৩] আনন্দের সঙ্গে স্বীকার্য যে, লোকায়ত বিবাহগীতেও রামায়ণের প্রভাব প্রবল। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"[৪] সীমান্তবঙ্গের লোকায়ত বিবাহগীতে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের সান্ত্বনা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

ভোজপুরী এবং সীমান্ত বাংলার বিবাহগীতের আর একটি বড়ো মিল এই যে, এগুলি স্ত্রীকণ্ঠ গীতি, নারীহৃদয়েই এগুলির সৃষ্টি, নারীকণ্ঠেই এগুলি সরব ও সোচ্চার। 'বেহা ঘরে মায়ড়া রাজা' — সীমান্ত বঙ্গের এই লোকায়ত প্রবাদটিতে বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকারের কথা সানন্দে স্বীকৃত। এখানকার বিবাহগীতেও কলকণ্ঠীরাই রূপকার, সুরকার ও শিল্পী। লোকায়ত বিবাহের মাত্র এক আনা অংশই শাস্ত্রীয় আচার, বাকি পনেরো আনাই লোকাচার যা প্রকৃত অর্থেই স্ত্রী-আচার। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রবিধি থেকে মেয়েদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বেদমন্ত্র গান এঁদের নিষিদ্ধ, তাই বুঝি হৃদয়মন্ত্রে এঁদের অপ্রতিহত অধিকার। সীমান্তবঙ্গের লোকায়ত বহু সমাজেই বিবাহে মন্ত্রের প্রচলন নেই, সেখানে এই মধুর গীতগুলিই প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট, দুটি হৃদয়কে হৃষ্ট এবং পরিবেশটিকে হৃদ্য করে থাকে। এখানে স্মরণ রাখতে হয় যে, শুধু ভোজপুর বা সীমান্তবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বিবাহগীতগুলির সর্বাধিকার মেয়েদের দ্বারাই সংরক্ষিত। বাংলাদেশের বিবাহগীতিগুলিও মেয়েদের গান এবং সেগুলি ধর্মনির্বিশেষে গীত হয়।[৫] আসল কথা এই যে, পৃথিবীর যেখানে যে সমাজেই বিবাহগীতের প্রচলন আছে সেখানেই পুরুষের ভূমিকা শুধু প্রসন্ন শ্রোতার; আমাদের সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রাণীরাই এগুলির শিল্প-নৈপুণ্যের এবং সুরসৃষ্টির একমাত্র দাবীদার।

ভোজপুরী এবং সীমান্ত বাংলার বিবাহগীতের একটি বড়ো পার্থক্য এই যে, ভোজপুর অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রমন্ত্র কিঞ্চিদধিক পৃথক—কিন্তু বিবাহগীতে কোনো পার্থক্য নেই। এই অঞ্চলের উচ্চনীচ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই গীতগুলি নারীকণ্ঠকে উচ্চকিত এবং বিবাহমণ্ডপকে মুখরিত করে রাখে। সীমান্ত বাংলায় কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। এখানকার উচ্চবর্ণের মানুষের ঘরে বিবাহগীত শোনা যায় না। এখানে বিবাহগীত আক্ষরিক অর্থেই লোকায়ত। এমনকি যেসব লোকায়ত মানুষ উচ্চশিক্ষা বা উচ্চ চাকরি নিয়ে শহরে বাড়ি-ঘর করেছেন তাঁদের বাড়ির আঙিনা থেকেও এই গীতিগুলিই ক্রমেই অবহেলিত এবং অপসারিত হতে চলেছে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই সে কথা বলি না। তবে জ্ঞাত তথ্য এই যে, ব্যতিক্রম নিয়মকে সংহার নয়, সিদ্ধই করে।

দ্বিতীয় পার্থক্য গালাগালির মানে ও পরিমাণে। বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে এবং কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে প্রচুর গালাগালি দিয়ে থাকে। অন্যত্র এগুলিকে আমি তিরস্কারগীতি না বলে পুরস্কারগীতি বলেছি। এর মধ্যে ব্যঙ্গ যতই থাক রঙ্গটাই কিন্তু প্রধান। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটিকে মধুর ও মনোহর করে তুলতে এই রঙ্গগীতিগুলির অবদান অনেকখানি। সীমান্ত বাংলায় লোকাযত বিবাহের ক্ষেত্রে বর বিয়ে করতে গিয়ে কন্যাপক্ষের সীমন্তিনীদের কণ্ঠবর্ষিত পুরস্কারগীতের যে মালা গলায় পরে আসতে বাধ্য হয় বধূবরণের প্রাক্কালে বরপক্ষের কলকণ্ঠীরা তা দ্বিগুণ উৎসাহে বধূর কর্ণদেশে অর্পণ করে আহত অভিমানের প্রতিশোধস্পৃহাকে পরিতুষ্ট করার অক্লান্ত প্রয়াস করে। এবং এই চাপান উতোরে কোনপক্ষই আঘাত পান না, আনন্দই পান। ভোজপুরী বিবাহগীতেও এই ব্যাপারটি আছে। বরযাত্রী যখন খেতে বসেন তখন কন্যা-পক্ষের কলকণ্ঠীদের কণ্ঠনিঃসৃত গালাগালির ত্রুটি ঘটলে তাঁরা তাঁদের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি বলেই জ্ঞান করেন। বরযাত্রী দেবতাদের ভোজনকালে নারীবৃন্দের গালাগালি দেওয়ার উল্লেখ আছে তুলসীদাসের রামচরিত মানসে—

> "নারি বৃন্দ সুর জেঁওত জানী।
> লগীঁ দেন গারীঁ মৃদু বাণী ॥"

অবশ্য এই গালাগালি দেবার সময় জ্ঞানবৃদ্ধাদের কণ্ঠে কিছু সাংসারিক জ্ঞানের কথাও শোনা যায়। রামচরিত মানসেও দেখি যে,

> "গারীঁ মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দর বিঙ্গ বচন সুনাওহীঁ।
> ভোজনু করহিঁ সুর অতি বিলম্বু বিনোদ শুনি সচু পাওহীঁ।"

কিন্তু উভয় অঞ্চলে এই গালাগালিগুলির মান ও পরিমাণের পার্থক্য গুরুতর। সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সমাজে এই গালাগালিগুলি শুধুমাত্র বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উভয়পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁতী, কামার নাপিত, কুমার সবাইকে এই গীতের মালা সোৎসাহে পরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারাও তা সানন্দে স্বীকার করে নেয়। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি তাই এক্ষেত্রে শুধু একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁতীকে শোনানো হয়েছে—

এক লাটাই সুতা তাঁতী তাঁতে খেয়ালি
বহু বিটি বন্ধক রাখ্যে রে তাঁতী সুতা লিএ্যে আলি।

এ কথা বলার প্রয়োজন আছে যে, লোকায়ত বিবাহ উৎসবে পুরস্কারগীতের এই পক্ষপাতহীন ব্যবহার ও নির্বিশেষে প্রয়োগ সামাজিক জীবনকে শুধু সুদৃঢ় করে না, সুমধুরও করে তোলে। ভোজপুরী বিবাহগীতে গালাগালির ক্ষেত্রসীমা সঙ্কীর্ণ।

গুরুতর পার্থক্যটি উভয় অঞ্চলের এই শ্রেণীর গীতের মানে। ভোজপুরী বিবাহগীতির এই অংশটিতে যৌন অশ্লীলতার আধিক্য লজ্জাকেও লজ্জিত করে। দুটি অনুষ্ঠানে অশ্লীল ভাব ও ভাষার বন্যা ছোটে। ডোমকচের সময় এবং বরযাত্রীরা খেতে বসায় সময়। এই অঞ্চলের বিবাহে গ্রামের প্রায় প্রতিটি সমর্থ পুরুষই বরযাত্রী হয়ে চলে যায়। সেদিন গ্রামটি প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। মেয়েরা রাত জেগে গান গায়, ডোমদের মতো কলরব করে। তাই অনুষ্ঠানটির নাম 'ডোমকচ।' এই সময় বরের মায়ের আঙুলে বরের পিসী চাপ দেন। নারীকুল বিশ্বাস করে যে, এই সময় তারা যে আচরণ করবে বর-বধূও ঠিক সেই আচরণই করবে। কাজেই শুধু সঙ্গীতে নয় অঙ্গভঙ্গিতেও কিঞ্চিৎ আদিরসের ছোঁওয়া লাগে। এই সময়ের একটি প্রিয় ও পরিচিত গীত—

ওঁঠওয়া জনি বিদোরীহ, ওঁঠ বিদোরনি অইহেঁ হোঁ।
মুঁহওয়া মতি চমকরহ, মুঁহ চমকাওনি অই হেঁ হো॥
এ নে ও নে বতিয়া জনি বতিঅইহ, বাত চলাওন অই হেঁ হো।
দাঁতওয়া জনি চিয়রীহ, দাঁত চিআরনি অই হেঁ হোঁ॥
দেহিয়া জনি ডোলইহ, দেহি ডোলাওনি অই হেঁ হো।
কুচকুইয়া জনি করীহ, কুচরী অই হেঁ, কুচরী অই হেঁ হো॥

ডোমকচের গীতগুলির মতো বর এবং বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা গীতগুলিও নিরতিশয়

অশ্লীল। কন্যাপক্ষের রমণীগণ বর, বরের মা, বরের আত্মীয়-স্বজন কাউকে রেয়াত করেন না এবং তাঁদের সম্পর্কে অশ্লীলতম শব্দ প্রয়োগে এক বিজাতীয় উল্লাস ও আনন্দবোধ করেন। আসলে এই অঞ্চলে রমণীগণ সংস্কারের নিগড়ে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। পুরুষশাসিত এবং সংস্কারবদ্ধ রমণীকুল এই একটি ক্ষেত্রে সব শালীনতা বিসর্জন দিয়ে আদিম আনন্দের উষ্ণ ধারায় আকণ্ঠ অবগাহন করেন। হয়তো হাতী-ঘোড়া নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে বরের আসার কথা ছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে সেসব কিছুই নেই এবং সেক্ষেত্রে কন্যাপক্ষীয় কলকণ্ঠীরা বরযাত্রীদের যে ভাষায় অভ্যর্থনা করেন তাতে যে কুরুক্ষেত্র না হয়ে কন্যাদান হয় সেটাই আশ্চর্য। এ বাবদে এমন একটি গীতও নেই রুচির মুখ রক্ষা করে যার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দান সম্ভব। যেমন,

ক. হাথী ঘোড়া সোর কইলে
গদহো না লে অইলে রে।
তোরী বহন কে……
হমর নগর হঁসওলে রে।

খ. মুঁহ তোর দেখো এ বর পনও নহীঁ
মাঈ তোর পনহেরিয়া…সাথ কাহে না লায়ো রে বর।
আঁখি তোর দেখো এ বর, কজরো নাহীঁ
মাঈ তোর………।

সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সমাজের এই শ্রেণীর গীতগুলি এই আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আদিরসের পরিবর্তে সেখানে ব্যঙ্গরস এবং রঙ্গরসেরই জয় জয়কার। বধূবরণের কিছু গীত এ প্রসঙ্গে শ্রবণ করা যেতে পারে।

ক. আইলো আইলো বহু কনই নাই বলইব
বহু কনই নাই বলইব।
আলকাতরা গাড়িতেল বহু
কাজল পরাভ বহু কাজল পরাভ

খ. সরগের তারা বহু সরগের তারা
তুই নাকি বাইরেছিলি বহু তাল গাছের পারা।
বহু তাল গাছের পারা।

গ. তর বাপে বলে লো বহু
খাসি বাড়ায় আছে—

বহু খাসি বাড়ায় আছে।
খাসি টাসি সকল মিছা লো বহু
তখেই বাঢ়াই আছে—
বহু তখেই বাঢ়াই আছে।

ঘ. দেখলি ল তর ঘর বহু দেখলি ল তর বাড়ি
লাউলতে ডিংলালতে ল বহু বইসছে ভাতের হাঁড়ি।

ঙ কি সাধে ল বহু বইসবি কাঁঠাইল তলে
বহু বইসবি কাঁঠাইল তলে।
তর ভাইয়ে রিঝ করে ল বহু কাঁঠাইল পাকার তরে।

চ. পাঁচশ টাকার শাড়ি দিলি
বহু রাইখবি যতন কইরে
তর বাপ মইরে গেলে ল বহু
কাঁদবি রদন কইরে।

ছ. লাল বাস আইল লীল বাস আইল
আইল লুতুন বাস, বহু আইল লুতুন বাস।
কন বাসটায় আসবি যাবি ল বহু
রিজাপ কইরে রাখ বহু, রিজাপ কইরে রাখ।

জ. মধুপুরের কুলহি মুড়ায় শুশকি কাঁদিলে
বহু শুশকি কাঁদিলে
সাগরামাডিহের কুলহি মুড়ায় লো বহু মুচকি হাঁসিলে
বহু মুচকি হাঁসিলে।

ঝ. আমদের গাঁয়ের কুলহি মুড়ায় পাকা ইটের ঘর,
কন ঘবটায় কামিন খাইটবে ল বহু মন মঞ্জুর কর—
বহু মন মঞ্জুর কর।

ঞ. আলু চকাচকা বহু আলু চকাচকা
তর বাপের ভাই নাই ল বহু
কাথে বলবি কাকা!
বহু কাথে বলবি কাকা!

গীতগুলির বুকে সহাস্য শ্লেষ, প্রসন্ন পরিহাস সকৌতুকে বাসা বেঁধে আছে। উদাহরণস্বরূপ 'গ' সংখ্যক গীতটির আলোচনা করা যেতে পারে। সীমান্ত

বাংলার গোরু লাঙ্গল টানে, গাই (গাভী) দুধ দেয়। 'গোরুর দুধ' কথাটি এখানে হাস্যকর। অনুরূপভাবে এখানে পাঁঠা (আঞ্চলিক নাম 'বদা')-কে দেব বা দেবীস্থানে বলিদান দেওয়া হয় কিন্তু মাংস বলতে এখানকার মানুষ জানে 'খাসি মাংস' (খাসির মাংস), 'মাংস ভাত' এবং 'খাসি ভাত' কথা দুটি এখানে সমার্থক। এবং এটাই এখানকার সবচেয়ে বড়ো ভোজ। কন্যার পিতা হয়তো কথা দিয়েছিলেন যে তিনি খাসি ভাত দিয়ে বরযাত্রীকে আপ্যায়িত করবেন এবং সেজন্য তিনি বাড়িতে খাসি পুষে রেখেছেন, কিন্তু কার্যকালে তা দেখা গেল না। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ বরপক্ষীয় গীতে মুখের উপর শুনিয়ে দেওয়া হল যে, খাসি নয়, কন্যার পিতা শুধু কন্যাকেই বড়ো করে রেখেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের বিবাহগীতেও তিরস্কার-গীতের সংখ্যা কম নয় এবং সেখানেও আদি নয়, হাস্যরসেরই দন্তরুচি কৌমুদীর দহন ও দর্শন। যেমন,

আইলচে কইনার ভাইয়া
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
গাব কালাই মটরের ডাইল
    শিয়াল ভাজা ভাত।
শিয়াল ভাজা ভাত রে
    দাতোত্ নাগিল আসি,
শিয়ালের এ্যাকখ্যান ঠ্যাং নিয়া যায়া
    পূজের তলোত্ বসিল।
কি ছিকোরে
    জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল॥
আইলচে কইনার বাপ
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
    গাচ কালাই মটরের ডাইল
        কুত্তা ভাজা ভাত
    কুত্তা ভাজা ভাত রে
        দাতোত্ নাগিল আসি,
    কুত্তার এ্যাকখ্যান ঠ্যাং নিয়া যায়া
        ঝোপের দুয়ারোত্ বসিল।

কি ছিকোরে
জিবার পানি টপাস্ টপাস্ পড়িল ॥
আইলচে কইনার চাচা
কি দিয়া খাইবে ভাত ?
হড়হড়া খেশারীর ডাইল
বিলাই ভাজা ভাত।
বিলাই ভাজা ভাত রে
দাতোত্ নাগিল আসি
বিলাইর এ্যাকখ্যান গোস্ত নিয়া যায়া
খুলির মাতাত্ বসিল।
কি ছিকোরে
জিবার পানি টাপস্ টপাস্ পড়িল ॥

এবং এইভাবে কন্যার 'জ্যাটো'-কে 'ব্যাঙ ভাজা ভাত', 'ফুপা'-কে 'তুরা, (কচ্ছপ) ভাজা ভাত,' 'নানা'-কে 'গুইসাপের নাড়নড়ি' (গোসাপের নাড়িভুড়ি) ভাজা ভাত খাইয়ে রঙ্গরসিকতার চূড়ান্ত করা হয়েছে।•

অবিকল অনুরূপ একটি গীত সীমান্ত বঙ্গেও শ্রুত—

গমের রুটি কুকুরের কইলজা
খাইতে দিব বেহায়কে
হাড় খাইহ হে বেহায় মাস খাইহ না
আশী টাকার খাসী কিইনেছি
নকসান কইর না, বেহাই, নকসান কইর না ॥

ভোজপুরী বিবাহগীতের আলোচনা করার পূর্বে এই ভাষার ভূগোলটিকে চিনে নিতে হয়। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভোজপুরী ভাষা প্রচলিত। ভোজপুরী ছাড়া ভাষাটি বকসরিয়া, ছপহরিয়া, বনারসী ইত্যাদি নামেও পরিচিত। অবশ্য ভাষাটির সর্বাধিক প্রচলিত এবং পরিচিত নাম ভোজপুরী। এই ভাষার ভূগোলটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিহারের চম্পারণ (পূর্ব এবং পশ্চিম), সারণ (ছাপরা, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ) এবং শাহাবাদ (ভোজপুর, রোহতাস) জেলার মাটিতে। রাঁচি, পালামৌ এবং মজফ্ফরপুর জেলাতেও এই ভাষাভাষী মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের বালিয়া, বস্তী, গোরখপুর, দেওরিয়া ও বেনারস জেলায় এবং মীর্জাপুর, জৌনপুর

ও আজম গড়ের অধিকাংশ অঞ্চলে এবং ফৈজাবাদ জেলার কিছু অংশে এই ভাষা প্রচলিত। নেপালের তরাই অঞ্চলেও এই ভাষাভাষী মানুষের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দীভাষী মানুষের গরিষ্ঠ অংশেরই মাতৃভাষা মূলত ভোজপুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা কথাসাহিত্যে ভোজপুরী ভাষা ও মানুষ প্রথম দিন থেকেই প্রবলভাবে বিরাজমান এবং বিষয়টি স্বতন্ত্র গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আধুনিক কথাসাহিত্যিক কালকূট সিংবাহাদুরজীর সঙ্গে পবননন্দন ওর্ফে খট্টাই ঝার সংলাপ শুনে বলেছেন, "ভাষাটা মৈথিলি না ভোজপুরী, বা অন্য কিছু আমার কোনো ধারণা ছিল না। তবে, এই ভাষা কলকাতায় শুনেছি। সব থেকে বেশি শুনেছি কলকাতার বাইরে শিল্পাঞ্চলে। বিশেষ করে চটকলের শ্রমিকদের মুখে। শুনে মুখস্থ করে ফেলার মতো বিদ্যা আমার ছিল না। শিখে নেবারও কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে।"[৭] সিংবাহাদুরজী অবশ্য কালকূটকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পবননন্দন "ছাপড়াই বুলিতে কথা বলছে। ভোজপুরী যাকে বলে।"[৮]

ভোজপুরী ভাষার লিখিত সাহিত্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়, তবে এর লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারটি বিশাল ও বিচিত্র। বিবাহগীতগুলি সেই ভাণ্ডারের স্মরণীয় এবং শ্রুতিমধুর সম্পদ। পরিতাপের বিষয় এই যে, এখানে এমন কিছু গীত আছে যেগুলিকে কিছুতেই ছাপার অক্ষরে তুলে ধরা যায় না। অপরদিকে কাটছাঁট করে তুলে ধরলে সেগুলির আবেদনের ধার ও ভার অনস্বীকার্যরূপেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় সংগ্রাহক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও এই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ছড়ার একটি বিশেষ শব্দকে "ভদ্রসমাজে উচ্চারণ" করতে কুণ্ঠাবোধ করেও তিনি বলেছিলেন যে "তথাপি সে ছত্রটি একেবারে বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে।"[৯] ভোজপুরী গীতগুলি সম্পর্কেও এই কথা। কিছু গীতে আদিরসের নির্লজ্জ নগ্ন আত্মপ্রকাশ আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ জীবনরস আছে।

ভোজপুর অঞ্চলের বিবাহগীতের পথ পরিক্রমা বর খোঁজার দিন থেকে বিবাহের দিন পর্যন্ত প্রসারিত। মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তাভাবনা কম নয়। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করার ইচ্ছা পৃথিবীর সব পিতামাতারই প্রিয়

প্রার্থনা। তাছাড়া ছেলের ক্ষেত্রে পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু মেয়ের বিবাহ একবারই হয়। কাজেই মেয়ের বিবাহে পিতামাতাকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পাত্র নির্বাচন করতে হয়। এ তো কূপ নয় যে প্রয়োজন হলে আবার নূতন করে খনন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এ যে সমুদ্র, কাজেই ঝাঁপ দেবার পূর্বে সব কিছু দেখে শুনে নিতে হয়।

ইনরা ত রহী তু বেটী ফেনু সে খোনঈতি
সমুন্দর খোনওলো না জাঈ।
পুতওয়া ন রহীতু বেটী ফেনু নে বিঅহিতো
ঝিউআ বিঅহলো না জাঈ॥

মেয়ে বড়ো হলেই মা বাবার চোখ থেকে ঘুম মুছে যায়। চতুর্দিকে মেয়ের যোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থকাম পিতা বেদনায় ভেঙে পড়েন। মেয়েকে আর ঘরে রাখা যায় না অথচ যে ঘরে তার জীবনলতা আনন্দে ও আহ্লাদে কুসুমিত হবে তার ঠিকানাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভোজপুরী বিবাহগীতে এই বেদনার্ত মুহূর্তটির মর্মস্পর্শী বর্ণনা—

নিহুরল নিহুরল বেটী আঙ্গনা বহারেলী, ভঈলী কম্বড়ওয়া ধঈলে ঠাঢ়ি
মুহওয়া উঘারি জব মায়ারি দেখলী, ধিয়া ভঈলী ব্যাহন যোগ।
বাবাকে গোদ পইসি আমা জগাওয়েলী, উঠি প্রভু ভঈলে ভিনুসার
জেকরা কে ঘরওয়া প্রভু ধিওয়া কুঁয়ারী সে কইসে সোএ নিরভেদ॥
পুরুব খোজলো বেটী পছিয় খোজলো, খোজলো দেস সংসার
তহরাহি জোগে বেটী বর নাহী মিলেলা, অব বেটী রহেলু কুঁয়ারী॥

আসলে শুধু তো বর বাছা নয়, ঘর বাছারও প্রশ্ন আছে। কোথাও হয়তো ঘর ভালো কিন্তু বর ভালো নয়, আবার কোথাও বা এর বিপরীত। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে ঘর বর দুইই ভালো সেখানেও অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে। লতা পাতা ফুল ফল সব কিছুই দেখতে শোভন ও সুন্দর কিন্তু ফলটি তিক্ত না মিষ্ট তা তো জানার কোন পথ নেই। একমাত্র পথ ফলটিকে গ্রহণ ও আস্বাদন করা। কিন্তু একবার গ্রহণ করলে তাকে আর ফেলে দেওয়া যায় না। নিম্নোক্ত গীতটির বুকে এইসব দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাসা বেঁধে আছে।

উসর খেতে বেটী কাঁকরি বোঅলে
রন বন পসরেলা ডাঢ়ি।

কাঁকরি কে বতিয়া বেটী দেখতে সোহওন
না জানে তীত কী মীঠ ॥

ঘর বর পছন্দ হবার পরেও থাকে পণের চিন্তা। ভোজপুরী সমাজে বরপণের প্রচলন, সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সমাজে কন্যাপণের। স্বাভাবিক কারণেই ভোজপুরী বিবাহগীতে কন্যার পিতাকে পণের চিন্তায় কাতর হতে দেখি।

পইঠি জগায়েলী বেটী কওন বেটী
উঠ বাবা, ভঈলে ভিনুসার
কুছ স্থতেনী কুছ জাগেনী বেটী
কুছরে দহেজওয়া কে সোচ ॥

'দহেজ' বা পণের চিন্তায় বিপর্যস্ত ভোজপুরী কন্যার পিতা আমাদের কাল-কেতুর মতোই 'এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে'।

উপযুক্ত বর খুঁজে পাবার পর কন্যার পিতা বিভিন্ন উপহার দ্রব্যাদি, অর্থ, বস্ত্র এবং ফলফুল দিয়ে বরকে বরণ করতে যান। এরই নাম তিলক। বাংলার 'আশীর্বাদী' এই ভোজপুরের তিলক। ধান ভানতে শিবের গীত যতই অপ্রাসঙ্গিক হোক, ভোজপুরের তিলক প্রসঙ্গে শিবের গীত কিন্তু প্রিয় ও প্রাসঙ্গিক।

গাঈকে গোবরে মহাদেব, অঁগনা লিপাঈ,
গজমোতিয়া হো মহাদেব, চউকা পুরাঈ
ধনি এ শিব, শিবকে দোহাঈ।

গৌরচন্দ্রিকায় এই শিবের গীত ভারতীয় সংস্কার সংস্কৃতির মর্মকথাটিকেই অভিব্যক্ত করে। হরপার্বতী আমাদের আদর্শ দম্পতি। লোকায়ত সমাজেও তার সহজ সরল স্বীকৃতি। ভোজপুরের মতো বাংলার মেয়েরাও শিবের মাথায় জল ঢালে শিবের মতো স্বামী পাবার জন্য।

এই তিলকে যেসব জিনিসপত্র দেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত এবং স্বাভাবিক কারণেই সেগুলি বরের মায়ের মনঃপূত হয় না। তাঁর সোনার চাঁদ ছেলের তুলনায় এই তিলক যে আদৌ যথেষ্ট নয় – এই অহঙ্কৃত ভাবনায় অধিকারটুকু বরের মায়েরা কোনোদিনই হাতছাড়া করেননি। কাজেই বরের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠে অভিযোগ সোচ্চার হয় সঙ্গীতের তরঙ্গে।

ডাঢ়ী কৌশল্যা রাণী, তিলক নিহারেলী,
এ জী অইসন তিলক হমরে রাম জোগ নাহী।

রামের মায়েরা এই প্রসঙ্গে যে কথাটি স্বেচ্ছায় এবং সুকৌশলে ভুলে যেতে বা থাকতে ভালোবাসেন তা হল এই যে, যে মেয়েটি তাদের বাড়িতে বধূ বেশে আসছে সেও জনককন্যা সীতা এবং সে কোনো অংশেই কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রের অযোগ্য জীবনসঙ্গিনী নয় !

সাধারণত কন্যার ভাই (বা দাদা) বরের হাতে তিলক সামগ্রী তুলে দেন। বরপক্ষের গীতে এই তিলক সামগ্রীর অপ্রাচুর্যে ক্ষোভ এবং রাগের কথা বারংবার শুনি। লেখাপড়া শেখা পণ্ডিত ছেলের যোগ্য তিলক হয়নি এবং কন্যার পিতা যে প্রায় জলের দামেই এরকম একটি ভালো পাত্রকে ঠকিয়ে নিলেন নিম্নোক্ত গীতটিতে বরপক্ষীয় সেই বিলাপ শুনতে শুনতে দাদাঠাকুরের সুখ্যাত টাকার অষ্টোত্তর শত নামের সেই অংশটি অনিবার্যরূপে স্মরণ করতে হয় যেখানে সাহসের অভাবে অথবা শিষ্টতার কারণে টাকার একটি বিশিষ্ট নামদাতাদের সম্বোধন পদটি তিনি উহ্য রাখতে বাধ্য হয়েছেন।[১০]

> তিলক যে গনেলে, কওন বাবা ঝনক-পটক করে।
> মোর বাবু পঢলে পণ্ডিতওয়া, তিলক বাড়া থোড় ভঈলে।
> অমুক রাম হওনী ঠঁগহরিয়া, বাবু মোরা ঠগি লীহলে॥

ভোজপুর অঞ্চলে বিবাহে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে। তন্মধ্যে নাগাড়া বা 'মানর'-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। লোকবিশ্বাসে নাগাড়ার ধ্বনি মাঙ্গলিক। বিবাহগীতে নাগাড়ারও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নিম্নোক্ত গীতটিতে নাগাড়ার সৃষ্টিকথা সুরে-ছন্দে উত্তাল।

> কেহো যে মানর গঢ়েলা, কেহী সিরিজাওয়ালা হো,
> কেকরী দুয়ারে মানর বাজেলা, বাজত সো হাওন হো।
> কোহরা যে মানর গঢ়েলা, চমরা সিরিজাওলা হো,
> আরে বাবাকে দুয়ারে মানর বাজেলা
> বাজত সো হাওন হো।

ভোজপুরী বিবাহগীতের এই প্রশ্নোত্তরমূলক রূপটি সীমান্ত বাংলার আহিরাগীত বা বাঁদনা গীতের গঠনরূপটিকে অনিবার্যরূপেই স্মরণ করায়।[১১] স্মরণীয় যে, সেখানেও সৃষ্টিকর্তারূপে শিবেরই স্বীকৃতি। পুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি পালন ও ধ্বংসের অধিকারী দেবতা। লোকায়ত মানুষ মহেশ্বরকে গ্রহণ করেছেন স্রষ্টারূপে, সৃষ্টির আদিদেবরূপে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় শিবের গাজন পরবে 'ভগ্‌তা' (ভক্ত)-দের কণ্ঠে বারংবার

উচ্চারিত "দেবদেব মহাদেব/কাশীরে বিশেশ্বর/গয়ারে গদাধর" কথাগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভোজপুর অঞ্চলে বিবাহের নির্দিষ্ট তিথির তিনদিন অথবা পাঁচদিন পূর্বে মঙ্গলগীত শুরু হয়। গ্রামের কোনো পবিত্র স্থান থেকে মাটি এনে গৃহের আঙিনায় বেদী নির্মাণ করা হয়। যেদিন বেদী নির্মিত হয় সেইদিনই বর এবং কন্যাকে হলুদ মাখানো হয়। এই সময়ের গীত—

কন্যাপক্ষে— হমরী কওনী রাণী (নাম) অতি সুকুআঁরি হো,
সহলোন জালা হরদিয়া কে ঝাঁকি হো।

বরপক্ষে— হমর কওন রাজা (নাম) অতি সুকুআঁর হো,
সহলোন জালা হরদিয়া কে ঝাঁকি হো।

বিবাহের দিন বর এবং বধূকে চুমানো হয়, একে 'চুমাওন' বলা হয়। এই সময় বৌদিরা হাস্য পরিহাস করে থাকেন। বৌদিরা বর-বধূর দেহে চিমটিও কাটেন।

ভোজপুর অঞ্চলে বরপণ প্রচলিত, সীমান্ত বাংলায় কন্যাপণ। ভোজপুর অঞ্চলের কন্যার পিতারা সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সমাজের বরের পিতার অসহায় অবস্থাটির কথা স্মরণ করে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারেন। কুর্মী সমাজের নিম্নোক্ত গীতটিতে পাত্রীপক্ষই উচ্চকণ্ঠ।

বাবাকেরা আঁগনাঁহী জুঁই ফুলের বিছানা
সে বিছনা ভরে বরেক বাপ।
মাঁগিলে কি পাওয়া যায় গ—
খুঁজিলে কি পাওয়া যায়।
ইবিছনাক আশী টাকা দাম।
কোঁড়ী ফুলের দাম বাবা দশ বিশ টাকা হো।
এই দামে পটে শ্বশুর আঁকড় মাইরে বইসো হো
না পটিলে উইঠে চইলে যা।

কন্যা এখানে উপমিতা প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলের সঙ্গে। কুঁড়ি হলে দশ বিশ টাকাতেও হত কিন্তু এখানে পুষ্পটি প্রস্ফুটিতা। তাই তার মূল্য কমপক্ষে আশী টাকা। বরের পিতা যদি এই মূল্য দিতে রাজি থাকেন তাহলে তিনি মাটি কামড়ে বসে থাকতে পারেন, অন্যথা তাঁর মানে মানে সরে পড়াই ভালো।

শিষ্ট সাহিত্যের রোম্যান্টিক কল্পনায় মুকুলিকা বালিকার মূল্য এবং মহিমা যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, লোকায়ত সমাজে কিন্তু বিকশিত কলিকার মূল্যই বেশী। তার কারণও আছে। নারী এখানে পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী —তার শ্রমজীবনের সমর্থ সঙ্গিনী। কায়িক শ্রমে সমর্থা কন্যার পণের অঙ্ক স্বাভাবিক কারণেই তাই কিছু বেশী।

কন্যা বিদায়ের লগ্নে সীমান্ত বাংলার লোকায়ত বিবাহগীতে করুণ রসের যে ঢল নামে ভোজপুরী বিবাহগীতে তার তুলনা বিরলদৃষ্ট। ভোজপুরী বিবাহ-গীতে শুনি—

বেটী বাবা বাবা পুকারে, কাঁহা বাড়ে বাবা হমার।
পহিলী ভঁওরিয়া এ বাবা, অবহিঁ তোহার ॥
ছঠওয়েঁ ভঁওরিয়া এ ভঈয়া, অবহিঁ তোহার।
সতওয়েঁ ভঁওরিয়া এ ভঈয়া, ভঈয়া ভইনী পরায়ী।

গোত্রান্তরের কূলে এই অতিক্ষীণ জলরেখাটির তুলনায় সীমান্ত বাংলার মাটিতে বেদনার বানভাসি। পিতৃগৃহ ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ বেদনায় কন্যাপক্ষীয় গীতগুলির অধিকাংশই অশ্রু-স্নাত। যে মা-বাবা মেয়েকে এতকাল অন্ন, বস্ত্র, আদর ও আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালিত করেছেন আজ তাঁরাই 'এক টিকা সিঁদূরের জন্য' সেই স্নেহলালিত কন্যাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কন্যার জবানীতে গীত গানটির সর্বাঙ্গে তাই, স্বাভাবিকভাবেই, অভিমান ও অশ্রুজল পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছে।

বনে ফুটে ধধকী মা গ বনকে করেই আল।
ও মা বনকে করেই আল।
বিটি ছাওয়াক মিছাই জনম গ
ও মা পরেক ঘারেক আল ।।
ধিক ধিক নারী জনম গ
ও মা বিধি কাহে দেল
আপন গোতর ছাড়ি গ
ও মা পরেক গোতরো দেলে।
অন দে পারলে মা গ বসত্‌র দে পারলে
এক টিকা সিন্দুরেক জইন্তে গ
ও মা পরেক গোতর দেলে।

গীতটির প্রারম্ভে বনের ফুলের সঙ্গে ঘরের কন্যার তুলনাটি একই সঙ্গে মধুর এবং মর্মান্তিক। বনের শোভা ফুল, যে বনে ফোটে সেই বনের বুক আলো করে থাকে। ঘরের শোভা কন্যা। কিন্তু যে ঘরে তার জন্ম সে ঘর আলো করে থাকার অধিকার তার নেই, তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য ঘরের আঙ্গিনাকে আলোকিত করার জন্য। সেখানে সে যত শোভাই পাক বা দিক শেকড় ছেঁড়ার বিষন্ন বেদনাটুকু তার গাত্রলগ্ন হয়েই থাকে।

স্বয়ং কবিগুরু স্বীকার করেছেন যে, 'সংসারে বোনটি নেহাৎ অতিরিক্ত'। সীমান্ত বাংলার কন্যাও সে কথাটি মর্মে মর্মে জানে। ভাই এবং বোনের একই গর্ভে জন্ম, একই গৃহে লালন ও পালন। কিন্তু উভয়ের বিধিলিপি পৃথক্। ভাই চিরদিন মা বাবার আদর পায়, বোনকে অন্য বাড়িতে গিয়ে পেতে হয় অনাদর ও গঞ্জনা। বোন তার বিধিলিপি মেনে নিয়ে পরের ঘরে চলে যাচ্ছে। যাবার বেলায় ভাইকে জানিয়ে যাচ্ছে অন্তরের একটি আকুল আবেদন। অন্তত: প্রত্যেকটি 'পরবে (∠ পর্ব) ভাই যেন তাকে নিয়ে আসে। যাবার বেলায় মুখ ফিরিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া কন্যার সেই করুণ কান্নায় নিম্নোক্ত গীতটির সর্বাঙ্গ সিক্ত।

এক কইখে জনম হেলা ভাইরে বহিন হো।
বহিনী ত ভাঙ্গে বাসা ঘর।
তহোরী লিখল ভাইরে অহোরী জনোরী হো
হামরো লিখল পরদেশ।
তঁয় যে খাবে ভাইরে মাইকের দুধ হো
হামে খাব শাশুকে গাঁজন।
মায় তুমরো ভাইরে, বাপ তুমরো হো।
মনে যদি করিস ভাইরে পিঠেক বহিন হো
পরব পেছু আনোবে ঘুরায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সীমান্ত বঙ্গের লোকগীতে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কটির কথা বারংবার শ্রুত এবং একাধিক প্রসঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই উচ্চারিত। ভাইয়ের যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে আগামী বছর আবার টুসু পূজা করার মানত আছে টুসুগীতে। একটি করমগীতের সাক্ষ্য যদি নির্ভুল হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, এই অঞ্চলে কন্যাদের কাছে প্রিয়জন গণনায় ভাইয়ের স্থান সর্বাগ্রে। নিম্নোক্ত গীতটিতে অশন বসন শয়নের যা কিছু

ভালো তা ভাইকে দেবার কথা বলা হয়েছে এবং নিকৃষ্ট বস্তুগুলি স্বামীর জন্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

সঁঞা হামার সিনাই আইল কি পইত্যে দিব গ
কি পইত্যে দিব !
ঘরে আছে ছিঁড়া কানি সেই পইতো দিব।
দাদা হামার সিনাই আইল কি পইতো দিব গ
কি পইত্যে দিব !
হাঁড়কায় আছে সরু ধুতি সেই পইত্যে দিব।
সঁঞা হামার সিনাই আইল কি খাতে দিব গ
কি খাতে দিব !
ঢেঁকশালে আছে পাট্‌রা কুঁড়া সেই খাতে দিব।
দাদা হামার সিনাই আইল কি খাতে দিব গ
কি খাতে দিব !
ঘরে আছে সরু চিঁড়া সেই খাতে দিব।
সঁঞা হামার শুতে যাবেক কি বিছাই দিব গ
কি বিছাই দিব !
খাম্‌হারে আছে গুঁদলু পুয়াল সেই বিছাই দিব।
দাদা হামার শুতে যাবেক কি বিছাই দিব গ
কি বিছাই দিব !
ঘরে আছে সরু চাদর সেই বিছাই দিব।

এবং সম্পর্কটি যে একান্তই একতরফা এরকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। বোনকে আদর করে ঘরে আনার, যত্ন করে রাখার, ভালোমন্দ খেতে দেবার স্নেহস্নিগ্ধ বাসনাটুকু নিম্নোক্ত করম গীতটিতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই উচ্চারিত।

কন বনে লহরয়ে লহর লহর বাঁশ গ
কন বনে লহরয়ে বহিনী হামর !
বাঁশবনে লহরয়ে লহর লহর বাঁশ গ
বিজুবনে লহরয়ে বহিনী হামর ॥
কেথিঞ করি আনত লহর লহর বাঁশ গ
কেথিঞ করি আনত বহিনী হামর।

গাড়ীঞ করি আনত লহর লহর বাঁশ গ
দলাঞ করি আনত বহিনী হামর ।।
কাঁহা আনি রাখত লহর লহর বাঁশ গ
কাঁহা আনি রাখত বহিনী হামর !
ছাঁছাকলে রাখত লহর লহর বাঁশ গ
মাইঝ্যাঘরে রাখত বহিনী হমার ।।
কিয়া কিয়া খায়ত লহর লহর বাঁশ গ
কিয়া কিয়া খায়ত বহিনী হমার !
ছাঁছাক পানি খায়ত লহর লহর বাঁশ গ
দহি-দুধা খায়ত বহিনী হমার ।।
কিয়া কামে লাগত লহর লহর বাঁশ গ
কিয়া কামে লাগত বহিনী হমার !
ছাঁছ বাতাঞ লাগত লহর লহর বাঁশ গ
রাঁধা বাঢ়াঞ লাগত বহিনী হমার ।।

তবু কন্যাকে পরের হাত ধরে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিতে হয়। গোপন মনে থাকে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে, সে চলে যাবার পরেও পিতৃগৃহের স্মৃতির বারন্দায় তার নিরলস কর্মব্যস্ত মুখচ্ছবিটি বারংবার প্রতিবিম্বিত হবে; সকালে দাদা যখন সময় মতো জলখাবার পাবে না তখন তার কথা মনে পড়বে, সকালে উঠে মা যখন দেখবেন কলসীতে জল ভরা নেই তখনই তিনি স্মরণ করতে বাধ্য হবেন তাঁর সেই কর্মনিপুণা কন্যাটিকে। সশরীরে সম্ভব না হলেও স্মৃতিতে সেখানে অচল হয়ে অবস্থান করার অবুঝ কামনায় আকুল নিম্নোক্ত গীতটি।

বাপে মকে মার রহে বাপের মনে নেখেগ গ
এবের বাপ গ বিহান উঠি হিজরবে গ।
দাদা দাদা হাঁক পাড়ে দাদায় নাহি কান কেরেই
এবের দাদা বিহান উঠি তঁই হিজরবে গ।
দাদায় মকে মার রহে দাদক মনে নেখেগ গ
এবের দাদা বিহান উঠি কনে দেতেও নাস্তাপানি
মাযে মকে মার রেহি মায়েক মনে নেখেগ গ
বিহান উঠি খালি গাগরি তখন মনে পড়েই গ
বিহান উঠি মায় গ বাসন ধোওয়াবে তখন মনে পড়ে গ।

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকায়ত সমাজের কন্যাবিদায়ের সুরটি বুক ফাটা আর্তনাদেরই লয়। ভোজপুরী বিবাহ গীতেও অনুরূপ লয়ে চোখের কোণে অশ্রু দানা বাঁধে, তবে এমন প্রবলভাবে দুকূল ছাপিয়ে পড়ে না।

রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষা

ভারতের আর্যসামাজিক জীবনে বর্ষার সুমহান ভূমিকাটি সুবিদিত। ভারতীয় সাহিত্যেও বর্ষার—বিজয় বৈজয়ন্তী। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে প্রকৃতি সচেতন কবি তাই নন, তার মননে ও সৃষ্টিতে ভারতের চিরন্তন সাধনা ও স্বপ্নের, ঐতিহ্য ও এষণার, শিল্প ও সৌন্দর্যের সানন্দ অঙ্গীকার। বর্ষায় আকাশের মতো, তাঁর সাহিত্যের বুকেও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঘনীভূত সৌন্দর্যের অবিরল সঞ্চার ও অবিরাম বর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত প্রিয়জন। তৃণের শিহরণ, পাতার পুলক, আকাশের আলোক তাঁর মতো আর কেউ এমন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। প্রকৃতির অঙ্কলীন তাঁর কাব্যবীণায় ঋতুরাগের অক্লান্ত সাধনা, অপরূপ মূর্ছনা। তবে ষড়ঋতুর মধ্যে বর্ষার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কিঞ্চিৎ বেশী বলেই মনে হয়। শুধু সীমা অসীমের মিলন মহোৎসব রূপে নয়, সুর সাধনার স্বর্ণলগ্নরূপেও বর্ষা কবিচিত্তের প্রশস্তিধন্য। নানা অনুষঙ্গে ও অনুভবে বর্ষা নেমেছে কবির মননে ও সৃষ্টিতে।

কবি বর্ষাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সমকালের আকাশে কিন্তু তার প্রেক্ষাপটে অনেক কালের অনেক কবির মুগ্ধ দৃষ্টির মধুর আল্পনা। 'শ্রাবণ গাথা'য় শুনি—

> এসেছে বরষা, নবীন বরষা
> গগন ভরিয়া এনেছে ভুবন ভরসা,
> দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা
> গীতময় তরুলতিকা।
> শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
> শতের যুগের গীতিকা,
> শত-শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।"

এই শতেক যুগের কবিদলের মধ্যে অবশ্যই প্রধান স্থান অধিকার করে

আছেন উজ্জয়িনীর কালিদাস এবং পদাবলীর পদকর্তাগণ। বর্ষাপ্রসঙ্গে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতখানি অত্যাবশ্যক তার প্রমাণ ছিন্নপত্রের স্বীকারোক্তি—"হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহ সঙ্গীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসর সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।" 'বর্ষামঙ্গলে' কবিকণ্ঠ যে বিশ্বকণ্ঠে পরিণত আশাকরি সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বর্ষার আকাশে যেমন বাদলের সঙ্গে বাতাসের সুমধুর মিতালি, অনুরূপ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের মানসাকাশে তেমনি মেঘের সঙ্গে মেঘদূতের অনিবার্য এবং অন্তরঙ্গ সহাবস্থান। 'মানসী'র মেঘদূত' কবিতায় কবি বলেছেন।

"সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নব বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের, পরে করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নব ঘন স্নিগ্ধচ্ছায়া,করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিনীসম।"

আশ্চর্যের কিছু নয় যে, তাঁর অনেকটা আত্মজৈবনিক 'শেষের কবিতা'র অমিত আগামী বছরের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘদূত-নির্দেশিত পথে মোটর যোগে যাত্রার পরিকল্পনা করেছে। অমিত "ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর দূতটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে 'দেহলীদত্তপুষ্পা' যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মালবিকাই

হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে।" চেরাপুঞ্জীর বর্ষণমুখরিত পরিবেশে 'মেঘদূত'-এর রসাস্বাদন করার বাসনা যাঁর তাঁর পোষাকী নাম অমিত হলেও প্রকৃত নাম যে রবীন্দ্রনাথ সেকথা আশাকরি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কাব্যের সমান্তরালে জীবন পরিচালনার পরিকল্পনাটি অভিনব হলেও কবি-মানসের গূঢ় পরিচয়বাহী।

বর্ষা প্রসঙ্গে কবি কণ্ঠে কালিদাসের কথা এত বেশী যে তা নিয়ে কালক্ষেপ করলে অন্য কথা শোনাই হবে না। তাই আপাতত 'মানসী'র পত্র' পাঠ করেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই। এই পত্রের কিছু পাঠ –

"বৃষ্টিঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ –
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছলছল মলিন নয়ন।"

এখানে দেখছি রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ভাবনায় কালিদাসের সঙ্গে পদাবলীর কবিগণও সসম্মানে সমাসীন। বর্ষার জলধারা এবং পদাবলীর রসধারা কবির ভাবনার ভূমিতে যুগপৎ প্রবহমান। প্রমাণ অজস্র, এখানে শুধু দুটি উদাহরণ। জ্ঞান দাসের "রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে" পদটি শুধু যে 'ছন্দ' আলোচনার আসরে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই নয়, 'শ্যামলী'র স্বপ্নেও ছায়াপাত করেছে। বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদরের' বিপুল বিরহস্রোতে রবীন্দ্রসাহিত্য আগাগোড়া প্লাবিত। 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'চিঠিপত্র', 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সাহিত্য', ইত্যাদি নানা স্থানে পদটির পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। অবশ্য সর্বত্র বর্ষা অনুষঙ্গে পদটির আবির্ভাব ঘটেনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষাভাবনায় পদটি যে অত্যন্ত প্রিয় এবং একান্ত প্রাসঙ্গিক 'বীথিকা'র 'ছায়াছবি'তে তারই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"প্রবল বরিষণে…
নদীপারের নীলিমা ছায়

পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারালো সীমা,
হারালো পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি কথিত সেই
ভরা বাদর গান।"

রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্বন্ধ। বর্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মননে এবং সৃষ্টিতে, সেই সঙ্গে বাস্তবজীবনেও, সঙ্গীতের শতদল নানারূপে ও রসে পাপড়ি মেলেছে। ছিন্নপত্রে বর্ষার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে নিমগ্ন হওয়ার কথা আছে, আছে বর্ষার অপরূপ সৌন্দর্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশের বাসনা। কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রে (হিন্দুমুসলমান/কালান্তর) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আকাশ-রঙ্গ-ভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তর-বাহিত স্মৃতি-স্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে।" বলেছেন, "বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে, বৃষ্টির সঙ্গে, গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি ; কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরী করছি—সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে কম মানুষ হয়েছি---আমার মন ঘাসের মত কাঁপছে, পাতার মত ঝিল্‌মিল্‌ করছে।"

কবি চিঠিটি লিখেছেন ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী অম্বুবাচীর দিনে। বলেছেন, "ঘন মেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে ; তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লীরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মত্ত দাদুরি। এ আসরে আমার আসন পড়েনি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকে জবাব না দিয়ে চুপ করে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন।" কথাগুলি শুনতে শুনতে স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে।'

লক্ষণীয় যে, এখানে গানের আসর না বলে কবি বলেছেন গীতিকবিতার আসর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে এর ব্যাখ্যা। সেখানে গীতির সঙ্গে কবিতার সার্থক সুন্দর পরিণয়। নটরাজের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন, "রাগিণী যতদিন অনূঢ়া ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে

বিবাহ হলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ত্রৈণের লক্ষণ। সেটা…রসরাজ্যের রীতি নয়।" (শ্রাবণ গাথা)

'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধেও কবি স্বীকার করেছেন বাদল ধারার ছোঁয়ায় হৃদয় যমুনায় জোয়ার সৃষ্টির কথা। বলেছেন, "আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।" 'শ্রাবণ গাথা'য় নটরাজও স্বীকার করেছেন যে, বর্ষাপ্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশের 'পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে।'

বর্ষার জলধারায় আকাশের বাদল রাগের আলাপ রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্রভাবে শুনেছেন এবং কত বিভিন্ন ভাবে-অনুভবে আমাদের শুনিয়েছেন শুধু সেই কথা নিয়েই কথাসরিৎসাগর সৃষ্টি করা যায়। আমাদের সময়াভাব, তাই উদ্ধৃতি যৎসামান্য। 'কণিকা'র 'নববর্ষা' কবির অনুভবে বাদলরাগিণী সজল নয়নে/গাহিছে পরাণহরণী"। 'পুনশ্চ' কাব্যে 'সুন্দর' কবিতায় কবি একেই বলেছেন 'আকাশবীণায় গৌড় সারঙের আলাপ।'

বর্ষায় মূক প্রকৃতির মুখরতার চিত্রটি রবীন্দ্রকাব্যে অজস্রবার আঁকা হয়েছে। সেই মুখরতা কোলাহল নয়, তানে-লয়ে-মানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত। আকাশ গঙ্গার জলতরঙ্গে সুর মেলাতে বসেছেন কবি। 'গীতাঞ্জলি'র 'আষাঢ় সন্ধ্যা'য় কবির ভাবনা—"আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি—; প্রকৃতি-বীণায় ধ্বনিত-মেঘমল্লারের উপযুক্ত সঙ্গত যে মন্দাক্রান্তা ছন্দেই সম্ভব এ অনুভবটি কবিকণ্ঠে বারংবার সোচ্চার। এ ছন্দে বিরহের বার্তা ("তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে/ মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহের বাণী / বিচ্ছেদ, পুনশ্চ)। বর্ষার সঙ্গীতে কবিচিত্তের সঙ্গে একসুরে "কাঁপিছে বনের হিয়া,বরষণে মুখরিয়া/ বিজলী ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে।" "শ্রাবণ গাথা'য় নটরাজও বলেছেন, "অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘ নিশ্বাস উঠেছে সেখানে—কার বিরহ জানা নেই। ওগো, গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।" মনে পড়বে 'বলাকা'র কথা—

কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো

তারি বিরহে

এমন করে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে।

এখানে শুধু নটরাজের প্রতিধ্বনি নেই, আরো কিছু আছে, তবে সে কথা পরে। আপাতত জেনে রাখা ভালো যে, এখানেও "অকূল জলের অট্টহাসিতে" "হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে।" রবীন্দ্রসাহিত্যে, বিশেষতঃ সঙ্গীতে, বর্ষার ছন্দের সঙ্গে বিরহের সুরের যুগলবন্দী, অপরূপ ঐক্যতান, বিরহের নিবিড় গভীর উপলব্ধি ও আকুলতা। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে বর্ষণমুখরিত রজনীতে কুমুদিনীর অন্তরে অনাগত মানুষটির জন্য আকুল প্রার্থনা যখন উদ্বেল ও উন্মন তখনও হৃদয়ের বীণায় শুনি কানাড়ার সুর। "বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার এই গান—

বাজে ঝনঝন মেরে পায়েরিয়া
কৈসে করো যাউঁ ঘরোয়ারে।"

যোগাযোগ কিনা জানিনা, এই উপন্যাসটির আরম্ভ ৭ই আষাঢ় অর্থাৎ নববর্ষায়। বর্ষার পটভূমিকায় বাস্তবজীবনেও কবির এই জাতীয় সঙ্গীত-প্রীতির কথা সুবিদিত। রবীন্দ্রজীবন এবং রবীন্দ্রসাহিত্য যে সর্বাংশে সমার্থক তার আর একটি প্রমাণ, তুচ্ছ হলেও মূল্যবান।

বর্ষার গানে বিরহেরই অনির্বচনীয় মূর্ছনা। সেই বিরহও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যত না বেদনাবিদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ-আপ্লুত। স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের বর্ষায় বাল্মীকির বিরহ-বেদনা নয়, কালিদাসের যৌবন-বেদনার কথা। প্রথমটি বিষণ্ণ-বিধুর, দ্বিতীয়টি আনন্দ-মধুর। প্রথমটিতে বদ্ধ গৃহের দীর্ঘনিশ্বাস, দ্বিতীয়টিতে পথ চলার অপরিমেয় উল্লাস। বর্ষার সঙ্গে অনির্দেশ্য বিরহের সুনিবিড় সম্বন্ধের স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রমানসে কালিদাসের কথা বারংবার উচ্চকিত। নটরাজের ভাষায়, "উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" রবীন্দ্র সৃষ্টিতেও "ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর / বিরহ কাতর শর্বরী"র হৃদয়বীণায় বিরহের মত্ত আলাপ, মধুর মূর্ছনা। 'কল্পনা'র নববিরহের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে—

… … ‥

ঝরো ঝরো ঝরে জল, বিজুলি হানে,

পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।

… … …

কার কথা বেজে উঠে

হৃদয় কোণে…।"

'কণিকা'র নষ্টস্বপ্নেও বর্ষণমুখরিত রজনীর শূন্য শয্যায় সেই বিরহের মূর্তিচিত্র—

কালকে রাতে মেঘের গরজনে

রিমিঝিমি-বাদল-বরিষণে

ভাবিতেছিলাম একা একা—

স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা

আসে যেন তাহার মূর্তি ধরে

বাদল রাতে আধেক ঘুম ঘোরে।

এই পুলকভরা বেদনার কথা প্রকৃতির বুকে ছবি হয়ে ফুটেছে নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে—

"ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন

পুলকভরা ফুলে,

উছলি উঠে কলরোদন

নদীর কূলে কূলে।"

'বৌঠাকুরানীর হাটে' উদয়াদিত্যের হৃদয়বেদনা অবিশ্রান্ত বর্ষণধারায় বিগলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছে—"বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে 'সুরমা নাই—সে নাই।' মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হু হু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, 'সুরমা কোথায়!' এখানেই বর্ষারজনীর "প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকারে" বিভার চিত্তেও বিরহের ব্যাকুলতা। এই বর্ষা বিরহের অনুষঙ্গে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের নিকট অবশ্য স্মরণীয়। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় শুনি—

"যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি

সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,

পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।

...   .

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরণায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে
মুখরিত বন-হিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তাছন্দে বিরহীর বাণী।"

বর্ষার সঙ্গে মন কেমন করার ভাবটি রবীন্দ্র-ভাবনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। বলা যায় এটি তাঁর একটি প্রিয় অনুভব এবং সেই অনুভূতির বর্ণনায় কালিদাস তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ, অথবা প্রিয় সঙ্গী। 'গ্রাম্য সাহিত্যে'র আলোচনা সূত্রে কবি বলেছেন,

"ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না। চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহু পূর্বে উজ্জয়িনী রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ।
............কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—

"গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

......হৃদয়েব স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে!...বিশেষত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারা মুখরিত মেঘচ্ছায়াশ্যামল কূলে-কূলে পরিপূর্ণ অগাধশীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনই হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি।" কবির বালিকা 'বধূ' ও তো শীতল জলেই জ্বালা নেভাতে চেয়েছে। বর্ষার জলধারায় তাই কি কবির চরম অবগাহন, শেষ নিমজ্জন? উত্তরটা পরে, কেননা সেটাই আমাদেরও শেষ কথা।

বর্ষণমুখরিত দিনেই যে কালিদাসের মেঘদূতের পরিকল্পনা এবং রচনা এই প্রত্যয়টি রবীন্দ্রনাথের বর্ষাভাবনায় সানন্দে সংযুক্ত। এবং এই বিরহ যে বেদনাবিদ্ধ নয়, আনন্দযুক্ত 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদে' তারই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।"

বাসন্তীবিরহের বদ্ধ রূপ এবং বর্ষা বিরহের মুক্তরূপটি স্পষ্ট হয়েছে নটরাজের উক্তিতে। 'শ্রাবণ গাথা'য় সভাকবি বলেছেন, "নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ু প্রধান—সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কথাপ্রধান ধাত বর্ষার—কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তাহলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।" নটরাজ সোজা কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, "বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।" সভাকবির মুখ চেয়ে এই সোজা কথাটার ব্যাখ্যা করে নটরাজ বলেছেন, 'বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে—আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে—কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে।" শুধু মননে বা সৃষ্টিতে নয় স্বয়ং কবির জীবন-পালাতেও নটরাজের এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতা বিস্ময়কর। তবে সে প্রসঙ্গ পরে। এখানে সংযোজন শুধু এইটুকু যে, বর্ষার আকাশে বলাকার ডানা মেলার চিত্রটি রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে বহুধা দৃষ্ট ও ধৃত। 'কণিকা'র 'চিরায়মানা'য়—

"হের গো, ওই আঁধার হল,
আকাশ ঢাকে মেঘে।
ও পার হতে দলে দলে
বকের শ্রেণী উড়ে চলে।"

একটি চিঠিতে বসন্ত অপেক্ষা বর্ষাই যে বিরহযাপনের যোগ্য লগ্ন—কৌতুককণ্ঠে কবি সেকথা বলেছেন।

এই পরিহাসতরল উক্তির মূলে যে আন্তরিক অনুভব ও সুনিশ্চিত প্রত্যয় 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে তারই প্রমাণ। কবি বলেছেন, "ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রে দৈন্যনিবৃত্তি, নদী-সরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাঁহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে, বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা-বাতাসকে

কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম আষাঢ়ে নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন ; সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে, সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে ? সে যে সমস্ত পথটার নদীগিরি-কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে।"

বলাবাহুল্য যে, রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষার বুকের এই মঙ্গল বার্তাটির অসামান্য অধিকার, তাঁর সৃষ্টিতে সেই বার্তার অনন্ত আলাপ, আশ্চর্য আল্পনা। উপরোক্ত প্রবন্ধেই তাঁর দৃষ্টিস্নাত "আষাঢ়ের নূতন ঘনমেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মতো।" 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহের ভাষায় "মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদসম বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ 'পরে।" 'শ্রাবণ গাথা'য় 'নিখিল চিত্ত হরষা' 'নব যৌবনা বরষা'র আগমন 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে।' 'অকৃপণ বর্ষণ' এই 'করুণাঘনের' পদপ্রান্তেই কবির প্রণতি। নটরাজের আবাহনগীতেও বর্ষার সেই সন্তাপভঞ্জন ভূমিকার, কল্যাণ ও মঙ্গল রূপের মধুর মনোহর প্রশস্তি।

তৃষ্ণার শান্তি,
সুন্দর কান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।
আঁকো ধরাবক্ষে
দিক্‌বধূবক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।

'আষাঢ়ের আত্মদান প্রত্যাশায় ভরা' কাজলীর কল্যাণীরূপ 'মহুয়া'তে। 'দুই বোন' উপন্যাসের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মেয়েরা দুই জাতের, ...এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।" এখানে শুধু লক্ষণীয় এই যে, তুলনাটি কল্যাণীর সঙ্গে কল্যাণের। তবে একথাও তো সত্য যে, কবির কাব্যে বর্ষার পুরুষ রূপটি প্রবল হলেও কখনো কখনো নারীরূপেও তাকে লক্ষ্য করি পুলকিত বিস্ময়ে। স্থানাভাবহেতু বিষয়টি নিয়ে বেশীক্ষণ ভাবার অবকাশ আমাদের নেই। এই

মুহূর্তে স্মৃতির শতজীর্ণ পর্দায় 'মহুয়া'র ছায়াতলে "ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য।"

কবির ভাবনায় বর্ষার সঙ্গে অবকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'কণিকা'র 'সবিনয়' কবিতায় আষাঢ়ের প্রথম দিনে

"দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারও নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা।'

'আষাঢ়' কবিতাতেও কর্মহারা বাদল দিনের ছবি—

"খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,···।'

'কল্পনা'র বর্ষামঙ্গলেও—

"স্নিগ্ধ-সজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।"

অবকাশের আবেশমাখা কর্মহারা বাদলদিনের উপযুক্ত মৌতাত যে "অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়" কবির মননে ও সৃষ্টিতে সেকথা বারে বারে সোচ্চার। 'হাসি গল্প গানে' বর্ষাযাপনের প্রিয় ইচ্ছাটি 'মানসী'র 'শ্রাবণের পত্র'-এ পরিহাসসিক্ত হলেও অনুভবে অবশ্যই আন্তরিক।

"শ্রাবণে ডেপুটিপনা এতো কভু নয় সনা·—
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।"

এখানেও সেই সুপ্রাচীন বর্ষার স্মৃতিচারণ এবং নষ্ট অতীতের জন্য নিরতিশয় আক্ষেপ—

"নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেইরে যৌবন মধু,
মুচেছে পথিক বধূ সজল নয়ান।"

অবসর যাপনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আষাঢ়ে গল্পের স্মৃতিও কবিচিত্তে সোচ্চার—

'আষাঢ়ে গল্প' সে কই! সেও বুঝি গেল ওই

আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিস।"

আশ্চর্যের কিছু নয় যে, তাঁর 'শিশু' কাব্যের 'ছুটির দিনে'

"......বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকে-বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।"

এবং তখন শিশুর শেষ কথা—

"বড়ো হব তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।"

স্বাভাবিক কারণেই যখন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' তখন—

"বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ,—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।"

এই প্রসঙ্গে 'খোকার রাজ্য'টির প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে—

"আসি শালবন 'পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।"

বর্ষামুখর দিনে 'অকাজের কাজ' নিয়ে আনন্দময় অবকাশ যাপনের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'চোখের বালি' উপন্যাসে। সেখানে আশা অন্যাসক্ত স্বামীকে শয়নশয্যায় দেখে স্মৃতিবেদনাভারে পীড়িত হয়েছে। আশার সেই স্মৃতিবেদনার বিষণ্ণ মালায় "দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা"র সঙ্গে "আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন"ও গাঁথা হয়ে আছে।

স্মরণীয় যে, বসন্তের প্রসঙ্গেও কবি বর্ষার কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। প্রমাণ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর বসন্তযাপন। কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে বর্ষার দিনে কাজকর্ম বন্ধ থাকত এবং ফলে প্রকৃতি সম্ভোগের অবাধ সুযোগ বর্তমান ছিল। আজ আর সেদিন নেই।

কবি মনে করেন যে, পাঁজিতে যদি বিশেষ বিশেষ ঋতুতে কাজকর্ম নিষিদ্ধ হত তাহলে ভালো হত। কবি অবশ্যই এখানে বসন্তযাপনের কথা বলছেন, কেননা সেটাই অপেক্ষিত ; কিন্তু সেই নিষিদ্ধ ঋতুর তালিকায় বর্ষাকে পেলে তিনি যে যৎপরোনাস্তি খুশি হতেন তার প্রমাণ অজস্র।

প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণই যে শিশুশিক্ষার প্রকৃত পাঠশালা কবি সেকথা শুধু মুখে বলেননি, কাজেও দেখিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অরণ্য-প্রকৃতি নাট্যশালা এবং ষড়ঋতু আসলে ছয় অঙ্কে রচিত 'নানারসবিচিত্র নাট্যাভিনয়।" বর্ষাতেই এই নাট্যাভিনয়ের নাট্যরস নিবিড় গভীর এবং জমজমাট। স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতির সেই আনন্দময় 'শিক্ষাক্ষেত্রে' শিশুদের আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি বর্ষার কথাই আগে বলেন—"তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে…।" বর্ষা যে ক্ষত্রকুলোদ্ভব কবি দেখছি সে কথাটি এখানেও স্মরণ রেখেছেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে বর্ষাবকাশ সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে।

কবির বয়স্ক ভাবনায় বর্ষাবকাশের চারপাশে সঙ্গীতের বিচিত্র মূর্ছনা, প্রণয়ের মধুর গুঞ্জন। তাঁর শিশু ভাবনায় বর্ষাবকাশের চতুর্দিকে ছুটির আনন্দ, বন্দী প্রাণের মুক্তির উল্লাস। ছিন্নপত্রের ১৬৯ সংখ্যক পত্রে বোলপুরের বর্ষার বর্ণনাসূত্রে নর্মালস্কুলের বর্ষাদিনের অনধ্যায়ের স্মৃতি। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধেও কবি বর্ষার জলধারার মধ্যে স্কুল ছাড়া ছাত্রীদের কলহাস্যই শুনেছেন। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের 'মুখু' কবিতায় বর্ষা শিশুর ছুটির প্রতীক। 'শিশু' কাব্যের 'বৈজ্ঞানিক' কবিতায় আষাঢ়ে অর্থাৎ বর্ষায় পৃথিবীর বুকের বদ্ধ পাঠশালায় ফুলের ছুটি। শিশুচিত্তের এই আশ্চর্য অনুপম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে কবি-চিত্তেরও সানন্দ স্বীকৃতি।

"ওরা সব ইস্কুলের ছেলে,
পুঁথি-পত্র কাঁখে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
… …. …
বোশেখ-জষ্টি মাসকে ওরা

দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার করে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।"

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার বুকে শুধু বিরহের ব্যথা নেই, মিলনের কথাও আছে। তবে স্বীকার্য যে, মিলন অপেক্ষা বিরহেরই প্রাধান্য। কবির কৈফিয়ৎটুকুও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলন পদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।" 'শ্রাবণ গাথা'য় রাজা যখন নটরাজের পালাগানে মিলন অপেক্ষা বিরহের প্রাধান্য দেখে অভিযোগ জানালেন তখন নটরাজ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "মহারাজ রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি মাত্র ফুল একদিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক না আকুল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।" রবীন্দ্রনাথের বর্ষাভাবনায় এই মিলন আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর, মেঘের সঙ্গে মাটির, তৃষ্ণার সঙ্গে সুধার। রবীন্দ্রনাথ অজস্রবার ধরণীকে দেখেছেন রমণীর রূপকে, বোধহয় সেই কারণেই তাঁর কাব্যে মেঘ এসেছে পুরুষের পোষাকে। তাছাড়া, কবির দৃষ্টিতে বর্ষা শুধু পুরুষ নয়, দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয় পুরুষ। কবি বলেছেন, "বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরু গুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমাল-তালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়।" (আষাঢ়, বিচিত্র প্রবন্ধ)। 'শ্রাবণ গাথা'তেও কবি বলেছেন, "শ্রাবণ মেয়ে নয়, সে পুরুষ…।" ধরণীর বুকে তার পদার্পণ বীরবেশে এবং বরবেশে। ছিন্নপত্রে সেই বীরের দুর্দান্ত অভিমানী রূপের বাস্তব চিত্র—"জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায়

দাঁড়িয়ে আছে আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে, সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনো পোষ মানেনি—দিগন্তের একটি কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে।" এই অভিমানী বরের পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের এবং সেই সঙ্গে আকাশ পৃথিবীর মধুর মিলনের চিত্র 'লিপিকা'র মেঘদূত রচনাটিতে—"বহু দূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল।" রবীন্দ্রভাবনায় বর্ষাপ্রসঙ্গে মিলনতরীর সারিগান এসেছে বিরহবন্যার ওপার থেকে সজল হাওয়ায় ভেসে।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
… … …
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষণে মুখরিয়া
বিজুলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।।"

শুষ্ক মাটির সঙ্গে বর্ষার জলধারার, আকাশ পৃথিবীর এই মিলন চিত্রটি রবীন্দ্র-ভাবনায় বারে বারে সোচ্চার। 'সংস্কার' গল্পে পরিহাসের সুরে বলা হলেও উপমাটির বুকে বর্ষারই জলধারা এবং আকাশ পৃথিবীর মহামিলনের বার্তা—"স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো।" সভাপতির অভিভাষণেও (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী) স্বদেশহিতের জন্য সংকল্পবদ্ধ স্বেচ্ছাব্রতধারী যুবকদের উপমা—"তৃষাতুর দেশে প্রেমের বাদল।" 'মালিনী'তে সুপ্রিয়র জীবনে মালিনীর আবির্ভাব বর্ষার সুধাবৃষ্টির ন্যায়। 'কালান্তর' প্রবন্ধে য়ুরোপীয় চিত্তের প্রচণ্ড জঙ্গমশক্তির ভারতবর্ষীয় চিত্তে সুদূরাগত অথচ সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রসঙ্গেও সেই একই উপমা—"য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"

আসলে বর্ষা সেই রুদ্রেরই প্রেমিক মূর্তি, প্রচণ্ডেরই প্রসন্ন রূপ। বৈশাখকে

কবি দেখেছেন দুঃসহ তপস্বী রূপে, বর্ষাকে দেখেছেন তারই স্নেহবিগলিত করুণাঘন রূপে। নটরাজে 'আষাঢ়'-এর আবির্ভাব বীরবেশে এবং বরবেশে, বিরহতপ্ত ধরণীর দুঃসহ দুর্দিনের অবসানে।

"ওই বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি,
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।"

সেই বিজয়ী বীর, সেই বাঞ্ছিত বরকে বরণের জন্য ধরণীর বিচিত্র বাসর সজ্জা—

"কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক
আজি বন্দনা সংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গিতে।
শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে
রাখিবি দুয়ারে আল্পনা আঁকি
বরণের তলে ধূলা দিবি ঢাকি
টগর করবী রঙ্গনে।"

বর্ষামিলনোৎসুকা ধরণীর চিত্র রচনায় কবিকল্পনার নেপথ্যে কালিদাস (পাবর্তী-পরমেশ্বর) এবং বৈষ্ণব পদাবলী—(রাধা শ্যাম)-র নিগূঢ় অবস্থানটুকু লক্ষণীয়।

'লীলা'তে বর্ষা নটরাজেরই স্নেহকোমল, মধুর মনোহর রূপ সে কারণেই

"বৈশাখী ঝ'ড় সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।"

'বর্ষামঙ্গল'-এও সেই কথারই পুনরুচ্চারণ। সন্ন্যাসীর আবির্ভাব প্রেমিক রূপে—

"ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে।
গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।"

কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলা 'শ্রাবণ গাথা'য়। নটরাজ বলেছেন "ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে,...। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামা জটাভার—প্রসন্ন তাঁর মুখ।...

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।"

'শেষ সপ্তকের' 'সাঁইত্রিশ' সংখ্যার কবিতাটিতেও আকাশ-পৃথিবীর পার্বতী পরমেশ্বর মিলনের মধুর চিত্র।

"বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।
— — — —
দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরু বক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।"

জানি বাসন্তী পৃথিবীর কথা উঠবে। বসন্ত দিনেও তো পৃথিবী সেজেছে বাসন্তীপুলকে। এ বাবদে 'মহুয়া' একাই একশো। সেই বসন্ত মিলন দিনেও

বিশ্বখাতায় পুষ্প পাতার হিসাব ছিল না। উতলা ধরণী উৎসুক ও উন্মুখ হয়েছিল বসন্ত বরণে—

পথ পাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি। (বরযাত্রা)

ধরণীর পক্ষ থেকে মোক্ষম কথাটি কবি নিজেই বলে দিয়েছেন 'ক্ষণিকা'য়—

"যদি বল্ আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে
বলেছিলি, 'কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে'—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারও সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।"

রসিকতার কথা বাদ দিলে আসল সত্য যা অবশিষ্ট থাকে তা যথার্থভাবে প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের বহু বিবাহ (বশীকরণ) প্রহসনের অন্নদার কথা ধার করার প্রয়োজন অনুভব করি—"বহু বিবাহ কাকে বলে এবার সেটা নতুন করে বুঝেছি।" সেই একের সঙ্গেই প্রকৃতির বহুবার করে মিলন হচ্ছে। একটি পুরাতনকেই আমরা বারে বারে নূতন করে পাচ্ছি। শীত বুড়োর জরার জীর্ণ-বেশে ঝেড়ে ফেলে বসন্ত আসে তার মোহন উত্তরীয় গায়ে দিয়ে, বৈশাখের তপ্ত ক্লান্ত তৃষ্ণার দরখাস্তের বুকে বর্ষার ঢেউ নামে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে, শ্রাবণের ঘনকৃষ্ণ মেঘকে অবলীলায় মুছে দিয়ে শরতের মোহন অঙ্গুলি আঁকে মায়াবী রোদের মধুর আল্পনা।

'পূরবী'র 'লিপি' কবিতাটিতেও এই বার্তা—ধরণীর বুকে পত্রপুষ্পের বিচিত্র আল্পনা ঋতু পার্বিক পত্রের পাঠোদ্ধারের পুলকিত আনন্দের রূপকে। "এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ", কথাগুলি স্বয়ং কবির! অন্নদা ও আত্তর কথা দিয়েই শেষ কথাটা বলি; এই মিলন আসলে পুনর্মিলন—

"হারাধনকে ফিরে পাওয়া—যেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা হারানো জীবনকে আবার নতুন করে পাই।"

বর্ষায় শুধু নদীর বুকে কলধ্বনির সৃষ্টি হয় না, মানুষের বুকেও না-বলা বাণীর কলরব ওঠে, অব্যক্ত ব্যক্ত হতে চায়। 'শেষের কবিতা'র অমিত পরিহাস—তরল কণ্ঠে বলেছে যে, "আমার মধ্যে বকুনির মনসুন নেমেছে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে, এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই।" অমিতের ভাষা দিয়েই বলা যায় যে, শীতল আঁধারে ঢাকা বর্ষণ মুখরিত দিনই "অসম্বদ্ধ প্রলাপের" উপযুক্ত অবসর এবং বলা বাহুল্য যে, কবির বর্ষাভাবনায় এটি একটি লক্ষণীয় বার্তা। আকাশের বর্ষা শুধু প্রকৃতির উদ্যানে ফুল ফোটায় না, মনের মুকুল, বুকের ব্যথাকেও ফুল হয়ে ফুটে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে। লাবণ্যের মনোভাবে কবির সেই প্রিয় ভাবনাটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। "বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছট্‌ফট্ করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরণাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা—অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে।" অমিত তার স্রষ্টারই সোদর, কাজেই অনুরূপ ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে সে নিশ্চয়ই এই ভাবেই বলত,

> "হে নিরুপমা,
> চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
> করিয়ো ক্ষমা।
> এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
> বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
> বকুল বীথিকা মুকুলে মত্ত
> কানন'-পরে—
> নব কদম্ব মদির গন্ধে

আকুল করে।"

প্রকৃতপক্ষে 'ক্ষণিকা'র 'সবিনয়' কবিতাটি কবির বর্ষামেদুর মনের আকাশের বেশ কিছু গূঢ় বার্তার অতি তরলীকরণ, পরিহাসসিক্ত কণ্ঠের সবিনয় নিবেদন। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও এই বার্তার বিচিত্র মূর্ছনা।

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন-খোলা যায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।"

'চোখের বালি' উপন্যাসে বিহারীর কাছে অন্তরের গভীর অনুভূতির নৈবেদ্য তুলে ধরার পর বিনোদিনীর "সমস্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।" স্মরণীয় যে, নববর্ষার সমাগমে গঙ্গার রাজকীয় সমারোহের পটভূমিকায় বিহারীরও হৃদয় দ্বার খুলেছে এই উপন্যাসেই।

তাছাড়া শুধু 'শেষের কবিতা' বা সঙ্গীতে নয়, এই বিশিষ্ট মনোভাবটি তাঁর কবিজীবনের প্রথম প্রভাতেই সুপরিস্ফুট। 'মানসী' কাব্যের 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় যখন "আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে / ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে" তখন—

"মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিতে আর্দ্র উতরোল বায়।"

রবীন্দ্রভাবনার আকাশে বর্ষার শুধু মধুর-মনোহর রোম্যান্টিক রূপশ্রী নয়, অতি-বাস্তব মুখশ্রীটিও ক্বচিৎ কখনো আত্মপ্রকাশ করেছে। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে বর্ষার মর্মযন্ত্রণা পথচলা পথিকের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে—

"একটু বাদলার হাওয়া দিয়েছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতা জোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া উঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল।...কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে

আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদ চারি করে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে ?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার-রাগেন, যতিতালাভ্যাং।"

কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ভিন্নার্থে হলেও কালিদাসের পথিকবধূদের কথা এই দুর্বিসহ বর্ষাপ্রসঙ্গেও রবীন্দ্রভাবনার দিগন্তে জ্বল জ্বল করছে।

পরিশেষে একটি আশ্চর্য যোগাযোগের কথা উল্লেখ করতে হয়। ৭ই আষাঢ়ে যোগাযোগ উপন্যাসটিরও সূত্রপাত। আমরা কিন্তু সে যোগাযোগের কথা বলছি না। আমরা কিছুটা দুঃসাহসিকভাবেই একটি গূঢ় যোগাযোগের কথা ভাবছি। 'শ্রাবণগাথা'র নটরাজের শেষ কথাগুলি—"বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে" শুনতে শুনতে সন্দেহ হয় এগুলি কোনো কিছুর পূর্বানুমান বা পূর্বাভাস নয় তো ! শ্রাবণকে ঘিরে চলে যাবার কথা, পাখির উড়ে যাওয়ার কথা কত বিচিত্রভাবেই না বেজেছে কবির মনের বীণায়। "মন মোর মেঘের সঙ্গী" তাঁর সাঙ্গীতিক স্বীকারোক্তি। "আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে / গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে" অথবা "পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে / মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে" ইত্যাদি তো স্পষ্টতই সাঙ্কেতিক। কবির ঘোষণা—

পাগল হাওয়ায় বাদল দিনে
পাগল আমার মন জেগে উঠে।
... ...
ঘরের মুখে আর কি রে
কোনোদিন সে যাবে ফিরে ?"

কবির প্রার্থেনা—

"ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পুবের হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।"

'প্রেম' পর্যায়ের কয়েকটি সঙ্গীতের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমরা সঙ্গীতের ব্যাকরণ জানিনা। তবে সাহিত্যের ব্যাকরণে এগুলি যে বাদল-

রাগের বিদায় রাগিণী সে কথা শপথ করে বলার সাহস রাখি।

(১)

জানি, জানি হ'ল যাবার আয়োজন—
তবু, পথিক থামো থামো কিছুক্ষণ"
শ্রাবণ গগন বারি-ঝরা
কাননবীথি ছায়ায় ভরা,
...　　　...　　　...
"যেয়ো—যখন বাদল শেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি ডাকি।...'-　(১৭০)

(২)

"আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
বাদল প্রাতের উদাস পাখি ওঠে ডাকি...।"　(১৭১)

(৩)

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে যা, যা উড়ে যা, যা রে একাকী।
...　　　...　　　...
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি॥"　(২১১)

সর্বত্রই "শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়" "প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায় দূরকালের অরণ্যছায়াতলে" (২৬৬)। স্মরণ করা যেতে পারে যে, কবির জীবনপ্রভাতেই শ্যামসমান মরণের আবির্ভাব ও অভ্যর্থনা মেঘেরই আকারে ও অনুভবে।

মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।　(ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

লক্ষণীয় যে, মৃত্যু এবং অমৃত এই দুটি বিপরীত তথ্য ও 'একই নিশ্বাসে উচ্চারিত এবং একটি পরম সত্যে সাঙ্গীকৃত। মৃত্যু ও অমৃতের, সীমা ও অসীমের, জরা ও যৌবনের, বিরহ ও মিলনের এই মেলবন্ধনই তো কবির বাণীবন্দনার স্বপ্ন, সাধ-সাধনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্যই সিদ্ধি। অন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে

সাধ সিদ্ধির কণ্ঠলগ্ন বলেই মনে হয়। একটি গানে শুনি

"যদি হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন"
... ...
আজ শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন ।।" (প্রেম, ১৭৪)

'সোনার তরী'র 'ঝুলন' কবিতাতেও 'যখন বরষা গগন আঁধার' তখনই কবির মরণদোলায় দোলার সাধ। 'উৎসর্গ' কাব্যের 'মরণ মিলন' কবিতাতেও পূর্বপথ ছেড়ে অপূর্বের পথে পা বাড়ানোর প্রাক্কালে 'সেই মহাবরষার রাঙা জল তরণের' নির্ভীক সংকল্প। বাস্তবে জীবনেও তো কবি বৈশাখের তপস্তাপূত পুণ্য শ্রাবণে তাঁর কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে গেলেন। শ্রাবণ গাথা বুঝি জীবনগাথার নির্ভুল সঙ্কেত।

"বাদল ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর ।।"

রবীন্দ্রনাথের শরৎ ভাবনা

'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"দেখেছি ঋতুরঙ্গ ভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।"

কবি যে কথা বলেননি অথচ অনায়াসে বলতে পারতেন তা এই যে, তাঁর শিল্পে সেই নৃত্যের নির্ভুল সঙ্গত, অপরূপ শ্রী ও সৌন্দর্য। 'শেষ সপ্তকে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখেছেন,

"আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
'খোলো আবরণ।'
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে,
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।"

শেষ কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও গভীর ভাবে সত্য। তাঁর দুটি চোখেও ছিল সহস্র চক্ষুর ক্ষুধা ও ক্ষমতা। পুরাতন পরিচিত প্রকৃতিকে তিনি সর্বদাই দেখেছেন নতুন এক জোড়া চোখ দিয়ে এবং সে চোখ থেকে বিস্ময়ের অঞ্জন মুহূর্তের জন্যেও মুছে যায় নি। অন্যথা ৭৪তম জন্মদিনে প্রকাশিত কাব্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে এ কথা বলা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না যে,

"আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা
আমি দেখলেম নবীনকে
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।" (শেষ সপ্তক / তেইশ)

সাহিত্য সাধনায় সেই চোখে দেখা ছায়াছবি মায়াবী রূপ নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত আনন্দে। সানন্দে স্বীকার্য যে, ঋতুরঙ্গের সাংবাৎসরিক নৃত্যসভার কবি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্য এ বাবদে একাধারে ভোক্তা ও ভোজ। একথা অস্বীকার করলে প্রত্যবায় হবে যে, বাংলার অধুনাতম সাংস্কৃতিক মানচিত্রটি যেমন অনেকাংশে রাবীন্দ্রিক, বাংলার প্রকৃতি তেমনি সর্বাংশেই কবির কিরণে দীপ্ত, রবির মায়াবী আলোকে স্বপ্নাতুর। বাংলার আকাশে সেই আলোকের মুগ্ধ আবেশ, বিচিত্র বর্ণ বিলাস এবং অপরূপ কারুকাজ।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক অবসর বিনোদনের উপায় বা কাব্যরচনার উপাদান মাত্র ছিল না, ছিল অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ, আনন্দ ও আশ্বাস। বছরে বছরে অদৃশ্য শিল্পকারের অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত অঙ্কিত হয়েছে তাঁর অন্তর ফলকে এবং শিল্প পাত্রে। এমন ঋতু মনস্ক কবি কাব্য সংসারে যথার্থই বিরল। তাঁর হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট গুচ্ছে গুচ্ছে অঙ্গুলি মেলে প্রতিদিনের আকাশ থেকে ভরে নিয়েছে আলোকের তেজোরস। কবি স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতি ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর যোগ হয়েছে মনোবৃক্ষের ছড়িয়েপড়া রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে। সর্বত্র এবং সব সময়েই কবির প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে নিয়েছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে। সেই সূত্রেই দেখি যে, শ্রাবণ বা ফাল্গুন অর্থাৎ বর্ষা বা বসন্ত শুধু নয়, আশ্বিন অর্থাৎ শরৎ ও সুর দিয়েছে কবির জীবন বীণায়—

> আশ্বিনে দুপুর বেলা
> এই কাঁপন লাগা ঘাসের উপর,
> মাঠের পারে, কাশের বনে,
> হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
> মিলেছে আমার জীবন বীণার ফাঁকে ফাঁকে।"

(প্রাণের রস / শ্যামলী)

স্বীকার্য যে, রবীন্দ্র ভাবনায় বর্ষা এবং বসন্ত যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে আছে শরতের স্থান সে তুলনায় যথেষ্ট সঙ্কুচিত। কিন্তু কোনো কিছুর গৌরব তার আকারে বা আয়তনে নয়। অসীম আকাশের গাঢ় অন্ধকারকে জয় করার পক্ষে একটি নক্ষত্রের আলোকই যথেষ্ট, সামান্য একটি কুশল প্রশ্নেই শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক পেতে পারে নির্ভুল এবং নিরাপদ নীড়ের ঠিকানা। আকারে এবং

আয়তনে বর্ষা বসন্তের কাছে শরৎ দাঁড়াতেই পারেনা এবং স্বভাব ধর্মেও সে লক্ষণীয় রূপেই পৃথক্ কিন্তু তাই বলে গৌরব তার কম নয়। অন্ততঃ একথা মানতেই হবে যে, রাবীন্দ্রিক ঋতুমাল্যে এটাই পবিত্রতম এবং বোধকরি প্রিয়তম পুষ্প। বর্ষার রং ঘননীল, বসন্ত ঘোর লাল, শরৎ শুভ্র। বর্ষা এবং বসন্তে উন্মাদনা, শরৎ আনমনা।

চেহারা এবং চরিত্রে শরৎ যেমন ভদ্র ও নম্র, আয়ুর বিচারে ও তেমনি স্বল্পজীবী। মধুর স্বভাব, মৃদু ভাষী এই ঋতুটির অনেকটা জমি গায়ের জোরে দখল করে নেয় বল দৃপ্ত বর্ষা। কালিদাসের কালে নিরীহ হরিণ শিশুর প্রতি উদ্যত নির্মম বাণ প্রত্যাহৃত হয়েছে বনবাসীদের সকাতর অনুরোধে। কিন্তু কোনোকালেই বর্ষাকে বিরত করা কারুর সাধ্য নয়। কবি বড় জোর বলেন, ‘কোন খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙ্গিনায়।’ ‘নির্মলকান্ত’ ‘স্নিগ্ধ সুশান্ত’ অতি ভালো মানুষ শরতের সাধ্য নেই বর্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার। তবে একটুখানি সুযোগ পেলেই এই নির্বিরোধী ঋতুটি বর্ষণরিক্ত মেঘের ভারমুক্ত নৌকায় পাল তুলে নীল আকাশে খুশির আলো ছড়িয়ে দেয়, ছুটির নকশা আঁকে। শরতের এই খুশির আলো এবং ছুটির নকশাটি রবির কিরণে বারংবার দীপ্ত ও দৃষ্ট।

রবীন্দ্রভাবনা ও সৃষ্টিতে বসন্তের বিহ্বল মায়া এবং বর্ষার মেঘমেদুর ছায়া যত গূঢ় ও গাঢ় হোক না কেন শরতের সোনালি রোদের আল্পনাটিও সেখানে অতিশয় উজ্জ্বল। ক্ষণিকা কাব্যের ‘অনবসর’ কবিতায় বর্ষা বসন্তের সঙ্গে অন্য যে ঋতুটি এক নিশ্বাসে উচ্চারিত সে শরৎ

“এসো আমার শ্রাবণ নিশি,
এসো আমার শরৎ লক্ষ্মী
এসো আমার বসন্ত দিন
লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী।”

শরতের এই মধ্যবর্তিনী অবস্থান শুধুমাত্র ছন্দমিলের প্রয়োজনে? মনে হয় না। এক পাশে শ্রাবণ নিশি অপর দিকে বসন্ত দিন, মাঝখানে শরৎ লক্ষ্মীর আঁচলে আলোছায়ার খেলা। কেন জানি না রামায়ণের বনবাস যাত্রার ছবিটি মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। সম্মুখে নব দূর্বাদল শ্যাম রাম, মধ্যে অবনত মুখী কল্যাণী সীতা, পশ্চাতে সুন্দর লক্ষ্মণ। রাম লক্ষ্মণের তুলনায় সীতা বড়ো কোমল, বড়ো করুণ, মৃদু ভাষিণী ও মধুর। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্র ভাবনাতে ও

শরতের কল্যাণী রূপটিরই প্রাধান্য। বর্ষা, বসন্ত পুরুষ, শরৎ নারী "গীতালি"-তে যে—

"মাণিক গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কনে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গিতে" (২৬)

'গীতিমাল্যে' তারই আমন্ত্রণ,

"এসো সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।" (৩)

আসলে এতোখানি কোমলতা নারীকেই সাজে। 'গীতালি'তে শরৎ রাণীই কবির মনোবন বিহারিণী।

"এই শরৎ আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে
হাওয়ায় কাঁপে আঁচল খানি,
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।" (১৫)

কবির কাব্য কুঞ্জ বনে ফুল ফোটানোর এবং ফল ধরানোর জন্য বর্ষা-বসন্তের দান ও হাত যতখানি শরতের ও ঠিক ততখানি ; বরং কিছু বেশী বলেই মনে হয়। অন্ততঃ কবির কাব্য কুঞ্জবনে মুকুল ধরার লগ্নে শরতের একক আধিপত্য। জীবন স্মৃতির পাতায় তারই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"জানিনা কেন আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান পাকানো শরৎ তেমনি আমার গান-পাকানো শরৎ ; সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় আকাশের গোলা বোঝাই করা শরৎ ; আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি আঁকানো গল্প বানানো শরৎ।" শেষ কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কবির শরৎ ভাবনা পদ্মের মর্মকোষের গূঢ় স্বাদ গন্ধের স্মারক ও সঙ্কেত।

রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমলের' প্রধান ঋতু বর্ষা বা বসন্ত নয়, সুনিশ্চিত

রূপেই শরৎ। কবি প্রাণে 'যোগিয়া রাগিণী'র তান এই শরতেরই সঙ্গতে 'কাঙালিনী' কবিতার পেক্ষাপটে।

"আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।"

সেই সঙ্গে বাঙালীর সাংবাৎসরিক উৎসবের উল্লেখ

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"

'খেলা'তে শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশ এবং রৌদ্রস্নাত ধরণীর মধুর চিত্র

"উপর পানে আকাশ শুধু
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে
মধুর পথ ঘাট।"

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হয় যে, রবীন্দ্র ভাবনায় শরতের সঙ্গে ছুটি ও লেখার সম্পর্ক সুনিবিড়। সে কথা বিস্তৃত ভাবে বলার আগে কবির দৃষ্টিস্নাত অতি নরম, অতি পেলব এই সৌম্য দর্শন ঋতুটিকে দু' চোখ ভরে দেখে নিতে চাই। অবশ্যই এই কথা স্মরণ রেখে যে, কবির প্রকৃতি সম্ভোগের অন্তঃপুরে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে এবং তাঁর প্রকৃতি চেতনায় আশ্চর্য রোম্যান্টিক মানসিকতার রূপ নির্মাণে শরতের আকাশ বাতাস অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

রবির কিরণ দীপ্ত শরতের স্বয়ং রবির চোখে দেখা শান্তিনিকেতনের শারদ প্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে—শিউলি বন সাড়া দিয়েছে, মাধবীলতার পাতায় পাতায় শুভ্র ফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশজোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুই ধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে পথিকদের শারদ-সঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি এই রব উঠেছে।....গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে ; কিন্তু তাদের নন্দী ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেত কিরণের মালা পরেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নাই।"

শরতের এই পার্থিব রূপটি অপার্থিব সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়েছে রবির

আলোকে। রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহক নন, পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, কবির শরৎ ভাবনায় শরতের দুটি পরিচিত পুষ্প শিউলি এবং কাশ বারংবার স্মরণে সুন্দর এবং মননে মধুর। স্মরণীয় যে, শিউলি এবং কাশের বর্ণ শুভ্র এবং উভয়েই লঘুভার। অর্থাৎ শরতের মর্মচিত্রের সঙ্গে এক রঙে আঁকা, একসুরে বাঁধা। আরো লক্ষণীয় যে, শরতের মেঘের বুকেও শ্বেত-চন্দনের ছাপ। শরৎ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত শুভ্র ও সুন্দর। লক্ষণীয় যে 'মহুয়া'র মূল ঋতু বসন্ত হলেও সেখানেও শরতেরই শীর্ষ স্থান অন্ততঃ "লগ্নের" বিচারে। বর্ষা বসন্তের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে শরৎ এবং স্বীকৃতি পেয়েছে প্রথম মিলন দিনের উপযুক্ত 'লগ্ন' রূপে। কারণ সেদিন—

"বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।"

এ যেন বসন্তের বাসরে বসে শরতের প্রশস্তি রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনায় যে শুভ্রতা ও কোমলতা তার মর্মমূলে শরতের হাত অনেকখানি, একথা বললে বোধহয় অপরাধ হয় না। 'স্ফুলিঙ্গে' ও সেই শুভ্র প্রাণের শুভবার্তা, শুভব্রতার মধুর মনোহর রূপাল্পনা।

"বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্র প্রাণের গীতি।" (স্ফুলিঙ্গ ১৭৬)

বর্ষায় কদম্ব (কখনো কদম্ব, কখনো নীপ) বা বসন্তে পলাশের মতো শরতের শিউলি কবির ঋতু ভাবনার এই বিশিষ্ট পর্বটি আলোকিত করে আছে। তাছাড়া বর্ষা বসন্তের একচ্ছত্র অধিকার কদম্ব বা পলাশের আছে কিনা এ নিয়ে সঙ্গত তর্কের অবকাশ আছে। এখানে বিবাদীর সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু শিউলিই যে শরতের বুক জোড়া ধন এ কথার প্রতিবাদ করার মতো কেউ আছে বলে মনে হয় না। বনবাণীর সাক্ষ্যেও শেফালি আশ্বিনের প্রাণের প্রতীক যদিও বসন্ত বর্ষার প্রতিনিধি রূপে সেখানে পলাশ বা কদম্ব নেই, আছে বেল ও জুঁই। কবি বলেছেন,

"বেল জুঁই শেফালিরে

জানি আমি ফিরে ফিরে
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা।"

(নীলমণিলতা)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শেফালিকা অপেক্ষা শেফালি বা বিশেষভাবে শিউলি নামটির প্রতিই কবির আকর্ষণ প্রবল এবং তার প্রমাণও প্রচুর। শেফালিকা ক্বচিৎ, মাঝে মধ্যে শেফালি, প্রায় সর্বত্রই শিউলি। তার কারণটিও অতিশয় স্পষ্ট। শেফালিকার তুলনায় শেফালি বা শিউলি যেমন নরম তেমনি লঘুভার। অর্থাৎ একান্তই শরতের সঙ্গে একাত্ম। শরতের 'পরিচয়' দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলি ফুলের সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো।" কিন্তু শুধু গন্ধে নয়, রূপে ও চরিত্রেও শরৎ ও শেফালি বাগর্থের মতো এক এবং অভিন্ন। 'শেষ বর্ষণে' শরতের আগমন ঘোষণা করে নটরাজ বলেছেন, "ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌচেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা।" স্বাভাবিক কারণেই কাশের গুচ্ছ, নবীন ধানের মঞ্জরী এবং শেফালি মালা হাতে নিয়েই 'শুভ্র মেঘের রথে' 'নির্মল নীল পথে' স্বাগত শরৎলক্ষ্মীর বরণ রবীন্দ্র-কাব্যে।

"আমরা গেঁথেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।" (গীতাঞ্জলি ১১)

'শারদোৎসব' খেলার জন্য সন্ন্যাসী বালকদের উপকরণ সংগ্রহের বরাত দিয়ে বলেছেন, "ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর তোমরা আজ শিউলি ফুলের মালা গেঁথে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।"

এই নয়ন-ভোলানো শরতের মর্তভূমিতে মধুর পদার্পণ শিউলি-তলার পাশ দিয়ে—

"শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরাফুলের রাশে রাশে

শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে।" (গীতাঞ্জলি ১৩)

আসলে কবির শরৎ ভাবনায় শরৎ এবং শিউলি, কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'মৃগ মদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।' এক অতি পেলব, অতি পবিত্র শুভ্র-সুকুমার আলোর বৃন্তে শরতের সঙ্গে শিউলিও ফুটেছে কবির ভাবনার ভূমিতে। 'গীতিমাল্য' কাব্যের ৩ নং কবিতার সাক্ষ্যে শরৎ, "শেফালি বনের মনের কামনা", অপরদিকে 'পুরবী' কাব্যের 'যাত্রা' কবিতায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, '…শেফালি, শরৎ নিশির স্বপ্ন।" কবির কাব্য কুঞ্জবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিউলির বৃহৎ উৎসব। 'কড়ি ও কোমলে'র 'আকাঙ্ক্ষা কবিতায় কবি বলেছেন,

"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।"

শরৎ প্রসঙ্গে এই মন-কেমন করা ভাবটুকুও কবির শরৎ-ভাবনার নিত্য অনুষঙ্গ, তবে সে প্রসঙ্গ পরে। এখানে শিউলির কথা কড়ি ও 'কোমলে' যার উচ্চারণ 'শেফালি' রূপে। পরবর্তী কাব্য 'মানসী'তে শরৎ প্রসঙ্গে শিউলি এসেছে অবিকল সংস্কৃত সাজে—

"বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘ জাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।
কাননে ফুটিত শেফালিকা
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল।"

'সোনার তরী'তেই রবি স্বক্ষেত্রে তুঙ্গী। এবং এখান থেকেই তিনি শেফালিকা ছেড়ে শেফালির অনুরক্ত এবং পরিণামে শিউলির একনিষ্ঠ ভক্ত। 'মানস সুন্দরী' কবিতায়—

"নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি।"

'কল্পনা'র 'শরৎ' আসলে বাংলার শোভন-সুন্দর শারদীয় রূপচিত্র এবং সেখানেও শেফালির অনিবার্য স্মরণ—

"মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।"

"জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত" কবির দৃষ্টি-নন্দিত শরৎ চিত্রের একটি নির্ভুল এবং নিরুপম অভিজ্ঞান। কিন্তু 'সে কথা এখন নয়।' এখনো শিউলির কথা বলা হয়নি। 'শিশু' থেকেই শিউলির জয়যাত্রা। "কাগজের নৌকা' কবিতায় –

"আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি।
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়
শিশিরের জল করে ঝলমল
প্রভাতের আলো পড়ি।"

'খেয়া'র 'দিঘি'তে "শিউলি শাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে।" লক্ষণীয় যে, শিউলি এখানে শরৎ-সম্পৃক্ত নয়, সম্পূর্ণ রূপেই শরৎ নিরপেক্ষ এবং দাঁড়িয়ে আছে নিছক নিজের জোরেই। কোকিলের কুহু তানে বাসন্তিক উন্মদনার পরিবর্তে 'করুণ কাকলি' সৃষ্টির প্রয়োজনেই বোধয় শিউলির এই অকাল স্মরণ।

'গীতালি'তে "শিউলি বনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুর মূলে"[২] এবং "শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।"[৩]

'পলাতকা' কাব্যের 'ছিন্নপত্র' কবিতায় কবির প্রথম প্রণয় স্বপ্নের পুনঃস্মরণ শিশির স্নাত শিউলিরই প্রতীকে।

"সেই তো আমার শিশুকালের শিউলি ফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।"

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যেও শিশুর মনে পড়ে মায়ের কথা "যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলি বনে শিশির ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে"[৪] 'পূরবী'তে বোধকরি ভুল করেই "ভোরের বাতাসে / শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে।"[৫]

প্রমাণ 'পুনশ্চ'-এ 'পুকুর ধারে' "এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি।" এখানেই "কীটের সংসারে"ও কবি দেখেছেন "শিউলি গাছে কুঁড়ি ধরেছে, টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।" এমন কি 'অস্থানে' ও শ্রাবণ অবসানে "মৌমাছিদের আনাগোনায় উঠত কেঁপে শিউলি তলার ছায়া।" 'বীথিকা'র 'মিলন যাত্রা'য় দেখি যে, "শিউলির তল / আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল / ফুলের সর্বস্ব নিবেদনে"। এখানেই "আশ্বিনেরই নব প্রাতে শিউলি বনে"র আলোটির সঙ্গে "নব পরিচয়" এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যটিও স্বীকৃত যে, "ঘাসে ঝরে পড়া শিউলির সৌরভে / মন কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।"[৬] 'পত্রপুটে' "শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে।"[৭] 'মহুয়া'র 'লগ্ন' কবিতাটির সূত্রেই "পরিশেষে"র 'আহ্বান'টুকু স্মরণীয়। সেই শরৎ-সুন্দর লগ্নেই কবির অভিসার।

"বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির ধোয়া আলোতে-ছোঁয়া শিউলি ছাওয়া ঘাসে।"

'রোগ শয্যায়' শারদ প্রভাতে কবি লক্ষ্য করেছেন, "ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি শেফালি কুসুম রুচি আলোর থালায়"[৮]। এখানে 'শেফালি' রোগশয্যার উচ্চারণ বলেই জ্ঞান করি। আসলে শিউলির আবির্ভাবেই শরতের আগমনী, শিউলির মধ্যেই শরতের আত্মপরিচয়। বাদল ধারা সারা, শ্রাবণের কমণ্ডলু নিঃশেষিত হবার পর শিউলির শুচি-শুভ্র মালাখানি গলদেশে ধারণ করে প্রকৃতির নাটমঞ্চে শরতের আনন্দিত আবির্ভাব।

"দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।"[৯]

যদিও রবীন্দ্রনাথ সব ঋতুরই কবি কিন্তু তাঁর মনের বনে প্রধান ঋতু বোধহয় তিন—বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত। নানা প্রসঙ্গে এই ত্রয়ীর একত্র উল্লেখ এই অনুমানের পরিপোষক। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা রাজাকে 'একরকম' নয়, তিনরকম দেখেছে; একটি নববর্ষার ছবি, অপরটি শরৎকালের এবং তৃতীয়টি বসন্তকালের। সুদর্শনার চোখে রাজার শরৎমূর্তিটি এই রকম—"শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালি বনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্‌কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীব, তোমার চোখের

দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তাহলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব।" লক্ষণীয় যে, রানীর দৃষ্টিস্নাত রাজা এবং রবির আলোকস্নাত শরৎ একাকার ও একরূপ। উভয়েই শুচি শুভ্র এবং শুভব্রত। দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয় উভয়েরই যাদুমন্ত্রে। শিউলি এই শরতেরই প্রাণের প্রতীক এবং মর্মের প্রদীপ। শিউলির শুভ্রতা শুধু শরৎকে প্রকাশ করে না আনন্দলোকের পবিত্র বার্তাও বহন করে। শান্তিনিকেতনে'র 'আশ্রম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরো একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত-বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না?"

শিউলি এবং শরৎ যদি অর্ধনারীশ্বর হয় কাশ তবে তার ললাটস্থিত চন্দ্রকলা। শিউলি শরতের নিত্য সঙ্গী, কাশ প্রিয় সঙ্গী। শরৎ প্রসঙ্গে কাশের কথা তাই কবিকণ্ঠে বারংবার সোচ্চার। ২রা অক্টোবর ১৯২৭ তারিখে অমিয়চন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে কবি বলেছেন—"নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েছ শান্তিনিকেতনের প্রফুল্ল কাশগুচ্ছ বীজিত শরৎ প্রকৃতির উপরে।"[১০] দেখা যাচ্ছে যে, শরৎ প্রসঙ্গে কাশের স্মৃতি সুদূর বিদেশেও কবিচিত্তে অম্লান ও অবিনশ্বর। "শিশু" কাব্যের 'মাঝি' কবিতায়—

> "দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
> দেখেছি একমনে
> চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
> সাদা কাশের বনে।"

বাস্তব দৃষ্টিজাত বলেই মনে হয়। কবির দৃষ্টি-নন্দিত কাশের লাবণ্যরেখার আল্পনা আছে 'রাজটিকা' গল্পের লাবণ্য-লেখার রূপ চিত্রণে—"লাবণ্য লেখা পশ্চিম প্রদেশের নবনীতা গম-সম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন-নদীকূলে-লালিতা অম্লান প্রফুল্ল কাশ বনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।" 'খেয়া' কাব্যের 'অনাবশ্যক' কবিতার পটভূমিকা "কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে।" পার্থিব প্রয়োজনের উর্ধ্বে অপার্থিব আনন্দের আয়োজনে নিবেদিত "কাশের বনে,

প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।" কবিতাটির মর্মকথা এবং কবির শরৎ-ভাবনার মূল সুরে এক আশ্চর্য মিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়।"[১১]

এই শোভা-স্থলে কাশ বনশ্রী সহাস্যে বিরাজমান—"আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন; শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে।"[১২] চোখে দেখা এই ছবিটি মননরসে জারিত হয়ে নশ্বর ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির ঊর্ধ্বে অবিনশ্বর প্রাণ প্রবাহের জয় গান ঘোষণা করেছে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে। কবি বলেছেন, "···এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশ বনের তলদেশে দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিষুপ্ত গ্রামগুলির বন প্রান্ত-ছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে, যখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চির ধৈর্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গেছে।"[১৩] 'বীথিকা'য় 'মাটিতে-আলোতে শরৎশ্রীর অপরূপ শোভা 'মঞ্জরিত কাশে'।

শরতের পুষ্প শিউলি ও কাশ, শরতের সম্পদ ধান। ধানের অপর নাম লক্ষ্মী। রবীন্দ্র ভাবনায় শরৎ ও লক্ষ্মী—শরৎলক্ষ্মী। পুরুষ বর্ষাকেও নারী হতে হয় এই কারণেই। নটরাজ যখন বললেন, "শুভ্র শান্তির মূর্তি ধয়ে এইবার আসুন শরৎ শ্রী···" তখন সবিস্ময়ে রাজার উক্তি "ও কি হলো নাটরাজ, সেই বাদল-লক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠণ"। (শেষ বর্ষণ) 'উৎসর্গের' একুশ সংখ্যক কবিতায় শারদ ধান্যের মায়াবী আলোক—

"শারদ ধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে···।"

'খেয়া' কাব্যের 'সব পেয়েছি'র দেশের ভৌগোলিক অবস্থানটুকু নির্দেশ করতে আমরা অক্ষম, কিন্তু কালটি যে সুনিশ্চিত ভাবেই শরৎ তার জন্য পঞ্জিকা দেখতে হয় না, প্রকৃতির দিকে তাকালেই চলে। সেখানে—

মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে

কিসের গন্ধ, কাহার বাঁশি
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে ;"

'পূরবী' কাব্যে 'মাটির ডাক' শোনেন কবি কচি ধানের আন্দোলনে –

"আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল – খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়
সেদিন আমার হত মনে
ওই সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি।"

জগতের আনন্দ-মঞ্চে কবির নিমন্ত্রণের কথা শরৎকালেই যেন বেশী করে মনে পড়েছে এবং সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। কবির একটি চিঠিতে স্বল্প কথায় শরতের শারীরী প্রতিমা "দিন সুন্দর, রাত্রি নির্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ।"[১৪] শরতের বাঁশীতে ছুটির সুর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই চিঠিতেই শারদোৎসব ঋতু নাট্যের অর্থ ব্যাখ্যা। সেখানেও ছুটির ঘণ্টা ধ্বনি।

আমরা রবির মায়ালোকে মধুর শরতের লিঙ্গ বর্ণ ও জাতি বিচারের দুঃসাহস করেছি। এবার আর একটু সাহস নিয়ে তার বয়স নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। বসন্ত তরুণ, বর্ষা প্রায় প্রৌঢ় শরৎ কিন্তু শিশু। বিভিন্ন প্রসঙ্গে শরৎ সূত্রে শিশুর চিত্র ও চরিত্রটিকে কবির রচনায় ফিরে ফিরে পাই। "শরৎ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "আমার কাছে আমাদের শরৎ-শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।...শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি, এই কান্না। সেই হাসি-কান্নার মধ্যে কার্য্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকা ভাবে আসে এবং যায় যে কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউএর উপরটাতে আলোছায়াভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখেনা"। শরৎ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবি লক্ষ্য

করেছেন "শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিত হয়ে শুয়ে কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল ঝিলমিল করে উঠচে।" (ভানুসিংহের পত্রাবলী, এগারো) 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় কচি ধানের শ্যামলতাকে কবি" কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য" বলে উল্লেখ করেছেন। কচি ধানের শ্যামলতা যে শরতের সুন্দর রূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে কথা পূর্বেই বলেছি। 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের দৃষ্টি-পথে ধৃত শরতের "সকাল বেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মতো নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে। দুই একটা সাদা মেঘ নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।" 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'-তে শিশুর নিদ্রাহারা চোখে নির্মেঘ শরৎ আকাশের আলো উপমার প্রদীপে প্রজ্বলিত।[১৫]

'লিপিকা'র 'আগমনী'-তে কবির শরৎদর্শন এইরূপ—

"কি দেখতে পেলে
শরৎ প্রভাতের শুকতারা
কেবল ঐটুকু ?
হাঁ ঐটুকু। আর দেখতে পেলে
শিউলি বনের শিউলি ফুল।
কেবল ঐটুকু ?
হাঁ ঐটুকু। আর দেখা লেজ দুলিয়ে ভোর
বেলাকার একটি দোয়েল পাখি।
আর কি ?
আর, একটি শিশু, সে খিলখিল করে
হাসতে-হাসতে
মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল
বাইরের আলোতে।"

'বীথিকা'র 'মাটিতে আলোতে' সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গেই কবির সোচ্চার ঘোষণা

"আর বার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেব শিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে।"

স্মরণীয় যে কাবুলিওয়ালা' গল্পে শরৎকালের প্রভাতে "একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর সরল হাস্য" পরিবেশের আশ্চর্য পরিপূরক এবং একটি পৃথক মাত্রার সংযোজক।

সুনীল আকাশে লঘুপক্ষ মেঘের সঞ্চরণ রবীন্দ্রনাথের শরৎ ভাবনার একটি বিশিষ্ট ভাব এবং তাঁর দৃষ্টিপথে ধৃত এবং লেখনী মুখে অঙ্কিত শরৎ চিত্রের একটি লক্ষণীয় চরিত্র লক্ষণ। শরতের দানরিক্ত মেঘের কথা 'কণিকা'র কণ্ঠে—

"জল হারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।"

'শারদোৎসবে' শুনি

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরির খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।"

গানটি বাউলের সুরে এবং সেকারণেই অসাধারণ তাৎপর্যমণ্ডিত! এই সুরে ঘর-ছাড়া নিরুদ্দেশে অকারণ অবারণ চলার ভাব আছে। স্মরণীয় যে, বর্ষা প্রসঙ্গেও কবি চলার কথা বলেছেন। তবে বর্ষার চলা এবং শরতের চলার মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্ষার চলা অভিসারের, শরতেব চলা অভিমানের। বর্ষার চলা অনুরাগের, শরতের চলা বৈরাগ্যের। 'মহুয়া'র 'লগ্ন' কবিতায় দেখি

"দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্ত বিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।"

'পূরবী' কাব্যের 'অস্থানে'—

"...ভরা শরতের দিনে
সূর্য ডোবার সময়,
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল।"

'সেঁজুতি' কাব্যের 'নিঃশেষ' কবিতায়

"শরৎ বেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারা বর্ষণ বেগ:"

স্বাভাবিক কারণেই 'খেয়া' কাব্যের কবি তাঁর তৎকালীন মানসিকতার যথার্থ

প্রতীক খুঁজে পেয়েছিলেন বায়ুর স্রোতে ভাসমান শরৎ শেষের মেঘের মধ্যে।

"আমি শরৎ-শেষের মেঘের মতো
তোমার গগন কোণে
সদাই ফিরি অকারণে।" (লীলা)

জীবনের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে 'প্রান্তিকে'র কবি বলেছেন,

"আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চির পথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।" (পাঁচ)

'লিপিকা'তে কবির হাতে আঁকা শরতের ছবিটা এই রকম…"বাদলের মেঘ কেটে গেল, কালো মেঘ হলো সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস সরোবরের পদ্মগন্ধে দিন রাত্রির দণ্ড প্রহর গুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে।"[১৫]

শরৎ এই ছুটির কাল, শরৎ প্রসঙ্গে কবিকণ্ঠে বারংবার ঘর ছাড়ার কথা, ছুটির কথা। প্রাচীনকালে এই সময়ে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন। মৃগয়ার কাল অতীত কিন্তু ছুটির বাসনা আজো বর্তমান। পূজার ছুটি আজ বঙ্গ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'শারদোৎসব' এই ছুটিরই উৎসব যদিও কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে। রবীন্দ্রনাথের অর্থে যেদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা ছুটি নিতে শিখবে সেদিন 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।' পুনশ্চ 'কাব্যের' ছুটির আয়োজন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শরৎ ভাবনার একটি স্থির চিত্র—

"কাছে এল পুজার ছুটি
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠেছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগেনা কাজে।"

অবশ্য এখানে এমন কথাও আছে যাতে "কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে" বেদনা ঘন মেঘের বুকে ঝলসে ওঠা বিদ্রূপের বিদ্যুৎ আমাদের বিব্রত ও বিমূঢ় করে। তবে সে কথাটি আপাতত আমরা ভুলে থাকতে চাই।

তাছাড়া ঐ ক্রুরতাটুকু শরতের নয়, মানুষের ; শরতের শান্ত পবিত্রদিনে এই ক্রুরতার মূঢ়তাটুকু আরো মর্মভেদি।

শরতের সোনা ঝরা আলোর প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমুখ। এই সোনার আলোর কথা কত বিভিন্ন প্রসঙ্গে কত বিচিত্র ভাবে বর্ণিত তার হিসেব নিতে গেলে একটি পৃথক প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। সংক্ষেপে বলছি।

আলোকের যে ঝর্ণা ধারায় অবগাহনের আকাঙ্ক্ষা কবিচিত্তে দুর্মর তার সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ শরতের আকাশে। কবির শরৎ ভাবনায় এই নির্মল প্রসন্ন মধুর আলোকের শিখাটি নিত্য প্রজ্জ্বলিত। একটি চিঠিতে[১৬] 'আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং মাঠে বনে পাগলা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে'র অবসানে শরতের পবিত্র প্রসন্ন পুলকিত আত্মপ্রকাশের আনন্দময় রেখা চিত্র—"শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝরে পড়চে, আকাশে তেমনি আজ আলোকের নির্মলের ধারা ঢেলে দিয়েছে। আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসি-মুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে।" দল ভাঙ্গা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলে সূর্যের আলোর সঙ্গে সন্ধি করেছে শরতের আকাশে।"[১৭] 'শ্যামলী'র 'উৎসর্গে' কবি দেখেছেন, "শরৎলক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী।" কাব্যে গানে পাঠক শরতের সোনালি কিরণের বারংবার সাক্ষাৎ পাবেন ; আমরা গদ্যের কঠিন ভূমিতে পড়ে থাকা এই আলোকের কিরণ রেখাটির কয়েকটা নমুনা তুলে ধরছি। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে "মেঘ মুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।" 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে "বর্ষার পরে এই শরতের নূতন ধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায় গলানো নির্মল সোনার মতো রং ধরিয়াছে।" শুধু তাই নয় কলিকাতার ইষ্টক জর্জর গলি ঘিঞ্জিতেও "এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।" "শারদ-রৌদ্র-রঞ্জিত-প্রভাত-বায়ু বাহিত লঘু মেঘ খণ্ডের উপমা 'প্রায়শ্চিত্তে' ; 'ভাই ফোঁটা'য় এই আলো মমতায় মেদুর ও মধুর "আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল।"

'চোখের বালি' উপন্যাসে দমদমের বাগানবাড়ীতে দুটি নারী ও দুটি পুরুষের চড়ুইভাতির দিনটি 'শরৎকালের প্রাতঃকাল' এবং অবশ্যই 'অতি মধুর।' "রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে।" 'গোরা' উপন্যাসে গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতার ললাট

"শরতের আকাশ খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ।" তবে গোরা নয়, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীকে রাজসাক্ষী মানতে হয়। কেননা—"শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্ এক অনাদি কালের মনের কথা।" অবশ্য এ বাবদে 'নৌকাডুবি'র রমেশকেও স্মরণ করতে হয়। তার ভালো-বাসার চোখে "শরতের আলোক" প্রাণ পেয়েছে, "আশ্বিনের দিন" "আকার ধারণ" করেছে। কবি স্বীকার করেছেন যে, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেইজন্য এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।" শরৎ কিরণে কবিসত্তা কতখানি আলোড়িত, পুলকিত এবং বিগলিত কাব্যে তার অজস্র পরিচয়, পত্রেও তার অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ। ১৫ই অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখের পত্রে কবি বলেছেন "আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজস্ব আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম।" কাজেই এর দুর্লভ সঙ্গ তিনি কোনো দিনই অবহেলা করেননি এবং তাঁর অন্তরাত্মা এর ছাড়া আর কারুর কাছ থেকেই সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্যের চরমতম ফল গ্রহণ করেনি।[১৮] সাধারণতঃ বর্ষা এবং বসন্তকেই আমরা কবির সুরের ভাণ্ডারী বলে জানি। কিন্তু এ বাবদে শরতের দাবীও কম নয়। 'ছেলেবেলা'র কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন "আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে—ঐবারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রৌদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরী করে যাচ্ছি।" এই সঙ্গে পঠনীয় ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে লেখা কবির পত্র "এই শৈবাল বিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জল-রাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুন্‌গুন্ করে গান করছি।" পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে ও ঠিক এই কথা "আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্র চকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুর লোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করছে না।"[১৯] শরতের শুধু তপনকিরণ নয়, চাঁদের হাসি ও কবির মন-প্রাণকে গভীর ভাবেই নাড়া দিয়েছে। শারদ পূর্ণিমাতে কবিচিত্তে যে জোয়ার জেগেছে ছিন্নপত্রে তারই উদ্বেল উৎকণ্ঠা "হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।"[২১]

কাব্যগানের কথা বলব না বলেই কথা দিয়েছিলাম কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখের গানটি শোনার জন্য কথার খেলাপ করতে হলো।

"ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙ্গে বাহির কে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।"[২২]

এমন দিনে "কিসের ঘরকন্না এবং আত্মীয়স্বজন।"[২৩] এদিন তো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ারই দিন। আশা করি 'ডাকঘর' নাটকের অমলের মনের কথাটি এবার সহজে বোঝা যাবে। শরৎকালের রৌদ্র ও বায়ু দুই-ই বালকের পক্ষে বিষবৎ—এই কবিরাজী বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করেই সেখানে ঠাকুরদার পুলকিত প্রবেশ "শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো।"

বর্ষা বসন্তের মতো শরৎ প্রসঙ্গেও আকাশ পৃথিবীর মিলন দৃশ্য রচিত হয়েছে কবির শরৎ ভাবনার মানচিত্রে যদিও শারদ মিলনের সুর আলাদা, তাল্ পৃথক।

৩রা ভাদ্র ১২৯৯ সালে লেখা পত্রে শরতের আকাশ-ঝরা সোনার আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে—"স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়" লক্ষ্য করেছেন কবি। 'বীথিকা'য় কবি দেখেছেন "দ্যুলোকে-ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়।"[২৪]

বসন্ত বা বর্ষা মিলনের রস শৃঙ্গার, শরৎ মিলনে বাৎসল্য রসেরই লক্ষণীয় প্রাচুর্য।

প্রশ্ন জাগে শরৎকে কেন্দ্র করে কবিচিত্তে রোমান্টিক ভাব ভাবনা কি আদৌ রূপ পরিগ্রহ করেনি? করেছে। সাক্ষী যোগাযোগের কুমু। অপর সাক্ষী 'গোরা'। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতার ললাট "শরতের আকাশ খণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ।" গোরার নিজের কাছে নিজের ধরা পড়ার দিনটিতেও শরতের শিলমোহর। বিনয়ের কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তির দিনটিতে "ভাদ্রমাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায়

আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাতলা সাদা মেঘ ক্ষণিক ঘোরের মতো মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপসা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে।" গোরা এতদিন পর্যন্ত হৃদয়ের যে সত্যকে কবিত্বের আবর্জনা বলে অবহেলা করেছে আজ আর তাকে অস্বীকার করতে পারলো না। "শুধু তাহাই নহে ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ-নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।" আশ্বিনের আকাশবাণী প্রিয়-ইঙ্গিতের উপমালোকে রোম্যান্টিকতায় অভিষিক্ত 'বীথিকা'য় –

"আজি আশ্বিনে প্রিয় ইঙ্গিত সম
নেমে আসে বাণী করুণ কিরণ ঢালা
চির জীবনের হারানো বন্ধু মম
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথের মানস সুন্দরী অর্ধেক রমণী, অর্ধেক প্রকৃতি। এই মানস সুন্দরীর সঙ্গে কবির নিগূঢ় সম্পর্কের অন্যতম সাক্ষী শরতের তরুণ প্রভাত।

"আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্তি, শুভ্র বস্ত্র পরি
ঊষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি।"[২৬]

লক্ষণীয় যে, চিত্রটি বাংলারই অবিস্মরণীয় শারদ-প্রভাত। শারদ-প্রকৃতি এবং কবির মানস সুন্দরী একাকার ও একরূপ হয়ে পড়েন যখন কবি বলেন,

"শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক...।"[২৭]

শরৎ-প্রকৃতির মধ্যে মন উদাস করার ভাবটুকুও লক্ষণীয় এবং এটি কবির শরৎ-

ভাবনার প্রিয় অনুষঙ্গ। তবে এটি পৃথক প্রসঙ্গ, স্থানাভাবে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। শরতের রোম্যান্টিক চিত্র চরিত্রের কথা বলি। এ বাবদে আমাদের শেষ সাক্ষী "চিত্রা" কাব্যের সেই সবার শেষের মানুষটি রাণীর কাছে যার 'আবেদন'—

যে অরণ্য পথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি ॥"

শুধু কি তাই। মানুষটির আরো কথা

"শেফালীর বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রাণী,
বসন বাসন্তী রঙে।"

শরৎ প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর শারদীয় পূজার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনায় বারংবার এসেছে।

তবে প্রসঙ্গটি ব্যাপক এবং গভীর। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে শরতের সুর কেটেছে, তাল ভঙ্গও হয়েছে। তবে তার কারণ প্রকৃতি নয়, মানুষ। প্রসঙ্গটিকে পৃথক প্রবন্ধের জন্য মুলতুবি রেখে এখানে শুধু মানব শিশুর কণ্ঠে দেব শিশুর আগমনী সঙ্গীতটুকু শুনে নিতে চাই। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের শিশুর সেই স্মরণীয় 'মনে পড়া'—

"কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।"

আর সেই সঙ্গে বলে রাখি যে "পূজায় স্তব্ধ শরৎ প্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস" রবীন্দ্রনাথ বুক ভরেই নিয়েছেন এবং শতকণ্ঠে পুলকিত প্রশস্তির অর্ঘ সাজিয়েছেন। কিন্তু শরতের সোনা ঝরা আলোর বুকে শুধু কি অসহায় ছাগশিশুর আর্ত ক্রন্দন বা দরিদ্র মানবশিশুর দুচোখ ভরা করুণ আর্তিই একমাত্র অন্ধকার? আর কোথাও কি কোনো কালো নেই? 'চোখের বালি'র আশা অন্ততঃ তা বলবে না। কারণ এই শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেই

"মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে" মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর প্রথম সাক্ষাৎ। তবে পাঠক জানেন, তার জন্য দায়ী শরৎ নয়, স্বয়ং আশা। কেউ যদি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে তবে তার জন্য কুড়ুলকে দায়ী করা অন্যায়। উপমাটা অবশ্য ঠিক হলো না। কারণ শরৎ কদাচ কুড়ুল নয়।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-ভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলেই কথা শেষ করি। পৃথিবীর বুকে ঋতুমাল্যের যে আবর্তন তা মূলতঃ সেই অদৃশ্য নট-রাজেরই বিভিন্ন নৃত্যরূপ, অথবা বলতে পারি পৃথক তালে একই নাচের নানা রূপ। এই ভাবেই শীতের জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দিয়ে বসন্তের আনন্দিত আবির্ভাব, বাদল লক্ষ্মীর পোষাক ছেড়ে শরৎলক্ষ্মীর শুভাগমন।

দুঃখ এই, শারদ-নৃত্যের আঙ্গিনায় নটরাজের আসার চেয়ে যাবার ত্বরাই বেশী। কবির নটরাজ তাই নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেন, "শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-মর্তের মিলন পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।"[২৮] বিরহের মধ্যে দিয়ে মিলন পথ খোলার সাধনা কি শুধু শরতের? রবীন্দ্রকাব্য সাধনার মূল সুরটিও তো তাই। শরতের সোনালি কিরণ এবং রবির কাব্য-কিরণে আশ্চর্য ঐক্যতান। শরৎ প্রকৃতিকে রবীন্দ্রকাব্য সাধনা ও জীবন সাধনার প্রস্থানভূমি বললে খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না বলেই আশা করি।

শৈবলিনী থেকে আরতি

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।"

এ প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তার বহু পূর্বেই এই প্রশ্ন পুরুষ-শাসিত সমাজের লক্ষ লক্ষ নারীমনে নীরবে মাথা খুঁড়েছে। সামাজিক নাগপাশ বন্ধন থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে মুক্ত করার স্বপ্ন এবং সাধ নারীমনকে আকুল ও ব্যাকুল করেছে। সাহিত্যে সেই ব্যাকুলতার প্রথম উল্লেখযোগ্য আত্মপ্রকাশ বঙ্কিম সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথা সাহিত্যের শুধু নন, বাংলার নারীজাগরণের প্রথম স্মরণীয় রূপকার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর পথ খোঁজার কথা আছে, পথপ্রাপ্তির কথা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র পথের সন্ধান দিতে পারেননি। ঘর ছাড়াদের তিনি শেষপর্যন্ত পুরাণ-পথেই ফিরে আসতে বাধ্য করেছেন। প্রাপ্তি নয়, প্রায়শ্চিত্তই হয়েছে তাদের বিধিলিপি। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এছাড়া করারও কিছু ছিল না। সেটা রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণের অর্ধশতাব্দীরও বেশী পূর্বের ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮০ সালে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

চন্দ্রশেখরের 'শৈবলিনী'কে আলোচনার অগ্রভাগে উপস্থাপিত করার কারণ সে কুন্দের মতো অপাপবিদ্ধা অথবা রোহিণীর মতো কামনাবিহ্বল বিধবা নয়, সে বিবাহিতা, একটি সামাজিক লক্ষণরেখার নির্দিষ্ট সীমারেখায় তার অবস্থান।

এই সীমারেখাটিকে লঙ্ঘন করার সাহস বা দুঃসাহস সর্বপ্রথম তার মধ্যেই লক্ষ্য করি। যে দেশের বিবাহিতা স্ত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর কদর্য কামনা পূর্ণ করার জন্য তাকে মাথায় করে নিয়ে যেত বারবণিতার কাছে, তথাকথিত সতীত্বের সেই ঢক্কানিনাদিত দেশে শৈবলিনী অবশ্যই 'পাপীয়সী' এবং এরজন্য তাকে ভালোরকম প্রায়শ্চিত্তই করতে হয়েছে—মায় জীবন্ত নরকদর্শন পর্যন্ত। এবং এতসব করার পরেও সমাজস্বীকৃত স্বামীসৌভাগ্য সে ফিরে পেয়েছে কিনা, সেকথা অনুমানের পর্যায়েই থেকে গেছে।

শৈবলিনীর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল তিনি যে শারীরিক—মানসিক কোনো দিক দিয়েই শৈবালিনীর উপযুক্ত ছিলেন না সে কথা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। চন্দ্রশেখর স্বগত উচ্চারণে বলেছেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অযথা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষত, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখ-পরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।..."[১]

চন্দ্রশেখরের এই স্বগত ভাষণ বিনয় বা মহানুভবতা নয়, একান্তই সত্য ভাষণ। দারপরিগ্রহ জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্নস্বরূপ বলেই তিনি মনে করতেন। মাতৃবিয়োগের পর শৈবলিনীকে তিনি যে বিয়ে করেছিলেন তার কারণ— "প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।"[২]

অর্থাৎ চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিয়ে করেছিলেন, আধুনিকাদের পরিভাষায়

যাকে বলে এক বিনা-মাইনের বিশ্বস্ত চাকরাণী পাবার লোভে। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বয়সের পার্থক্যটুকুও স্মরণীয়। "শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা, আর চন্দ্রশেখর বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করেছেন। একালের বিচারে এ বিবাহ আইনত অসিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের ঘর ছেড়েছে। অবশ্যই বাল্য-প্রণয়ী স্বপুরুষ প্রতাপের কথা মনে রেখেই। "নইলে লরেন্স ফষ্টার আমার কে!" – শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

শৈবলিনী সামাজিক লক্ষণরেখা অতিক্রম করে স্বাধীন প্রণয়ের পথে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, তার অসমবয়সী বিবাহিত স্বামী যেমন তাকে আপন করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করেননি, তার সমবয়স্ক বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপও তাকে গ্রহণ করেনি। একজনের মন চাপা পড়েছিল পুথির বল্মীক-স্তূপে, অপরের মন বন্দী ছিল নীতির দুর্ভেদ্য দুর্গে। শৈবলিনীর যদি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে থাকে তবে তা ঘটনা-ধারারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এরজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া বৃথা। বঙ্কিমচন্দ্রকে ধন্যবাদ যে, তিনি আদর-সোহাগহীন সামাজিক বিধিনিষেধের দুর্ভেদ্য দুর্গে চির বন্দিনী নারীর দুচোখে মুক্তির স্বপ্নাঞ্জন মাখিয়ে দিলেন। সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। বহুবিবাহ, অসমবিবাহ তখনো সমাজজীবনে দূষণীয় ছিল না। বিবাহিতা স্ত্রী এবং ক্রীতদাসীর মধ্যে সেদিন খুব একটা পার্থক্য ছিল না। পুরুষশাসিত এবং ত্রাসিত সমাজে শৈবলিনীর স্বপ্ন সেদিন ঘোরতর অন্যায় ও অপরাধ বলেই বিবেচিত হত। তবু শৈবলিনী অমর হয়ে রইল তার সেই সোনালি স্বপ্নটুকুর জন্য, সামাজিক লঙ্ঘনরেখা অতিক্রমণের তার সেই দুর্জয় এবং অসমসাহসিক মনোবলটুকুর জন্য। এই শৈবলিনীরই নিকট আত্মীয়া পরবর্তীকালের নষ্টনীড়ের চারু, ঘরে-বাইরের বিমলা, গৃহদাহের অচলা এবং প্রেম ও প্রয়োজনের আরতি। অঙ্কটা সর্বত্রই অভিন্ন, উত্তরটা সময়ের ধারাপাতে ভিন্ন ভিন্ন। শৈবলিনী স্বপ্ন, আরতি সিদ্ধি। শৈবলিনীর সময়টা ১২৮০ সাল, আরতির ১৩৫১ সাল। সাতটি দশকের মধ্যেই একটি অসম্ভব স্বপ্ন অনায়াস সম্ভব হয়েছে, একথা বলার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর ছিলেন আদর্শবাদী। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)-র নিখিলেশও আদর্শবাদী—অবশ্যই কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে।

সমাজ দত্ত বিবাহিতা বধূকে নিয়ে তার মন ভরেনি, সে চেয়েছিল এক স্বয়ংবরাকে। বিমলাকে সে টেনে এনেছিল বৃহত্তর জগতের মধ্যে। সেই সূত্রেই সন্দীপ এসেছে বিমলার জীবনে। নিখিলেশের চরিত্রে যে পৌরুষের নিতান্ত অভাব সন্দীপ সেই পৌরুষের জীবন্ত প্রতীক। সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, লজ্জা নামক বস্তুটি তার নেই। যা দরকার তা প্রাণ খুলে চাইতে তার লজ্জা, দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। নারী মনস্তত্ত্বে তার অসামান্য অধিকার। সে জানে কিভাবে নারীর মন জয় করতে হয়, কখন মনের কোন তারটিকে আলগোছে স্পর্শ করে কাঙ্ক্ষিত স্বরমূর্ছনার সৃষ্টি করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিমলা সন্দীপের প্রতি সতৃষ্ণ আকর্ষণ অনুভব করেছে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির প্রদীপে উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত হবার যে কামনা নারী মনস্তত্ত্বে গূঢ় ও গুহায়িত তারই প্রবল বিস্ফোরণ ঘটল বিমলার জীবনে সন্দীপের সান্নিধ্যে এসে। তার নিজের কথায়, "সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।" গৃহকোণের শান্ত দীপশিখাটি বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসেই দাবানলে পরিণত হতে চাইল। বিমলার "মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।" গৃহদাহ অবশ্য হয়নি তবে ঘরে আগুনের আঁচ পাওয়া গেল। এই সর্বনাশা খেলা কতদূর গড়াত তা জানিনা তবে তার পূর্বেই সন্দীপ সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গ ঘটল। একটি নারীকে কেন্দ্র করে দুই পুরুষের প্রতিযোগিতায় সন্দীপ হেরে গেল না কি তাকে হারিয়ে দেওয়া হল এ প্রশ্নটা এখানে তুলছি না। শুধু বলতে চাইছি যে, শৈবলিনীর মতো বিমলাও শেষপর্যন্ত স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হয়ে তার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং নিখিলেশও বিমলাকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে নতুন সংসার পাতার শুভ সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই শুভ দৃশ্যটি দেখার সৌভাগ্যে বাদ সেধেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গায় গুরুতর আহত নিখিলেশের জন্য এক বুক আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই শেষ হয়েছে বিমলার আত্মকথা, উপন্যাসটিও হয়েছে পরিসমাপ্ত। কোলকাতার নতুন বাসায় এই

দম্পতি তাদের পুরানো প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি না, ঔপন্যাসিক সেকথা জানার সুযোগ না দিলেও বিমলার মনে কিন্তু সে বাবদে শঙ্কা ও সন্দেহের অন্ত ছিল না। স্বামীর আশীর্বাদ পাবার পরেও সে তার আত্ম-কথায় বলেছে, "কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কতদিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?"

শৈবলিনীর সঙ্গে বিমলার আর একটি বড়ো মিল এই যে, উভয়ের দৈহিক সতীত্ব অক্ষুণ্ণ ও অমলিন ছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' (১৩২৩-২৬ সাল) উপন্যাসের অচলা সেটুকুও হারিয়েছিল সামাজিক লক্ষণরেখাকে অতিক্রম করতে গিয়ে। তবে স্বামীভাগ্যে সে সকলের সমান। চন্দ্রশেখর, নিখিলেশ এবং মহিম একই ছাঁচে ঢালা। তিনজনই আদর্শবাদী এবং অন্তর্মুখী। বিমলার জীবনে সন্দীপের আগমন স্বামীর একটি বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে, অচলার জীবনে সুরেশের আগমন স্বামীর সস্নেহ প্রশ্রয়ে। সন্দীপ যেমন নিখিলেশের বিপরীত, সুরেশও তেমনি মহিমের বিপরীত চরিত্র। এই পর্যন্ত ছকটা মোটামুটি ঠিক। কিন্তু অমিলটাও প্রকট। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর নির্বাচিত স্বামী নন, নিখিলেশও নয় বিমলার নির্বাচিত স্বামী। শৈবলিনীর স্বামী যেমন প্রতাপ নয়, বিমলার স্বামীও তেমনি স্বপ্নের রাজপুত্র নয়। বিমলা স্বীকারও করেছে যে, "ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল।...স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না।" রবীন্দ্রনাথের আর এক নায়িকাও এই মিল খুঁজে না পেয়ে দুঃখ পেয়েছে। সে যোগাযোগের কুমু। তবে আমাদের আলোচনায় তার প্রসঙ্গ অবান্তর। আমরা শৈবলিনীর অনুজাদের আলোচনায় উৎসাহী এবং সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের অচলার প্রসঙ্গ। অচলার সঙ্গে শৈবলিনী বা বিমলার প্রধান পার্থক্য এই যে, তাকে বিয়ে দেওয়া হয়নি, সে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পূর্বে মহিম এবং সুরেশ উভয়ের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল এবং স্বেচ্ছা নির্বাচনে সে মহিমকেই বরণ করে নিয়েছিল। লক্ষণীয় যে, মহিম আদর্শবাদী, স্থিতধী

চরিত্র। অপরদিকে সুরেশ প্রাণচাঞ্চল্যে সন্দীপের জ্ঞাতিভ্রাতা। দুটি পুরুষকে নিয়ে দোটানার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল অচলার জীবনে। রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর উক্তি একটু বদলে নিয়ে বলা যায় যে,

তার অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন।"

বিবাহিত স্বামী মহিমের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সে সুরেশের হাত ধরে। এর জন্য মহিম বা সুরেশের দায়িত্ব কতখানি—সে প্রশ্নে যাবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার যে, সুরেশের সঙ্গে সে শুধু ঘর ছাড়েনি তাকে সে আত্মদানও করেছে—যদিও তাতে সে আনন্দের পরিবর্তে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করেছে। শৈবলিনী এবং বিমলার ক্ষেত্রে যে আশ্রয়ভূমিটি অক্ষত ও অবিচল ছিল তা হল তাদের সতীত্ব। অচলা সেটুকুও হারিয়েছে। তবে পরিণাম পূর্বজাদের হুবহু অনুরূপ। শেষপর্যন্ত স্বামীর পদপ্রান্তেই সে আভূমি-প্রণতা। পূর্বজাদের মতো তার ভবিষ্যৎও সংশয়াকুল। চন্দ্রশেখর কর্তৃক শৈবলিনীকে আশ্বাস দান এবং মহিম কর্তৃক অচলাকে আশ্রয়দান পাকেচক্রে একই ব্যাপার। এগুলি পুরুষের বিশেষতঃ আদর্শবাদী পুরুষের স্বাভাবিক মহানুভবতা, প্রণয় নয়।

বিবাহিতা উপরোক্ত তিন নায়িকা সামাজিক বিধি-বিধানের বাইরে গিয়ে স্বাধীন প্রণয়কে সার্থক করে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই বিধি-বিধানের নিরাপদ দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছিল। ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তার দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত সমাজ সত্তাটিই জয়লাভ করেছিল। তা না হলে অন্ততঃ অচলার মতো মেয়ের সুরেশের চুম্বনে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করার কথা নয়।

শৈবলিনী ঘরানার পরবর্তী প্রজন্মে পাচ্ছি আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৩৫১) উপন্যাসের আরতিকে। স্মরণীয় যে, 'প্রেম ও প্রয়োজন' আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প এই লেখিকার প্রথম উপন্যাসের নায়িকার পতিভাগ্য অনেকটা শৈবলিনীরই মতো। তার পতিদেবতা গুরুর নির্দেশে সাধনভজনে নিবেদিত প্রাণ। ক্রমে সে স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করার কথা ভাবতেও ভয় পায়। তার কাছে এ সব সাধন পথের মূর্তিমান বিঘ্ন এবং তাই সন্তর্পণে পরিহরণীয়। আরতি যে তার পুত্রের জননী, সে যে এক রক্তমাংসের মানুষ, এ সব কথা ভাবার বা অনুভব

করার অবকাশ থাকে না আরতির স্বামী অখিলেশের। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অবহেলা ও অনাদর সহ্য করতে না পেরে একদিন আরতি স্পষ্টভাষায় তার গৃহত্যাগের সংকল্প জানিয়ে দেয় অখিলেশকে। সেই সঙ্গে জানতে চায় ছেলের ভার নিতে তার স্বামী রাজি আছে কি না! অখিলেশ পরম বিস্ময়ে বলে—"খোকার?

—হ্যাঁ খোকার। দৃঢ়স্বরে উত্তর করে আরতি—পিসীমার যা সম্বল আছে একলার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু খোকার জন্যে হয়তো বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের সম্বল খোয়াতে হবে। তাই জানতে চাইছি ওর ভার তুমি রাখতে চাও কিনা!

—শুধু খোকা? আর তুমি? মুখ ফসকাইয়া বাহির হইয়া যায় অখিলেশের।

—আমি? হঠাৎ হাসিয়া উঠে আরতি, দীর্ঘদিন আগে গভীর রাত্রে স্বামীর আদরে পরিহাসে যেমন করিয়া হাসিয়া উঠিত, যে অবাধ হাসির জন্য পিসীমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত অখিলেশ।

কতদিন সে হাসি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে আরতির।

হাসি থামাইয়া স্থির গলায় সে বলে—আমার জন্যে নাই বা ভাবলে? রূপ আর বয়স মেয়েমানুষের ওজন হাল্কা করে দেয়, সকলের কাছে ভার লাগে না। এই টুকুই শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

বিস্মিত হতভম্ব অখিলেশ শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে জানতে চায় কার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আরতি। আরতির স্পষ্ট উত্তর "সে কথা বলতে বাধ্য নই আমি।"

শৈবলিনী, বিমলা বা অচলার সঙ্গে আরতির অবস্থাগত পার্থক্যটুকুও স্মরণ রাখতে হয়। আরতি শুধু সীমন্তিনী নয়, সে সন্তানবতীও। তার পূর্বজাদের এই সমস্যাটি ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরতির সামাজিক বিধি নিষেধের গণ্ডীটিকে অতিক্রম করার দুর্জয় সঙ্কল্পটুকু লক্ষণীয়। অবশ্য দৈবের কৃপায় বা লেখিকার করুণায় যথাসময়ে ছেলেটি মারা পড়াতে এই সমস্যাটি নিয়ে আরতিকে বেগ পেতে হয়নি। সে তার দেবরের বন্ধু প্রবীরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে ঝাড়া হাত পা নিয়ে। আর একটি তথ্যও এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়। প্রবীরের সঙ্গে ঘর ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সম্পর্কটা ছিল প্রেমের নয়, স্নেহের। শেষ পর্যন্ত স্নেহাস্পদই হল প্রেমাস্পদ প্রায় পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এবং বেশ কিছুটা অতর্কিতভাবেই। অপমানিত নারীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য হাতের

কাছে যে অবলম্বনটি পেল আরতি তাকেই আঁকড়ে ধরল। আরতির সৌভাগ্য যে, সেই অবলম্বনটি অশক্ত, অক্ষম বা অনিচ্ছুক ছিল না। এই সৌভাগ্য শৈবলিনী বা বিমলার ছিল না। প্রতাপ প্রবীরের মতো অসম সাহসী হলে বা সন্দীপ সচ্চরিত্র সুপুরুষ ও নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হলে কি হত, তা আজ ভেবে লাভ নেই। সে কথা তাদের স্রষ্টারাও ভাবতে পারেন নি। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সে ভাবনা ভয়াবহ ছিল। তারপর নদীতে অনক জল গড়িয়েছে। সমাজের বজ্রমুষ্টি ক্রমেই শিথিল হয়েছে। 'শয্যাকক্ষের একনিষ্ঠাতেই' যে নারীর সতীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা এবং নির্ভুল প্রমাণ, নারী-পুরুষের আজন্ম লালিত এই বোধ ও বিশ্বাস বিচলিত হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রবীর অন্যের বধূ ও মাতাকে গৃহলক্ষ্মী করার বাসনাও অকম্পিত কণ্ঠে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছে।

আরতিকে সঙ্গে নিয়ে প্রবীর জামালপুরে এসে জানতে পারল যে, সেখানে আরতির চেনাজানা কেউ নেই। আরতি কোনো লক্ষ্য নিয়ে ঘর ছাড়ে নি, ঘর ছাড়াই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রবীর আরতিকে বলে, "আচ্ছা জামালপুর ছেড়ে দিন, ভালো করে ভেবে বলুন তো আর কোথার যেতে চান" – অর্থাৎ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করবে এমন কেউ আছে কিনা!

"ঈষৎ হাসির ছাপ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া ওঠে আরতির – স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়েকে কেউ আদর করে নেয় না। ভাই, নিজের বাপ-মাও না। তাড়িয়ে দিতে যদি নিতান্ত না পারে, লাঞ্ছনার সঙ্গে নেয়।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আরতির নত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর স্বরে প্রবীর বলিল – কেউ যদি আদরের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতে চায় – তাকে সে অধিকার দিতে পার না কি আরতি? নাম ধরলাম বলে রাগ কোরো না, অসহায় দেখে অপমান করছি মনে করে ভুল বুঝো না – বড্ড ছোট, ভারী ছেলেমানুষ মনে হয় তোমাকে, তাই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা করে।"

প্রবীরের এই কথাতেই আরতির ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট ও নিরুপম হয়ে উঠল, প্রাচীন মূল্যবোধের ভগ্ন প্রাচীরে মর্যাদার মধুকর ডানা মেলে বসল। প্রবীরের হাত ধরে আরতি এক সুখী গৃহকোণের অধিকারিণী হল। লেখিকা তাদের পরবর্তীকালের সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবনের সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন বড়গিন্নী অর্থাৎ কৃষ্ণবালার মুখর রসনার শ্লেষসিক্ত সরব উচ্চারণে – "শুনতে পাই এলাহাবাদ না কোথায় আছে। ছোঁড়া তো মায়ের ত্যাজ্যপুত্তুর, খেতে দেবার মুরোদ নেই—নিজে স্কুল মাষ্টারী করে, ছুঁড়িকেও মেয়ে ইস্কুলে গানের

মাষ্টারী করে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়। অমন পিন্নিতের কাঁথায় আগুন। শুনতে পাই একটা মেয়ে না ছেলে কি হয়েছে! ছি ছি ছি— অমন সোনার পুতুল ছেলে হারিয়ে—।"

আশাপূর্ণা দেবী শুধু যে একালের শৈবলিনীদেরই দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির অক্ষয় অধিকার দান করেছেন তাই নয়, একালের চন্দ্রশেখরদের ভাগ্যেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। অখিলেশ শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কৃষ্ণবালা তার সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন, "গলায় দড়ি আর দেবে না? বেম্মচারীই হোক আর নাগা ফকিরই হোক—ব্যাটাছেলে তো? বিয়ে করা পরিবার নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে পরপুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে গেল, কোন ঘেন্নায় মুখ দেখাবে পাঁচজনকে।" লেখিকার সর্বশেষ সংযোজন এবং আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে মূল্যবান সমর্থন—"বিষদন্তহীন কেউটের মত নিস্তেজ কৃষ্ণবালাকে সমীহ করিবার আবশ্যকতা কেহ বোধ করে না। আলোচনার স্রোত যথেচ্ছ বহিতে থাকে।"

পূর্বজাদের ক্ষেত্রে মূল আশ্রয়টি—অর্থাৎ বিবাহিত স্বামীগৃহটি শেষ পর্যন্ত চিরদিনের নিরুপম ও নিরাপদ আশ্রম বলে বিবেচিত হয়েছে। গৃহদাহের মৃণাল মহিমকে বলেছে, "আশ্রমই বল আর আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এ খবর সেজদিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সেও তোমারই দেওয়া হবে।" মৃণাল জানলে দুঃখ পাবে যে, তার এই উত্তর আজকের দিনে পাশ-মার্কও পাবে না। আরতিদের কাল এবং কপাল ফিরেছে। সেই বিধাতা নির্দিষ্ট জন্মজন্মান্তর-সুনির্দিষ্ট, সমাজ-অনুমোদিত অসংখ্য স্নেহসম্পর্কের ঝুরিনামা স্বামীগৃহটিই আজ সীমন্তিনীদের একমাত্র ঠিকানা নয়। এদের পছন্দসই আশ্রয় বা আশ্রম অনুসন্ধানের পথে সমাজের রক্তচক্ষু আজ আর কোনো বাধা নয়। কৃষ্ণবালার একক কণ্ঠস্বর মেহের আলির নিষ্ফল চীৎকার মাত্র। লেখিকা সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোয়াক্কা করা দূরের কথা, তাতে কর্ণপাত করারও কেউ নেই।

শৈবলিনী ওর্ফে আরতিরা আর ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা যাচ্ঞা করে নীরবে চোখের জল ফেলবে না, ক্লান্ত-ধৈর্য-প্রত্যাশার পূর্ণতার জন্য প্রতীক্ষাও করবে না। তারা কোথায় গিয়ে থামবে তাও আমরা জানি না। সেটা ভালো না মন্দ সে বিচারের অধিকার এবং অবকাশও আমাদের নেই। আমরা কুরুক্ষেত্রের সারথি নই, সঞ্জয় মাত্র।

বাংলা ও হিন্দী নাটকে রামকথা ও কৃষ্ণকথা

পৃথিবীর চারটি মহাকাব্যের মধ্যে দুটি ভারতবর্ষের। রামায়ণ ও মহাভারত গঙ্গা-যমুনার এই যুক্ত বেণীতেই ভারতবর্ষের সাধনা ও সংস্কৃতির চিরন্তন ভাবসম্পদ অমর অক্ষরে গাঁথা। ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় এই দুটি মহাকাব্যের প্রভাব সুগভীর ও সুপ্রচুর। নব্যভারতীয় আর্যভাষার কবিরা সেই মূল উৎস থেকে উপাদান ও উৎসাহ নিয়ে নিজ নিজ ভাষায় এই দুই মহাকাব্যকে আপন করে নিয়েছেন নিজ নিজ মাটি ও মনের স্বাদগন্ধ মিশিয়ে। হিন্দীক্ষেত্রে তুলসীদাসের রামচরিতমানস এবং বাংলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ সেই মূল গঙ্গোত্রীরই গঙ্গা ও ভাগীরথী। হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের পৌরাণিক যাত্রাপালা এবং নাটকগুলি স্বাভাবিক কারণেই কাহিনীর আঁচল পেতেছে এই দুটি মহাকাব্যের দ্বারপ্রান্তে। অবশ্য স্বীকার্য যে, খুব কমক্ষেত্রেই এই আঁচলটি মূল গঙ্গোত্রী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, প্রায়ক্ষেত্রেই, এটি সিক্ত হয়েছে সন্নিকটে অবস্থিত গঙ্গা ও ভাগীরথীর স্নিগ্ধ স্রোতধারায়। হিন্দী এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাস বস্তুতপক্ষে রামায়ণ মহাভারতেরই নব আরতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে, অভিনব ভারতী। শেষোক্ত বিশেষণটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ক্ষেত্রবিশেষে মহাকাব্যোক্ত কাহিনী যুগের রুচি ও জীবননীতির প্রয়োজনে অংশত বা সম্পূর্ণতঃ পরিমার্জিত হয়ে নতুন রসরূপ ও নবীন অর্থব্যঞ্জনা লাভ করেছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য যেমন রামায়ণাশ্রিত হয়েও আদি ও অকৃত্রিম রামকথা নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' ও তেমনি পুরাণের বিশ্বস্ত দৃশ্যরূপ নয়। ধ্রুপদী সাহিত্য কালজয়ী। কালের প্রবাহে তা লুপ্ত হয় না, নবরূপ প্রাপ্ত হয়। অনাগত যুগের পটভূমিকাতেও তা অন্তার্থে অনন্ত হয়। তার কথা বদলালেও কাঠামো পালটায় না।

রামায়ণের নায়ক রাম, মহাভারতের সর্বাধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দী পৌরাণিক নাটকে রাম দেখা দিয়েছেন ধীরোদাত্ত নায়করূপে, কৃষ্ণ ধীরললিত নায়করূপে। বাংলা পৌরাণিক নাটকেও মোটামুটি তাই। অবশ্য এই আলঙ্কারিক বিচার যে

আসলে অতি সরলীকরণ সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। বাংলাদেশের কোমলমাটি ধীরোদাত্ত নায়কের পদচারণার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। মানসিকতার দিক দিয়েও 'অসিধারী' এখানে সম্ভ্রমের পাত্র হলেও 'বংশীধারী'ই কিন্তু আপনজন। এই প্রসঙ্গে পাঠককে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রামায়ণে আর যাইহোক বংশীধারীর কোনো ভূমিকা ছিলনা কিন্তু মুহূর্তের জন্যে হলেও কৃত্তিবাস অসিধারী রামচন্দ্রকে বংশীধারী রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন, অবশ্য গড়ুরের অনুরোধের দোহাই দিয়ে। কৌতূহলী পাঠক নাগপাশ বন্ধনমুক্তির কাহিনীটা পড়ে দেখতে পারেন।

কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রেও হিন্দী ও বাংলা নাটক যে সর্বাংশে এক নয় তার কারণটিও আছে বাংলার ভূগোলে এবং ইতিহাসে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব, সেইসূত্রে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের প্রেরণা এবং কৃষ্ণকথা সম্পর্কিত লৌকিক ঐতিহ্য ইত্যাদি নানা কারণে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণকাহিনী হিন্দী রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণকাহিনীর অবিকল অনুরূপ নয়। তদুপরি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো কাশীরামদাসের মহাভারত ও বাংলাদেশে সমান জনপ্রিয়। স্বাভাবিক কারণেই বাংলা পৌরাণিক নাটকের কৃষ্ণকথায় কাহিনীর উৎস যদি বা মহাভারত, সেই কাহিনীর নায়কের মুখমণ্ডলে কিন্তু বাংলার নিজস্ব রসরুচি, ধর্মবোধ ও জীবনবোধেরই অবাধ আল্পনা এবং নির্বাধ কারুকার্য।

হিন্দী এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের রূপ-রস-রীতিতে যত পার্থক্যই থাক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে, উভয়ের কণ্ঠেই কিন্তু রামকথা ও কৃষ্ণকথার প্রাচুর্য ও প্রাবল্য। পার্থক্য শুধু এই যে, হিন্দী পৌরাণিক নাটকের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ রামকথা, বাংলা পৌরাণিক নাটকের আদি ও অকৃত্রিম আনন্দ কৃষ্ণকথার আলাপনে। বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ের পূবে যে যাত্রাভিনয় ছিল সেই সখের যাত্রায় কৃষ্ণই ছিলেন অনেক পালার সখা, সাধনার ধন। অপরদিকে হিন্দী নাটকের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত রামলীলা সগৌরবে অভিনীত। স্মরণীয় যে, তার বুক থেকে ভক্তির মৃগমদ আজও মুছে যায়নি। রামলীলার চরিত্রগুলি আজও এদেশে দর্শকদের শুধু আনন্দ দান করেন না, তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতিও গ্রহণ করেন। হিন্দীভাষী অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে রঘুপতি রাঘব রাজা রামের সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর। জনৈক আধুনিক কথা-সাহিত্যিকের ভাষায়, "গোটা বিহার জুড়ে হাজার হাজার গাঁ; লাখ লাখ

মানুষ। রামজীর কথা শুনবার জন্য আবহমান কাল ধরে তারা উন্মুখ হয়ে আছে। তুলসীদাসজীর নামে পুরুষানুক্রমে ভক্তি আর আবেগের স্রোত বয়ে আসছে তাদের প্রাণে।··· ··সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ এবং বাতাসের মতো এই রামায়ণ। রামজীকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কথা ভাবা যায় না।"১

হিন্দী পৌরাণিক নাটকের আদিযুগ থেকেই রামকথা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর এই রচনাগুলিকে যথার্থ নাটক রূপে অভিহিত করা চলে না। এগুলি পদ্যে রচিত রামলীলা অর্থাৎ রামযাত্রা। এ বাবদে সর্বপ্রথম উল্লেখের দাবী রাখে 'রামায়ণ মহানাটক' (১৬১০)। রচয়িতা প্রাণচন্দ চৌহান। নাটকটি পদ্যে রচিত। বাল্মীকির রামায়ণ এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানস অবলম্বনে নাট্যকার এই মহানাটক রচনা করেছেন। এখানে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে, হিন্দী নাট্যসাহিত্যের রামকথা অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মূল আশ্রয় বাল্মীকির রামায়ণ এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানস। তবে তুলনায় রামচরিতমানসের প্রতি আকর্ষণ ও নির্ভরতা বেশী। প্রথম রচনা 'মহানাটকেই' সে সত্যটি সোচ্চার।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে রামকথা অবলম্বনে রচিত নাটকের তালিকায় আছে—হৃদয়রাম ভল্লা রচিত 'হনুমন্নাটক ভাষা' (১৬২৩), উদয়কবির 'রাম করুণাকর' ও মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের 'আনন্দ রঘুনন্দন'। এগুলির মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত রচনাটিতে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় এবং সে কারণে গ্রন্থটি হিন্দী নাট্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক সৃষ্টি রূপে পরিগণিত ও প্রশংসাধন্য। নাটকটি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, এতে ইংরেজি, ফার্সী, বাংলা এবং মৈথিলী ভাষারও প্রয়োগআছে। প্রথম সার্থক হিন্দী নাটকে বাংলা ভাষার প্রয়োগ অবশ্যই তাৎপর্যবাচক। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলা নাটকেও সংলাপসূত্রে হিন্দীভাষা আদৌ অশ্রুত নয় যদিও অধিকাংশক্ষেত্রেই তা, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, অজস্র ভুলে ভরা।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে রামকথারই একাধিপত্য, কৃষ্ণকথা সে তুলনায় অত্যন্ত বিরল। লছীরাম রচিত 'করুণাভরণ' (১৬৫৭ এবং গণেশ কবির 'প্রদ্যুম্ন বিজয়' (১৮৬৪) ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উজ্জল উদাহরণ।

হিন্দী সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ভারতেন্দু যুগে। তুলনায় নাট্যশাখাটি যথেষ্ট দুর্বল। নাটকের সংখ্যা অনেক, তবে সাহিত্যগুণ বা নাট্য-ধর্ম অনস্বীকার্যরূপেই অল্প। কিন্তু একথাও অস্বীকারের উপায় নেই যে, এই যুগের

পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিনায় রামকথা এবং কৃষ্ণকথারই বিচিত্র মূর্ছনা।

আলোচ্য যুগে রামকথা অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রীর 'রামলীলা নাটক' পণ্ডিত শীতলাপ্রসাদ ত্রিপাঠীর 'জানকীমঙ্গল নাটক' (১৮৬৮) ও 'রামচরিতাবলী' (১৮৮৭), রামগোপাল বিদ্যান্তের 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৭৭), দেওকীনন্দন ত্রিপাঠীর 'সীতাহরণ' (১৮৭৬) ও 'রামলীলা' (১৮৮৯), বন্দীদীন দীক্ষিতের 'সীতাহরণ' (১৮৯৫) ও 'সীতা স্বয়ংবর' (১৮২৯), জ্বালা প্রসাদ মিশ্রের 'সীতা বনবাস নাটক' (১৮৯৫), মুনশী তোতারামের 'সীতা স্বয়ংবর,' বদরী নারায়ণ চৌধুরী 'প্রেমধন' রচিত 'প্রয়াগরামাগমন' এবং দ্বিজদাসের 'রামচরিত্র' (১৮৯১) নাটকের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মরণীয় যে, বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে হিন্দী পৌরাণিক নাটকের সুস্পষ্ট যোগাযোগের সংবাদ ও সূত্র এই যুগ থেকেই প্রাপ্তব্য। এ বাবদে রামগোপাল বিদ্যান্তের 'রামাভিষেক' নাটকটির কথা উল্লেখের দাবী রাখে। সংস্কৃত 'হনুমন্নাটক' অবলম্বনে নাটকটি রচিত এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন২ কিন্তু প্রকৃত বিচারে নাটকটি যে বাংলা পৌরাণিক নাটকের অন্যতম স্মরণীয় নাট্যকার মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের অনুসরণে রচিত স্বয়ং নাট্যকার সে কথা ভূমিকায় স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।৩

এই যুগে কৃষ্ণকথার আলাপে আত্মমগ্ন নাটকের তালিকায় আছে গণেশ কবির 'প্রদ্যুম্নবিজয়' (১৮৬৩), ভারতেন্দুর 'শ্রীচন্দ্রাবলী নাটিকা' (১৮৭৬), দেওকীনন্দন ত্রিপাঠীর 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭৬), অম্বিকাদত্ত ব্যাসের 'ললিতা, হরিহর দত্ত দুবের 'মহারাস' (১৮৮৪), খড়্‌গবাহাদুর মল্লের 'মহারাস' (১৮৮৫) ও 'কল্পবৃক্ষ' (১৮৮৬), দ্বিজ কৃষ্ণদত্তের যুগলবিহার নাটক' (১৮৯২) অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়ের 'প্রদ্যুম্নবিজয়' (১৮৯৩) ও 'রুক্মিণী পরিণয়' (১৮৯৪) এবং দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের 'প্রভাস মিলন' (১৮৯৯)। শেষোক্ত নাটকটি বাংলা 'প্রভাসযজ্ঞ' নাটকেরই হিন্দীভাষ্য।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতেন্দু যুগের পরেই দ্বিবেদী যুগ। প্রথমোক্ত যুগের প্রাণকেন্দ্রে যেমন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫), পরবর্তীযুগের প্রাণপুরুষ তেমনি আচার্য মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৬৪-১৯৩৮)।

দ্বিবেদী যুগে হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামকথা অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হল—রামনারায়ণ—মিশ্রের 'জনকবাড়া' (১৯০৬),

ব্রজনন্দন বল্লভের 'রামলীলা' (১৯০৮), গঙ্গাপ্রসাদের 'রামাভিষেক' (১৯১০), গিরধর লালের 'রাম বনযাত্রা' (১৯১০), নারায়ণ সহায়ের 'রামলীলা নাটক' (১৯১১) এবং রামগুলাম লালের 'ধনুষ যজ্ঞলীলা' (১৯১২)। নাট্যগুণের অভাব থাকলেও সবগুলি নাটকই কিন্তু রামকথার আলাপনে আত্মহারা এবং রামচন্দ্রের ভগবৎ সত্তার বিশ্বাসে অটল। সর্বত্রই রামচন্দ্র পরম করুণাময় ঈশ্বর এবং ভক্তিভাবই মূলভাব।

দ্বিবেদী যুগেও রামকথার সমান্তরালে কৃষ্ণকথা অবলম্বনে নাটক রচনার প্রেরণা অপ্রতিহত ও ধারা অব্যাহত। কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত এই যুগের উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে বলদেও প্রসাদ মিশ্রের 'প্রভাস মিলন' (১৯০৩), রাধাচরণ গোস্বামীর 'শ্রীদামা' (১৯০৪), শিবনন্দন সহায়ের 'সুদামা' (১৯০৭), বনওয়ারী লালের 'কৃষ্ণকথা' 'কংসবধ' (১৯০৯), ব্রজনন্দন সহায়ের 'উদ্ধব' । ১৯০৯), নারায়ণ মিশ্রের 'কংসবধ' (১৯১০), মথুরাদাসের 'রুক্মিণীহরণ' (১৯১৭) এবং মাখনলাল চতুর্বেদীর 'কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ' (১৯১৮)। শেষোক্ত নাটকটি পুরাণ প্রসঙ্গে ও পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকারের রাজনৈতিক চেতনা ও আধুনিক মনস্কতার যে পরিচয় বহন করে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান। এই নাটকে নাট্যকার যমরাজের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, " ...ঐশ্বর্য কী লালসা সে এক রাষ্ট্রনে দুসরে দেশোঁ পর অধিকার জমায়া হ্যায় আউর উসকা শাসন ইস ঢংসে করতা হ্যায় জিসমেঁ অপনাহী উদর ভরে আউর উস পরতন্ত্র দেশ কা নাশ হো। ছোটী ছোটী জাতিয়োঁ নে পৃথ্বী কে আবশ্যকতা সে অধিক হিস্‌সোঁ পর প্রভুত্ব স্থাপিত কিয়া হ্যায়। কোঈ রাষ্ট্র বিজয়-শ্রী কী মহত্বাকাঙ্ক্ষা মেঁ সব সংসার কো অপনে চরণোঁ মেঁ ঝুকবানা চাহতা হ্যায়। ফল য়হ হোতা হ্যায় কি বিজেতা মেঁ গর্ব, লোভ, ক্রূরতা, ক্রোধ ইত্যাদি কী অধিকতা হোতী জাতী হ্যায় আউর বিজিত জাতিয়োঁ মেঁ ভীরুতা, চরিত্রভ্রষ্টতা, অনাচারিতা, কঙ্গালী আউর কঈ প্রকারকে রোগ উৎপন্ন হোতে জাতে হ্যাঁয়।"৪ স্মরণীয় যে নাটকটির রচনাকাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় উক্তিটির অর্থ অদ্বৈত এবং অব্যর্থ। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পটভূমিকাতেও, বিশ্ব রাজনীতির পরিপেক্ষিতে উক্তিটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় এবং অনস্বীকার্যরূপেই প্রাসঙ্গিক।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিবেদীযুগের পরেই প্রসাদযুগ এবং সুখ্যাত নাট্যকার জয়শঙ্কর প্রসাদের (১৮৯০-১৯৩৭) নামটিই এ যুগের

রোনাম। শিপ্রসাদযুগে নাট্যকারগণের পদচারণা প্রধানত: ইতিহাসের পথে ; স্বয়ং প্রসাদজী হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ। কিন্তু পুরাণের পথেও পথিকের অভাব নেই যদিও তাঁদের সংখ্যা লক্ষণীয় রূপেই ক্রম-হ্রাসমান।

এই যুগে রামকথা অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে আছে দুর্গাদত্ত পাণ্ডের 'রাম নাটক' (১৯২৪), কুন্দনলাল শাহের 'রামলীলা নাটক' (১৯২৭), মাতা বদল গিরির 'রামরহস্য নাটক' (১৯৩৬), দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তের 'শ্রীরামলীলা' এবং গোবিন্দ দাসের 'কর্তব্য' (পূর্বার্ধ) (১৯৩৫)। নিছক নাটকের বিচারে প্রথম চারটির রচনার মান অত্যন্ত সাধারণ। মাতা বদলগিরির 'রামরহস্য' নাটকটিতে উৎকট কালব্যত্যয় দোষ (anachronism) পৌরাণিক পরিবেশটিকে পঙ্গু ও পীড়িত করেছে।

শেঠ গোবিন্দদাসের 'কর্তব্য" (পূর্বার্ধ) নাটকটি এই যুগের রামকথা উপস্থাপনার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এক হিসেবে পুরাণের পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে অনুপম ও আদর্শ মানবিক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে এ নাটকে। সেইসঙ্গে আছে রাজনৈতিক কর্তব্যবোধের কথা যা সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় এবং চলমান ইতিহাসের বুকেও অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

নাটকটির পাঁচটি অঙ্কে রামের বনবাস, সীতাহরণ, বালি-বধ, লঙ্কাবিজয়, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতা-বিসর্জন, লবকুশ এবং সীতার সঙ্গে রামের মিলন ইত্যাদি রামায়ণের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারই রূপায়ণ করা হয়েছে। নাটকটির শেষ অঙ্কে নাট্যকার রামকে অবতাররূপে স্বীকার করলেও সমস্ত নাটকটির মধ্যে অসাধারণ গুণসম্পন্ন রামচন্দ্রের মানবমহিমারই জয়গান গীত হয়েছে। নাট্যকার যেন বলতে চেয়েছেন, সমাজের শ্রী ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য রামচন্দ্রের মতো মানুষ ও মহৎ শাসনকর্তার প্রয়োজন যিনি নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারেন এবং নিজের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বপালনের জন্য জীবনের সকল সুখকে অকাতরে ও অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মে ও কর্মে ধর্ম, নীতি, কর্তব্যপরায়ণতা এবং আদর্শপ্রাণতার আকুল আকাঙ্ক্ষা, অধীর আগ্রহ, রামচন্দ্র সেই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহেরই সাকার বিগ্রহ। নাটকটির নামটুকুও (কর্তব্য) এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়।

রামকথার মত কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত নাটকের সংখ্যা এই যুগে যথেষ্ট

হ্রাসমান। এই যুগে কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে শেঠ গোবিন্দ দাসের 'কর্তব্য (উত্তরার্ধ)' (১৯৩৫) অনস্বীকার্যরূপেরই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে আছে বিয়োগী হরি রচিত 'ছদ্ম যোগিনী' (১৯২৩), পণ্ডিত রাধেশ্যাম কথাবাচকের 'শ্রীকৃষ্ণাবতার' (১৯২৬) ও 'রুক্মিণীকৃষ্ণ' (রুক্মিণী মঙ্গল) (১৯২৭) এবং জমুনা দাস মেহরার 'রুক্মিণী হরণ' (১৯৩৪) নাটক।

'ছদ্ম যোগিনী' নাটকের কৃষ্ণ ধীর-ললিত নায়ক। তিনি প্রেমের পরীক্ষা নিতে ছদ্ম যোগিনীর রূপ ধারণ করেছেন। নাটকটিতে প্রেম এবং ভক্তিরই প্রাধান্য।

রাধেশ্যামের 'শ্রীকৃষ্ণাবতার'—অত্যাচারীদের অত্যাচার ও অনাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ভগবানের অবতার গ্রহণের ইতিকথা। বলা বাহুল্য এই অবতার 'শ্রীকৃষ্ণাবতার'। কংসবধ এই নাটকের প্রধান ঘটনা।

রুক্মিণী-কৃষ্ণ নাটকের কৃষ্ণও অবতার এবং তিনি অদ্ভূত শক্তি, আশ্চর্য পরাক্রম ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীর মানুষকে কর্তব্য সচেতন করে তোলাই এই অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ নিজের অতুলনীয় সাহস ও আত্মিক শক্তির দ্বারাই সংসারযুদ্ধে জয়লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। এই নাটকে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণের পাশাপাশি প্রদ্যুম্ন কর্তৃক শম্বরাসুর বধের কাহিনীও প্রদর্শিত হয়েছে। আধুনিক নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এই নাটকের সুলেখার চরিত্রটি।

জমুনাদাস মেহরার 'রুক্মিণীহরণ' নাটকটির বিষয়বস্তু শিরোনামেই স্বপ্রকাশ। কিন্তু রাধেশ্যামের 'রুক্মিণী-কৃষ্ণ' নাটকের সঙ্গে জমুনা দাসের 'রুক্মিণীহরণ নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে গুরুতর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 'রুক্মিণী কৃষ্ণ' নাটকে রুক্মিণীর পিতামাতা (রাজা ভীষ্মক এবং প্রভা) রুক্মিণীকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিতে চান কিন্তু রুক্মিণীহরণ নাটকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে রুক্মিণীর পিতা যখন জানতে পারলেন যে, কৃষ্ণ সদলবলে বিনা নিমন্ত্রণে রুক্মিণীর স্বয়ংবর সভার অংশগ্রহণ করতে আসছেন তখন তিনি রাজা দন্তচক্রের পরামর্শে স্বয়ংবর সভা স্থগিত করে দেন। কৃষ্ণানুরাগিনী রুক্মিণী পিতার উদ্দেশ্য জানতে পেরে সখীদের পরামর্শানুসারে লোচন মিত্রের হাত দিয়ে কৃষ্ণের কাছে চিঠি পাঠান। তারপরেই কৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী গৌরীপূজার্থে রুক্মিণীর বহির্গমন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী-হরণ।

এই নাটকের কৃষ্ণ ধীরোদাত্ত নায়ক। তিনি বীর, নির্ভীক ও ন্যায়নিষ্ঠ।

তিনি যে ভগবানের অবতার নারদের সংলাপে তার স্বীকৃতি আছে—"পরমাত্মাকে সাকার স্বরূপ কো যদি হম শ্রীকৃষ্ণকে নাম সে সম্বোধিত করতে হ্যাঁয় তো যথার্থ হী হ্যায়।" কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই নাটকে কৃষ্ণ আসলে আদর্শ মানবরূপেই অঙ্কিত ও উপস্থাপিত।

দ্বাপরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনে রচিত শেঠ গোবিন্দ দাসের 'কর্তব্য (উত্তরার্ধ)' (১৯৩৫)। 'কর্তব্য (পূর্বার্ধ)'-এর নায়ক রামচন্দ্র, 'কর্তব্য (অপরাধ)'-এর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। উভয়ের জীবনই কর্তব্যপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কর্তব্যপালনের পথ ও পদ্ধতিতে উভয়ের মধ্যে দুই যুগের ব্যবধান। একজন সর্বার্থে পৌরাণিক, অপরজন সর্বাংশে আধুনিক। এই দুটি নাটক এক অর্থে পূর্বভারতের পৌরাণিক নাটকের বিকাশ ও বিবর্তনের দুটি সুচিহ্নিত স্তর।

'কর্তব্য (পূর্বার্ধ)-এর নায়ক রাম কর্তব্যপালনে চিরাচরিত নীতি ও নিয়মের দাস, 'অপরার্ধের' নায়ক কৃষ্ণ শাস্ত্রনীতি অপেক্ষা মানবনীতির প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল। রামচন্দ্র শাস্ত্রনীতির বিশ্বস্ত অনুকারক, শ্রীকৃষ্ণ সাহসী সংস্কারক। তৃতীয় অঙ্কে তিনি উদ্ধবকে বলেছেন, "সমাজ কী অনুচিত মর্যাদা-কো তোড়না হী ধর্ম হ্যায়। মৈনে ইসী কো তো অপনা জীবন-কার্য বনায়া হ্যায়।" পুরাণের কাঠামোটিকে অবিকল রেখেও নাট্যকার তাঁর কণ্ঠে নূতন কথা শুনিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও আচরণ আধুনিক যুগের চিন্তাভাবনার সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। রুক্মিণীর চিঠি পেয়ে কৃষ্ণ যে তাঁকে হরণ করেছেন তার কারণ শুধু এইমাত্র নয় যে, রুক্মিণী তাঁকে ভালোবাসেন বা তিনি রুক্মিণীকে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে রুক্মিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই কৃষ্ণ রুক্মিণীর ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছেন। উদ্ধবকে তিনি বলেছেন, "বর-বধূ কো জন্ম ভর পরস্পর সঙ্গ রহণা পড়তা হ্যায়। উনকে ভাগ্য কা ইস প্রকার নির্ণয় করণেকা বান্ধবো কো কোঈ অধিকার নহী হ্যায়।"

ধর্ম, ন্যায় ও সত্যরক্ষাই এই নাটকের শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও কর্তব্য। তবে সেই ধর্ম সনাতন শাস্ত্রধর্ম নয়, শাশ্বত মানবধর্ম। সমাজের অন্ধযুক্তিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, আগ্রহী হয়েছেন সমাজের নীতি ও নিয়মগুলিকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে। তাঁর বিনীত কিন্তু দৃপ্ত ঘোষণা "সমাজ কী অন্যায়পূর্ণ মর্যাদায়েঁ সে সমাজকো উল্টা ক্লেশ হোতা হ্যায় অতঃ ইন্হে ভংগ করনা হী হোগা।"[৫]

আধুনিক হিন্দী নাটকে পুরাণ প্রিয় বিষয় না হলেও নিঃশেষে পরিত্যক্তও হয়নি। তবে ভক্তির স্থানে দেখা দিয়েছে যুক্তি, আবেগের স্থানে মননশীলতা। পুরাণ প্রসঙ্গ বর্জিত না হলেও তার তাৎপর্য পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। সে পরিবর্তন অবশ্যই সময়োচিত। উদাহরণস্বরূপ ধর্মবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ' (১৯৫৫) গীতিনাট্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাভারত যুদ্ধের আঠারো দিন থেকে প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের দেহাবসানের দিন পর্যন্ত এই নাটকের কাহিনী প্রসারিত। যুদ্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণামের রূপচিত্রণই এর উদ্দেশ্য। যুদ্ধে শুধু মানুষের মৃত্যু হয় না, তার মূল্যবোধেরও অপমৃত্যু ঘটে। তবু নৈরাশ্যই নাটকটির ফলশ্রুতি নয়। স্বয়ং নাট্যকারের ভাষায় এ নাটক—"……জ্যোতি কী হ্যায় অন্ধোঁ কে মাধ্যম সে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রামকথা এবং কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত হিন্দী নাটকগুলিতে শুধু যে পৌরাণিক সংস্কৃতির ও প্রাচীন মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার করার প্রয়াস করা হয়েছে তাই নয়, নূতন যুগের প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনে সেগুলির মধ্যে নূতন অর্থব্যঞ্জনারও সৃষ্টি করা হয়েছে। যুগের পরিবর্তনে দৃষ্টিরও পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টির পরিবর্তন দ্রষ্টব্যবস্তুর রূপে ও স্বরূপে পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন ঘটায়। এটাই স্বাভাবিক। হিন্দী পৌরাণিক নাটকে সেই স্বাভাবিকতাকেই প্রত্যক্ষ করি। শেঠ গোবিন্দদাসের 'কর্তব্য (পূর্বার্ধ)' এবং 'কর্তব্য (অপরার্ধ)'-এর নায়ক যথাক্রমে রাম এবং কৃষ্ণ এই কারণেই অবতার রূপে বন্দিত নন, আদর্শ মানবরূপেই অভিনন্দিত। পুরাণের গঙ্গোত্রীতে যার উদ্ভব, মানবতাবাদের মহাসমুদ্রে তার কালোচিত পরিণাম ও পরিণতি। তবে এ ঘটনা শুধু হিন্দী পৌরাণিক নাটকেরই সংবাদ নয়, বাংলা পৌরাণিক নাটকেরও সত্য।

হিন্দী পৌরাণিক নাটকের প্রাচীন পরিচ্ছেদে রামলীলা, বাংলা পৌরাণিক নাটকের পৃষ্ঠভূমিতে কৃষ্ণলীলা। বাংলাদেশে কৃষ্ণযাত্রার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন।[৫] কেউ কেউ মনে করেন পশ্চিমের রামযাত্রার অনুকরণেই পূর্বের কৃষ্ণযাত্রা।[৬] বাংলাদেশে কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তার মূলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার। এই একই কারণে কৃষ্ণযাত্রার কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কেউ নন, তিনি যমুনা পুলিন বিহারী নন্দসুত। যেসব পালায় তাঁর ভাগবতী স্বরূপ চিত্রণের প্রয়াস সেখানেও তাঁর গোপিকামোহন রূপটিই প্রবল ও প্রকট। অপরদিকে রামকথা বাংলার লোক সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব

বিস্তার করলেও যাত্রার আসরে প্রায় অনুপস্থিত। বাংলা পৌরাণিক নাটকে কিন্তু হিন্দীর মতোই কৃষ্ণকথা ও রামকথার দ্বৈত সংলাপ যদিও কৃষ্ণকথাই প্রথম ও প্রধান।

বাংলা নাটকের সুস্পষ্ট জন্মলগ্নটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ রূপেই চিহ্নিত এবং সেই জন্ম-লগ্নেই বাংলা নাটক নিয়েছে কৃষ্ণকথার দীক্ষা। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসও শুরু হয়েছে ঐ সময় থেকে। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৯৫২) নাটকটি এ বাবদে প্রথম প্রয়াস। কাহিনীর পক্ষে কৃষ্ণ যত অবান্তরই হোন না কেন[৭] তাঁর দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির আলোকে তাঁর মহিমময় সর্বশক্তিমান রূপটি শ্রদ্ধার সঙ্গেই উপস্থাপিত। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেন,

"কৃষ্ণের চরণে এসো করিয়া প্রণাম।
ইহাতে হইবে সিদ্ধ সব মনস্কাম ॥"[৮]

সত্যভামাও অপরপক্ষকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসূত ত্রাসান্বিত হয় ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান তোমার স্বপক্ষে। তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে? যখন দ্রৌপদীর কারণ লক্ষ লক্ষ বীর অর্জুনের বিপক্ষে বাণক্ষেপ করিয়াছিল তখন অর্জুনকে কে রক্ষা করিয়াছিলেন? অর্জুনের বীরবার্তা কি তোমার হৃদয় হইতে বহির্ভূত হইয়াছে? একা ধনঞ্জয়েই রক্ষা নাই, তাহাতে কৃষ্ণ তোমার স্বপক্ষ।[৯]

এক হিসেবে হরচন্দ্র ঘোষই (১৮১৭—১৮৮৪) সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ভারতবর্ষের চিরন্তন নৈতিক আদর্শকে শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করার জন্য মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮)। নাটকটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "......কিন্তু ভারতবর্ষের অনবগত নহে যে মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়েরও উপদেশ নিকরের নিকেতন। এ কারণে আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরু ভঙ্গাবধি ও অন্ধরাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধু-ভাষায় বহুলাংশ গদ্যচ্ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া 'কৌরব বিয়োগ নাটক' এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম। ভরসা

করি যে নীতি নিপুণের এই নীতি গ্রন্থে আমূলাৎ কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া মদীয় শ্রম সফল, অথবা ভ্রম দূর করেন।"

দেখা যাচ্ছে যে, 'কৌরব বিয়োগ' নাটক রচনার মৌলিক প্রেরণা ভক্তির প্রণোদনা নয়, পক্ষান্তরে মহাভারতের নীতিশিক্ষাকে জনসমাজে প্রচলিত ও প্রচারিত করা। তবে মহাভারত কাহিনী উপস্থাপনায় নাট্যকারের আদর্শ যে ব্যাসদেব নন, বাংলার কাশীরাম দাস ভূমিকাতে সে তথ্যেরও স্পষ্ট স্বীকৃতি। অবশ্য প্রয়োজনানুসারে সে কাহিনীও যে পরিমার্জিত ভূমিকাতে তারও উল্লেখ পাই। নাট্যকার বলেছেন, "আর যদিও উপযুক্ত জ্ঞানিব্যতীত অন্যান্যের এতদ্রূপ উদ্যম করা অনধিকার চর্চা ভিন্ন নহে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 'কাশীদাসের' কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিলাম। তাতে যদি এই নববেশে এতদ্দেশের নবীন ও প্রবীণ সমাজের উল্লাস জন্মে, তবে আমি আপনাকে নিতান্তই লব্ধ-প্রত্যাশ বোধ করিব।"

লক্ষণীয় যে, এখানে কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি আছে কিন্তু কৃষ্ণভক্তির কথা নেই। অর্থাৎ নাটকটি হিন্দী নাট্য সাহিত্যের কৃষ্ণকথার পর্যায়ভুক্ত নয়। তাছাড়া কৃষ্ণের ভূমিকাও সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত। নীতিকথার প্রচারই নাটকটির লক্ষ্য এবং নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সেই সূত্রেই একজনের অনুরোধে অপরজনের সংলাপসূত্রে একের পর এক নীতিকাহিনীর অবতারণা করেছেন নাট্যকার। ভগ্ন উরু দুর্যোধনের অনুরোধে কৃপাচার্য বর্ণিত 'দৈবই বলবান' সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ নীতিমূলক কাহিনী, যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত অর্জুনের মুখে বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কাহিনী এবং শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখে শান্তিপর্বের আদ্যন্ত কাহিনী স্থান পেয়েছে এই নাটকের কলেবরে। ভক্তিকথা না হলেও ভারতকথার বিপুল বার্তা উচ্চারিত হয়েছে নাটকটির মুখে।

কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ পাই ডাক্তার দুর্গাদাস করের 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটকে' (১৮৬৩)। নাটকটির বিষয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এই নাটকে কৃষ্ণভক্তির যে সূচনা তার সুবিপুল সমারোহ ও সাড়ম্বর পরিণতি মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে।

বাংলা নাটকের আদিযুগের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২—১৮৮৬) সমাজসচেতনতা সর্বজনবিদিত হলেও পুরাণ-

পথটিও তাঁর অপরিচিত অথবা অনায়ত্ত ছিল না। প্রমাণ 'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১) এবং 'কংসবধ' (১৮৭৫) নাটক দুটি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, হিন্দী ও বাংলা উভয় নাটকেই কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ কাহিনী কৃষ্ণকথার একটি পরিচিত ও প্রিয় বিষয়।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণী হরণ' নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এবং কাহিনীর সর্বাঙ্গ বাংলাদেশের জলবায়ুতে সিক্ত। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যুবরাজ রুক্মীর কাছে বৃদ্ধ রাজা ভীষ্মক নারদের পরামর্শ অনুসারে কৃষ্ণের সঙ্গে কন্যা রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব করলে যুবরাজ রুক্মী তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "...... আমার ভগিনীর বরপাত্র কি সেই রাখাল, গয়লার ছেলে তাকে চেনে কে ? সে কি মানুষ তার জাত কি ? জন্মের ঠিক কি ? কেউ বলে নন্দ ঘোষের ছেলে, কেউ বলে বাসুদেবের ছেলে যার তার অন্ন খেয়ে এত কালটা বেড়ালে. সে কি ভদ্রস্থলে দাঁড়াবার যোগ্য, না পরিচয় দিবার উপযুক্ত। তার শরীরে কি বুদ্ধি-বিদ্যা আছে ? বিদ্যার মধ্যে ঘোল খাওয়া আর গাই দোওয়া !" কিন্তু রাজা ভীষ্মক কৃষ্ণের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করতে চান, কারণ তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস—"রুক্মিণী লক্ষ্মী কৃষ্ণও নারায়ণ ......।" যুবরাজ রেগে গিয়ে বলেন, "ঐ আপনাদের প্রাচীন দলের ঐ যে একটা মহাভ্রান্তি, এ ভারী আক্ষেপের বিষয়। একটা ইন্দ্রজালিক কার্য করে ঐ গয়লার বেটা এক্ষণে মূর্খ সমাজে ভগবানের অবতার বলে পরিচিত হচ্যে।" দ্বিতীয় দৃশ্যে রুক্মিণী কৃষ্ণপ্রেমে আকুল ও ব্যাকুল পূর্ব-রাগের নায়িকা। তিনি দূতের হাতে চিঠি পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে নারদ কৃষ্ণকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করলে কৃষ্ণের মুখে শুনি, "তা কি করে বিবাহ করি, লোকে যে আমাকে কালো বলে মেয়ে দেয় না।" নারদ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করার জন্য ওষুধ ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছেন এমন সময় রুক্মিণীর দূত এসে পৌছাল। কৃষ্ণ আতিথ্য সৎকার করলেন !

তৃতীয় অঙ্কে রুক্মিণী উৎকণ্ঠিতা, দূতের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছেন ! শেষ পর্যন্ত দূতের প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণ অতিশীঘ্র আসছেন এই বার্তা প্রদান। চতুর্থ অঙ্কে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন। পরিজন বেষ্টিতা রুক্মিণীর অম্বিকাদেবীর মন্দির থেকে পূজা সেরে প্রত্যাগমনের পথে ব্যোমযান থেকে কৃষ্ণের অবতরণ ও রুক্মিণী হরণ। পঞ্চম অঙ্কে রুক্মিণী কৃষ্ণের মিলন।

নাটকটিতে ভাগবতী কথা এবং অলৌকিক গাথা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। পৌরাণিক চরিত্রের পাশাপাশি অলৌকিক চরিত্রের ভীড়—ধনদাস, লবঙ্গলতা,

কুসুমলতা, শ্যামা, সোনা ইত্যাদি। কৃষ্ণও একই সঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক। কালব্যত্যয় দোষও আছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর দূতকে যে সব জিনিস খেতে দিয়েছেন তার মধ্যে বাংলাদেশের রসগোল্লাও আছে। তবে সব মিলিয়ে নাটকটি কৃষ্ণ কথারই আলাপন, তাঁর ভাগবতী মহিমারই জয়গান।

রাম নারায়ণের 'কংসবধ' (১৮৭৫) নাটকেও কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণারতি। উগ্রসেনের সংলাপে কৃষ্ণের দেবত্ব স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত, "কৃষ্ণ তুমি কি আমার দৌহিত্র? আমি তোমার মাতামহ? তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা, বাক্যমনের অগোচর।..."

বাংলা পৌরাণিক নাটকের অন্যতম পথ প্রদর্শক মনোমোহন বসুর (১৮৩১ — ১৯১২)-অবিসংবাদিত কৃতিত্ব রামকথায়, কিন্তু কৃষ্ণকথার আলাপেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন না। মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন, 'পার্থ পরাজয় নাটক' (১৮৮১) এবং রাধাকৃষ্ণের রাস নিয়ে 'রাসলীলা' (১৮৮৯)। অবশ্য এগুলি ঠিক নাটক নয়, গীতাভিনয় বা নূতন যাত্রা।

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বাংলার গীতিভিনয় রচনার এই পর্বে যাত্রার আসরে কৃষ্ণকথা এবং রামকথারই যুগলবন্দী, প্রায় একচ্ছত্র একাধিপত্য। কিছু নিদর্শন তুলে ধরছি। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (দ্বি স ১৮৭৭), ব্রজলীলাঘটিত 'কৃষ্ণান্বেষণ', 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'মানভিক্ষা' এবং রামায়ণ কাহিনী নিয়ে 'রামের রাজ্যপ্রাপ্তি' (দ্বি-ব ১৮৭৬) ও 'সীতার বনবাস' (১৮৭৯)। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাভারত কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন 'দুর্যোধনের দর্পচূর্ণ' (১৮৭৭), 'অভিমন্যুবধ যাত্রা' (১৮৭৮) ও 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গ যাত্রা' এবং রামায়ণ কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন 'সীতার বনবাস নাটক' (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) 'রাম বনবাস নাটক' (তৃ-স ১৮৭৮), 'রাম-বিলাপ নাটক' (১৮৭৬), 'লঙ্কেশ্বর বিজয়' (১৮৭৬), 'রাম অভিষেক নাটক' (তৃ-স ১৮৮১) রামের রাজ্যাভিষেক' (১৮৭৮) 'জানকী পরিণয় ও ভৃগুরামের দর্পচূর্ণ' (১৮৭৯) ও 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮০); তিনকড়ি বিশ্বাস মহাভারত কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮০), 'অর্জুনের লক্ষ্যভেদ' (১৮৭৮) এবং রামায়ণ কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন 'সীতার বনবাস' (তৃ-স ১৮৮০), 'মেঘনাদবধ' (দ্বি-স ১৮৮০), 'রাম বনবাস' (চ-স ১৮৮০) 'লক্ষণের শক্তিশেল' (১৮৮০), 'সীতার পাতাল প্রবেশ' (১৮৮০) ও ভরত বিলাপ 'নাটক' (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ব্রজমোহন রায় (১২৩৮ — ১২৮২ বঙ্গাব্দ) যেমন

'অভিমন্যুবধ' (১৮৭৮) রচনা করেছিলেন তেমনি 'রামাভিষেক' (১৮৭৮) ও রচনা করেছিলেন। যাত্রাদলের রাজা মতিলাল রায় (১৮৪৩—১৯১১) রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে অজস্র যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন।[১০] সর্বাধিক লক্ষণীয় তথ্য এই যে, এই যুগে বাংলা যাত্রাপালার আসরের প্রধান বার্তা কৃষ্ণ অথবা রাম, প্রধান রস আদি অথবা করুণ।

বাংলা নাটকে রামকথার সূচনাপর্বে পাই উমেশচন্দ্র মিত্রের চতুরঙ্ক 'সীতাবনবাস নাটক' (১১৭২ বঙ্গাব্দ) যদিও এ বিষয়ে প্রথম সার্থক প্রবক্তা মনোমোহন বসু। তাঁর প্রথম রচনা 'রামাভিষেক নাটক বা রামের অধিবাস বা বনবাস' (১৮৬৭)। অবশ্য বিষয়বস্তুর বিচারে নাটকটির 'রামের বনবাস' নামটিই যুক্তিসঙ্গত। নাটকটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সহাবস্থান সকৌতুকে লক্ষণীয়। নট-নটী দ্বারা নাট্য কাহিনীর প্রস্তাবনার সংস্কৃত নাট্য-রীতিটিকে যেমন বিসর্জন দেওয়া হয়নি, তেমনি সংস্কৃত নাট্যরীতি বিরোধী বিয়োগান্তক পরিণতি দানেও নাট্যকার কুণ্ঠা বোধ করেন নি। নাট্যরচনার উদ্দেশ্যটি প্রস্তাবনার নটের সংলাপে সোচ্চার—"……সত্যবাদী; জিতেন্দ্রিয় শান্ত, দান্ত, ধীর এমন কোনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণরসের কোনো একটি অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্বিবাদে যেমন সর্বমনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই না।" স্মরণীয় যে, এই করুণ রসটিই বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে মানানসই।

লক্ষণীয় যে, 'রামাভিষেক' নাটকে নাট্যকার বাল্মীকির নন, কৃত্তিবাসের অনুগামী। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কাহিনীর পটভূমিকা এবং চরিত্রগুলির গায়ে বাংলাদেশের জলবায়ুর ছাপ। পুরাণের নামাবলীটির আড়ালে বাংলার মুখটি এখানে অসন্দিগ্ধরূপেই অনবগুণ্ঠিত।

মনোমোহন বসুর নাটকে পুরাণের পাতায় সমসাময়িক সমাজ সচেতনতার নির্ভুল স্বাক্ষর। নাটকটির বিষয় রামের বনবাস, তার মূলে কৈকেয়ীর চাপ ও চক্রান্ত, পরিণামে দশরথের মৃত্যু। নাট্যকার এই সুযোগে বাংলাদেশের সমসাময়িক একটি কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন অত্যন্ত সুকৌশলে। বহুপত্নীক রাজা দশরথের পরিণাম দর্শনে মন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেছেন, "হায়! হায়! বহুবিবাহ কি অশেষ অনর্থের মূল!—কি অপ্রতিহতরূপে সকল সুখ ও সকল ধর্ম নষ্ট করে! আজ নিশ্চয় জান্‌লেম্‌, পুরুষ যত কৃতী হউন, যত সতর্ক থাকুন, তথাপি বহু বিবাহবৃক্ষে বিষময় ফলোৎপাদন হতেই হবে, তার সন্দেহ

নাই।[১৫] সমসাময়িক সমাজ জীবনের সঙ্গে প্রাচীন পুরাণের সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিটির শুরু এইভাবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রধান নায়ক রাম ও কৃষ্ণ, মূল সুর ভক্তি। কৃষ্ণলীলায় মহাভারতীয় কাহিনীর বুকে ব্রজলীলার ছায়া ও ছাপ। বাংলা পৌরাণিক নাটকে কৃষ্ণনামের দীক্ষা পূর্ণ হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) দৌলতে। ধর্মপ্রাণ দেশ ও জাতিকে গিরিশচন্দ্র কত গভীরভাবে জানতেন তার প্রমাণ তাঁর এই উক্তি-"ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম—দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি যতপ্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রোদে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারও কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে।... হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।"[১২]

কৃষ্ণকথার গৌরব ঘোষণা করলেও রামকথা নিয়েই গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা পৌরাণিক নাটকের রঙ্গমঞ্চে। তাঁর দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'অকাল বোধন' (১৮৭৭) আকারে ক্ষুদ্র নাটিকা, বিষয় রামচন্দ্রের 'অকালবোধন, উৎস কৃত্তিবাসের রামায়ণ। 'রাবণ বধ' (১৮৮১) তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক, নাটকটি আগাগোড়া ভক্তির সুরে বাঁধা। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখযোগ্য যে, গিরিশচন্দ্র ছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য।

গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে বাঙ্গালীর নিজস্ব ধর্মবোধ ও রসরুচিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যে সকল চরিত্র ও কাহিনী বাঙ্গালীর মানসিকতার অনুকূল গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাদেরই সমাবেশ ও সমাহার। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ব্রজলীলার রাধাকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সমধিক। প্রয়োজনবোধে লৌকিক রামায়ণগুলির কাছেও হাত পেতেছেন তিনি।

'রাবণবধ' নাটকেও গিরিশচন্দ্র বাল্মীকির নন, কৃত্তিবাসের অনুগামী। রাবণ তাই পরম বিষ্ণুভক্ত, রামচন্দ্র পরম করুণাময় ঈশ্বর। রাবণ মুক্তি কামী, তাই রামচন্দ্রের হস্তেই মৃত্যু কামনা করেন। রাবণের তাই হাতে অস্ত্র, বুকে বিষ্ণুভক্তি, মুখে বন্দনাস্তব।

"সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে,
ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে।
নিরুপম শ্যামকান্তি,
শ্রীচরণে পতিত পাবনী গঙ্গা।
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু
পুলকে গোলোকে চলে যাই।"১৩

এই বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বুকে—রামকথা, কৃষ্ণকথা নির্বিশেষে, সরবে বাসা বেঁধে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলাদেশে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের প্রেক্ষাপটে গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত এই অহৈতুকী ভক্তিবাদ কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হবে সে সংশয় সেকালেও ছিল। কিন্তু সেই সংশয়ের অমূলকতা সমসাময়িক কালের কণ্ঠেই শোনা যেতে পারে। "রাবণ বধ' নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয় কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়া লক্ষণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন—

দেহ সবে বিদায় আমায়,
সাগর সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ!...

রামচন্দ্রবেশী গিরিশচন্দ্রের জলদম্ভীর কণ্ঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র—

তারার চরণে ভক্তি অস্ত্র বিনে
কি পারে বিদ্ধিতে আর—

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী, আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে। ভক্তি প্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই—ধর্মপ্রাণ জাতির মর্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।"১৪

রামকথা অবলম্বনে রচিত গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য নাটক—'সীতার বনবাস' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'লক্ষণ বর্জন' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'সীতার বিবাহ'

(১২৮৯ বঙ্গাব্দ), 'রামের বনবাস' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) এবং 'সীতাহরণ' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)।

রামকথা উপস্থাপনায় গিরিশচন্দ্র মূলতঃ কৃত্তিবাসের উপর নির্ভরশীল হলেও প্রয়োজনবোধে লৌকিক রামায়ণগুলি থেকেও উপাদান আহরণে আলস্য বোধ করেন নি। 'সীতার বনবাস' নাটকটি এ বাবদে উল্লেখযোগ দৃষ্টান্ত। এই নাটকে সীতা উর্মিলার অনুরোধে রাবণের একটি ছবি এঁকেছিলেন এবং ক্লান্তিবশত: সেই ছবির উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রামচন্দ্র দুর্মুখের মুখে সীতা সম্পর্কিত লোকাপবাদ শুনে অন্তঃপুরে এসে এই চিত্র দেখে সীতার কলঙ্ক সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েই লক্ষ্মণকে আদেশ দিয়েছেন,

> শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
> দুষ্টা নারী সীতা,
> চিত্রি রাবণের অবয়ব,
> হানি বাজ লাজে,
> স্বচক্ষে দেখেছি ঢলিয়াছে কায়,
> রাক্ষস ছবির পরে।[১৫]

এই ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই, কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণে আছে এবং গিরিশচন্দ্র সীতার জীবনের বেদনাকে দুর্বিষহ করার জন্যই আকস্মিক যোগাযোগ মূলক নাট্যগুণ সমন্বিত এই প্রসঙ্গটির সদ্ব্যবহার করেছেন।[১৬]

রামায়ণ কাহিনী বর্ণনায় গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসের অনুগত, ভারত কথার বর্ণনায় তিনি কাশীরাম দাসের অনুগামী। তাঁর 'অভিমন্যুবধ' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) নাটকের মুখপত্রে কাশীরামদাসের সশ্রদ্ধ উল্লেখ তারই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।[১৭] ভারতকথা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক – 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস' (প্রথম অভিনয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ), 'জনা' (১৮৯৪) এবং 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০)। লক্ষণীয় যে, সব নাটকেই ভারতকথার মালায় কৃষ্ণভক্তির পুষ্পচন্দন। জনা নাটকে তো কৃষ্ণভক্তিরই জয়জয়ন্তী।

নাটক হিসেবে অপাংক্তেয় হলেও ভারতকথার দুর্বার আকর্ষণের অভিজ্ঞান রূপে প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চমবেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্যটি (১৮৮৯) উল্লেখের দাবী রাখে। আঠারো পর্ব মহাভারতকে গৈরিশছন্দে নাট্যরূপদানের এই অক্ষম প্রয়াস বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান না পেতে পারে কিন্তু ভারতকথার ইতিহাসে স্মরণের দাবী রাখে।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) পৃথক্ রসের কারবারী, তাঁর রসরাজ উপাধিটিও সেই সুবাদেই সার্থক। তবে ভারতকথায় আলাপে তিনিও আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। প্রমাণ 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮)। এটি তাঁর শেষ নাট্য-রচনা এবং এই নাটকে দ্রৌপদীর বিবাহের পূর্ব থেকে কুরুসভায় অপমান পর্যন্ত কাহিনী রূপায়িত হয়েছে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে। ব্রজমোহন কৃষ্ণকে নিয়েও তিনি আসরে বসেছিলেন। প্রমাণ 'ব্রজলীলা' এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী' বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' নাটিকা। অবশ্য এগুলি নাটক নয়, গীতিনাট্য। অমৃতলালের 'ব্রজলীলা'য় মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট। অমৃতলালের কৃষ্ণ বাংলার ভাব বৃন্দাবনের মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, তাই ব্রজলীলায় গীতগোবিন্দের আক্ষরিক অনুবাদ—

তোমার মিলন আশে মদনমোহন বেশে
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্যাম।
বিলম্ব করো না প্যারি, অধীর মুরলীধারী
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম।

নাট্যকার যেমনই হোন, অনুবাদক অমৃতলালের প্রশংসা করতেই হয়।

বাংলা পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) একটি স্মরণীয় নাম। তবে তাঁর নাটকগুলি প্রায়ক্ষেত্রেই গীতাভিনয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাঁর অধিকাংশ নাটকই রামকথা ও কৃষ্ণকথার বর্ণনায় নিবেদিত। বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে নাট্যকারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তাঁর অন্ততঃ একটি নাটকে এই পরিচয়ের সুফল ফলেছিল। তিনি মূল বাল্মীকি রামায়ণের পদ্যানুবাদও করেছিলেন। তাঁর রামচরিতাবলী নাটক রচনার উদ্দেশ্য, তাঁর নিজের ভাষায়, "দেবোপম বাল্মীকির অমৃত-সমুদ্র স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়া প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না—দর্শনানন্দও ভোগ করা চাই।"

রামচরিতাবলী অবলম্বনে রচিত 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ' (১৮৮৫), 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১৮৮১) ও 'রামের বনবাস' (১৮৮২)। শেষোক্ত নাটকটিতে বাল্মীকির অনুগতি অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য রাজকৃষ্ণ রামকথার উপ-স্থাপনায় বাংলা রামায়ণকেও উপেক্ষা করেন নি। প্রমাণ 'তরণীসেনবধ' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) নাটকটি। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, তরণীসেন বাল্মীকির কেউ নন, তিনি কৃত্তিবাসেরই মানস সন্তান। স্বাভাবিক কারণেই নাটকটি ভক্তিরস

প্রধান। রাজকৃষ্ণ রায়ের সুখ্যাত নাটক 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮)-র বিষয়বস্তু সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

কৃষ্ণকথার আলাপেও নাট্যকারের উৎসাহ অদম্য। তাঁর অভিনয়-সফল 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকে প্রহ্লাদ হরিভক্ত হলেও সেই হরি নির্গুণ ব্রহ্ম নন, বৈষ্ণবের পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর 'গিরি গোবর্ধন' নাটিকায় কৃষ্ণভক্তি উত্তাল ও উদ্দাম। স্বয়ং ইন্দ্র "শ্রীকৃষ্ণের পদচারণ" করে কৃষ্ণভক্ত হয়েছেন এখানে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'যদুবংশ ধ্বংস' (১২৯০ বঙ্গাব্দ) এবং 'ভীষ্মের শরশয্যা'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) 'ভীষ্মের শরশয্যা' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়ের শেষোক্ত নাটকটির প্রথম অভিনয়ের পূর্বেই। রাজকৃষ্ণের নাটকটির শুরু উদ্যোগপর্ব থেকে, অতুলকৃষ্ণের নাটকের বিষয়বস্তু যুদ্ধপর্বের বিভিন্ন বৃত্তান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রধান নায়ক রাম ও কৃষ্ণ, মূল সুর ভক্তি। বিংশ শতাব্দীতে রচিত নাটকগুলিতেও সেই ধারা বজায় আছে তবে পাশাপাশি যুক্তিবাদের আবির্ভাব এবং ভক্তিবাদের পরিবর্তন ও পরিলক্ষিত হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) রচিত পৌরাণিক নাটক-গুলিতে যুক্তিবাদের উন্মেষ আছে তবে সেই যুক্তি শেষ পর্যন্ত ভক্তির পদপ্রান্তে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো নির্জীব ও নতজানু হয়ে পড়েছে। মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল 'ভীষ্ম' (১৯০৩) এবং 'নরনারায়ণ' (১৯২৬)। 'ভীষ্ম' নাটকটি আগাগোড়া অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন এবং নায়ক অবশ্যই পরম কৃষ্ণভক্ত। নাটকের প্রথম অঙ্কেই কৃষ্ণভক্তির সুরটি পঞ্চমতানে বেজে উঠেছে ভীষ্মের উক্তিতে, "আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করে বসে আছি। আমি সেই উভয় মূর্তিকে এক রথে দেখ্‌ব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকরণ শস্ত্র-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব। সত্যের পথ রুদ্ধ হলে আর ত তাঁরা এখানে আসতে পারতেন না, আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হয়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা করছি।"

দেখা যাচ্ছে যে, নরনারায়ণের ভাবটি ক্ষীরোদপ্রসাদের মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে

ছিল ঐ শিরোনামে নাটক রচনার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই। 'নর-নারায়ণ' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকের প্রস্তাবনায় যুক্তিবাদের উন্মেষ আছে।

দৈব কিংবা পুরুষকার
নিদান বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?

নাটকটির প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে কর্ণের মুখে শুনি—

পদ্মাবতী ! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে
ধনঞ্জয় বাসুদেব নর-নারায়ণ !
বিশ্বাস না করি……"

এই অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে ; নর নয়, নারায়ণেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পুরুষকার নিমজ্জিত হয়েছে ভক্তির অতল সাগরে। নাটকটির সব চরিত্রই কৃষ্ণভক্ত—এমন কি শকুনি পর্যন্ত।[১৮]

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভাবরসে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) নাটকে। তাঁর নাটকে দেখা গেল ভক্তির স্থানে যুক্তি এবং অলৌকিকতার পরিবর্তে আধুনিক মনস্তত্ত্ব। ফলে পৌরাণিক পরিবেশটি বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত। তাঁর রচিত তিনটি পৌরাণিক নাটকের ('পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম') মধ্যে দুটির মূল রামায়ণে, তৃতীয়টির মহাভারতে। 'পাষাণী' (১৯০০) নাটকের অহল্যা পুরাণের কেউ নন, ইন্দ্র তাঁকে প্রতারণা করতে পারেন নি, যৌবন জ্বালায় তিনি স্বেচ্ছায় প্রতারিত হয়েছেন। 'সীতা' (১৯০৮) নাটকে তিনি সীতাকে মহীয়সী রমণীর মর্যাদা দিয়েছেন যিনি স্বামীর সত্যপালনের জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসিনী হয়েছেন। সব দোষ বশিষ্ঠের মাথায় তুলে দিয়ে রামের চরিত্র-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস করেছেন। 'ভীষ্ম' (১৯১৪) পরিণত রচনা এবং নাটকটিতে ভীষ্মের চরিত্র-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ আছে।

বিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৫-১৯৩৪) 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩)-এর খ্যাতি অত্যধিক। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৯২৬) এবং 'শ্রীরামচন্দ্র' (১৯২৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যে কৃষ্ণকথা ও রামকথারই পুনরাবৃত্তি এবং পৌরাণিক অনুবৃত্তি।

ব্যতিক্রমী স্বর শুনি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৪১) রচিত 'সীতা'

(১৯২৪) নাটকে। পৌরাণিক পরিবেশটিকে অক্ষুন্ন রেখেও আধুনিক মানসিকতাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার তাঁর এই নাটকে। লোকাচার এবং শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়েছে।

সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় (জন্ম ১৮৯৯) প্রাচীন পুরাণকে দিয়েছেন নবীন ব্যঞ্জনা। পৌরাণিক নাটকের বুকে ফুটে উঠেছে পরাধীনতার মর্মজ্বালা। তাঁর 'কারাগার' (১৯৩০) কৃষ্ণকথা হলেও এর মূল ভাবটি কিন্তু কৃষ্ণভক্তি নয়, দেশভক্তি। বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিবর্তন এক হিসেবে বাঙ্গালীর ভক্তিসাধনারও ক্রম বিবর্তন। দেবভক্তিতে যার প্রারম্ভ, দেশভক্তিতে তার পরিণতি।

বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান সমস্যা ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণের আনুপাতিক হার নিরূপণের সমস্যা। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। রবীন্দ্রনাথ আপোষপন্থী। ধনে-জিরেকে আস্ত রেখে যে রাঁধুনি সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অবশ্যই সাধুবাদ দেন এবং সেইসঙ্গে তিনি সেই রাঁধুনীরও প্রশংসা করেন যার হাতে মশলাগুলি আস্ত না থাকলেও প্রস্তুত ব্যঞ্জনটি আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেন, ইতিহাসের সঙ্গে ঘর করতে গেলে কল্পনাকে স্বাধিকার প্রমত্ত বা খামখেয়ালী হলে চলবে না। তাকে অবশ্যই সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যেই বসবাস করতে হবে। হোরেস নাটকে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে সম্ভাব্যতার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইতিহাসের ঘটনার অবিকল নকল করা নাট্য-কারের কাজ নয়। ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকারকে অগ্নি থেকে ধূম নয়, অগ্নিকে নিষ্কাসিত করে নিতে হবে। নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সেই ঘটনাগুলিকেই কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবেন যে ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে জীবনের কোনো মহৎ সত্য ধূম থেকে নির্গত অগ্নির মতো প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক নাটকে অতিরঞ্জনের আবশ্যকতা হোরেস স্বীকার করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, সেই অতিরঞ্জন যেন নাটকীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে লোক বিশ্বাসের সঙ্গেও অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনা জায়গা পাবে কিন্তু জায়গা জুড়ে থাকতে পারবে না।

জার্মান সমালোচক লেসিং মনে করেন, ঐতিহাসিক তথ্য নাট্যকারের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য প্রাপ্তির সোপান মাত্র। তবে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যেই যে কল্পনাকে অবস্থান করতে হবে এবং ঘটনাগুলি যে কার্যকারণের অমোঘ নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকবে, লেসিং অবশ্য সে কথাগুলিও জোর দিয়েই বলেছেন।

শিলার ঐতিহাসিক অনুকরণ এবং ট্রাজিক অনুকরণের মধ্যে একটা স্পষ্ট

পার্থক্য তুলে ধরেছেন। ঘটনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য যে অনুকরণ তাই ঐতিহাসিক অনুকরণ: অপরদিকে ঘটনাটির দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করার এবং তাঁদের চিত্তে আনন্দ বা রস সৃষ্টি করার জন্য যে অনুকরণ তাই ট্রাজিক অনুকরণ। অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকারক, নাট্যকার প্লটের স্রষ্টা। একটি অনুকৃতি, অপরটি সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, ইতিহাস তথ্যাশ্রয়ী, নাটক সত্যাশ্রয়ী। সাহিত্যের লক্ষ্য রসের সৃষ্টি, কাজেই সাহিত্যিক জাগতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হলেও, ইতিহাসকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতে আদৌ বাধ্য নন। শিলার মনে করেন যে, যে সাহিত্যের একমাত্র কাজ রসের সৃষ্টি; ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার কাছ থেকে হলফনামা নেবার কোনো যুক্তি নেই।

কোলরিজ ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন ঐতিহাসিক নাটকে কাল-কারণগত অন্বয় করা হয় নাটকীয় কল্পনার সাহায্যে কাব্যিক রীতিতে। এখানেও আসল কথা সেই এক এবং অদ্বিতীয় কথা—ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয়। তবে শেষ কথাটি বোধহয় কল্পনার মুখেই শোভা পায়। ইতিহাসের ইন্ধন যতই পুঞ্জীভূত হোক জীবনরস অর্থাৎ সাহিত্যরসের শিখা যদি প্রজ্জ্বলিত না হয়, তাহলে তা বড়জোর ইতিহাসের নাট্যরূপ হতে পারে, ঐতিহাসিক নাটক 'নৈব চ নৈব'। ভূতের গল্প যেমন শুধু ভূত দিয়ে হয় না, তাকে গল্পও হতে হয়, ঐতিহাসিক নাটকও তেমনি শুধু ইতিহাসের তথ্য দিয়ে হয় না, তাকে নাটকও হতে হয়। ভূতকে বাদ দিয়েও যেমন গল্পে ভৌতিক শিহরণের সৃষ্টি করা যায়, ইতিহাসের তথ্যাদির কিঞ্চিদধিক ব্যত্যয় ঘটিয়েও তেমনি ইতিহাস রস সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ শেষ বিচারে কথাটা বোধহয় দাঁড়ায় এই যে, ঐতিহাসিক নাটকে নাটকের দাবীটাই প্রবল ও প্রধান। তবে সেটা ইতিহাসের দাবীকে আমূল অস্বীকার করে নয়, ছোট শরিকের স্বত্ব স্বীকার করেই। ছোট শরিক কথাটিতে যদি কেউ আপত্তি করেন তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আগমন ঘটে ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান করতে নয়, নাট্যরস আস্বাদন করতে। প্রেক্ষাগৃহ ইতিহাসের আলোচনাচক্র নয়, নাট্যরসের পাকশালা।

তার চেয়েও বড়ো কথা বোধহয় এই যে, ঐতিহাসিক নাটক, বা সেই কারণেই সাহিত্যের যে কোনো শাখার, সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস পাণ্ডিত্য

বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা সমালোচকের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরণ করে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, হতে পারে না। বিশ্বনাথ কবিরাজের প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করে মহাকাব্য রচনা কি সম্ভব? তাছাড়া আর একটি কথাও সবিনয়ে স্মরণীয় যে, ইতিহাস এবং কল্পনার সমানুপাতিক হারের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলেই মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায় না। সর্বাঙ্গসুন্দর ঐতিহাসিক নাটক আক্ষরিক অর্থেই সোনার পাথরবাটি। প্রাচীন আলঙ্কারিক যথার্থই বলেছেন যে, 'সর্বথা নির্দোষস্যৈকান্তমসম্ভবাৎ।'

কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ নয়, বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের পরিচয় গ্রহণই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। কাজেই এ কথা বলেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যেতে পারে যে, কর্পূরবাসিত পরমান্নের ন্যায় ইতিহাস রসের মিশ্রণে নাট্যরস গূঢ় ও গাঢ় হয় নাটকের যে শাখায় তাই ঐতিহাসিক নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক অনস্বীকার্যরূপেই অতীতচারী এবং সেই কারণেই রোম্যান্টিকতার গন্ধবহ। ঐতিহাসিক নাটক আমাদের কঠোর বর্তমানের নাগপাশ বন্ধন থেকে. দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি দান করে। হারানো অতীতকে আমাদের আনন্দিত দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করে। এ সবই সত্য। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনার আর একটি বড় কারণও আছে এবং অন্ততঃ বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, সেটাই সবচেয়ে বড়, সর্বাধিক প্রবল কারণ। বর্তমানের জীবনচিত্রকে সুনির্দিষ্ট দেশকালের প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে তুলে ধরা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরাধীন দেশে কোদালকে কোদাল বলা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তখন প্রয়োজন হয় একটি আবরণের। ইতিহাসের মাটি দিয়ে সেই আবরণটি নির্মিত হয়। অতীতের পাত্র পাত্রীদের জীবন চিত্রে বর্তমানের রুদ্ধ কণ্ঠ সরব হতে সচেষ্ট হয়। পরাধীন দেশের এ এক অনিবার্য বিধিলিপি। বাংলা ও হিন্দী নাট্যসাহিত্যের আদি যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ললাটে এই বিধিলিপি সুস্পষ্টভাবেই মুদ্রিত।

প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমেই পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাদেশিক চেতনা নিজেকে লক্ষণীয়রূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছিল। এর ফলে ইতিহাস যে বেশ কিছুটা স্বেচ্ছাচারী কল্পনার রঙ্গভূমি হয়ে উঠেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এ নিয়ে ইতিহাস-মনস্ক পাঠকের অভিযোগ

থাকতেই পারে কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে, স্বাদেশিকতার এই প্রবল প্রেরণা বাংলা ও হিন্দী উভয় সাহিত্যেই ঐতিহাসিক নাটক রচনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই একই প্রেরণার তাগিদে উভয় ভাষার নাট্যকারগণ রাজপুতানার অতীত ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই উপযুক্ত উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভাষা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

হিন্দী নাট্য সাহিত্যের প্রথম মৌলিক ঐতিহাসিক নাটকরূপে রাধাকৃষ্ণ দাসের 'পদ্মাবতী' (১৮৮২) নাটকটির নামই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের বিকাশ পর্বটিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের কালসীমা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ; দ্বিতীয় পর্বের কালসীমা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং তৃতীয় পর্বটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রথম পর্বটি ভারতেন্দু যুগ এবং দ্বিতীয় পর্বটি প্রসাদযুগ নামেও পরিচিত, কেন না এঁরাই উপরোক্ত যুগের প্রাণ পুরুষ এবং পুরোধা পুরুষ।

ভারতেন্দুর 'নীলদেবী' অবশ্যই ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা পেতে পারে না, কিন্তু ভারতেন্দুই যে হিন্দী নাটকের সূচনা পর্বের প্রদীপ্ত নাট্যকার সে সত্যটিও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের এই প্রথম পর্বটি পরাধীনতার যুগ। বিপন্ন বর্তমান তাই সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়েছে সম্পন্ন অতীতের ঐশ্বর্যসম্ভারের দিকে। হতমান জনজীবনে আশার আলোকবর্তিকা এনেছে ইতিহাসের অন্তঃপুর থেকে। বর্তমান জীবনের সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার আধাররূপেই অতীত নির্বাচিত ও স্বীকৃত হয়েছে এই যুগে। পরাধীন দেশের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক এবং হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের আদি পর্বের সূচনা যে এই পরাধীনতার বেদনাবোধ থেকেই সে কথা অস্বীকার করার কারণ নেই। হতশ্রী ও হতমান জনজীবনে নবজীবনের চেতনা সঞ্চারের অব্যর্থ উপায়রূপেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে।[১] এই পর্বের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনী যে রাজস্থানের প্রচলিত ইতিহাসের অঙ্গ তার অনিবার্য কারণটাও এখানেই। মহারাণা প্রতাপ, মহারাণী পদ্মাবতী, পৃথ্বিরাজ, অমর সিং রাঠোর রাজস্থানের ইতিহাসের এই আকর্ষণীয় ও অদম্য সাহসী চরিত্রগুলি ভারতীয় জনমানসে চিরকালের জন্য শৌর্য ও বীর্যের, স্বদেশানুরাগ এবং সাহসের অমর ও অম্লান প্রতীক হয়ে আছে শুধু ইতিহাসের কারণে নয়,

পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ঐতিহাসিক নাটকেরও কল্যাণে। এই সব মহৎ ও বীর চরিত্রগুলির জীবনচিত্রের মাধ্যমে দেশের ও দশের বর্তমান দুরবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে এবং জনজীবনে স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র বপণের অনতিলক্ষ্য কিন্তু অনস্বীকার্য প্রয়াসও করা হয়েছে। এই যুগের রচিত নাটকে একদিকে যেমন মুসলমান শাসককুলের ধর্মান্ধতা, ক্রুরতা এবং লাম্পট্যের বিশদ বিবরণ উদাহৃত হয়েছে, অপর দিকে তেমনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 'ন্যায়সভা' (১৮৯২)-র মতো নাটকও রচিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ দাস মোগল সম্রাট আকবরের ন্যায়প্রিয়তা ও উদারনীতির জয়গান করেছেন।

শিল্পাদর্শের বিচারে এই পর্বের ঐতিহাসিক নাটকগুলি খুব একটা প্রশংসার দাবী রাখে না। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পরিলক্ষিত হলেও এই পর্বের হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকে প্রাচ্য নাট্যাদর্শেরই প্রায়-ব্যতিক্রম-হীন একনিষ্ঠ অনুসরণ। সংস্কৃত নাট্যরীতি সম্মত 'প্রস্তাবনা'গুলিতে সমকালীন দেশ, ধর্ম তথা সমাজের রূপচিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের উদ্দেশ্যটিও ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধিকাংশ নাটকেই কালব্যত্যয় দোষ লক্ষণীয় রূপেই প্রবল ও প্রকট।

এই যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে আছে প্রতাপ নারায়ণ মিশ্রের 'হঠী হমীর', লালা শ্রীনিবাস দাসের 'সংযোগিতা স্বয়ম্বর' রাধাচরণ গোস্বামীর 'অমর সিংহ রাঠোর ; কাশীনাথ ক্ষত্রীর তিন ঐতিহাসিক রূপকের মধ্যে প্রথম দুই রূপক ; রাধাকৃষ্ণ দাসের 'মহারাণী পদ্মাবতী' ও 'মহারাণা প্রতাপ' এবং পণ্ডিত বলদেও প্রসাদ মিশ্রের 'মীরাবাঈ'। প্রসাদ-পূর্ব যুগে হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের তালিকাটি মোটামুটি এখানেই সমাপ্ত এবং নিরপেক্ষ বিচারে 'মহারাণা প্রতাপ'ই এই পর্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।[২]

এই সমস্ত নাটকে ইতিহাস অপেক্ষা জনশ্রুতিরই জয়জয়কার। স্বীকার করতেই হয় যে, প্রসাদ-পূর্ব যুগের নাট্যকারগণের মধ্যে ইতিহাস-মনস্কতার অভাব ছিল এবং ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে তাঁদের কারুরই রুচি বা প্রবণতা ছিল না।[৩] ফলস্বরূপ অতীতের সুখ্যাত ব্যক্তিত্বগুলি সম্পর্কে লোকমানসে পল্লবিত জনশ্রুতিকেই এঁরা ইতিহাস বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই জনশ্রুতি-নির্ভর ইতিহাসকে অবলম্বন করেই কাহিনীর কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই এই যুগে রচিত অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের

ছায়াটুকু মাত্র অবশিষ্ট, কায়াটি প্রায়ক্ষেত্রেই অন্তর্হিত অথবা অবহেলিত। অবশ্য এই পর্বের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বেশ কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টির গৌরব দাবী করে। রাধাকৃষ্ণ দাসের প্রতাপ, গুলাব সিংহ, মালতী ও পদ্মাবতী; রাধাচরণ গোস্বামীর অমর সিংহ, চন্দ্রাবলী এবং শ্রীনিবাস দাসের রণধীর ইত্যাদি চরিত্রগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে।

হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিতীয় পর্বের প্রবাদ পুরুষ জয়শঙ্কর প্রসাদ। এই পর্বে রচিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটকের তালিকায় আছে জয়শঙ্কর প্রসাদের 'রাজ্যশ্রী' (১৯১৫), 'বিশাখা' (১৯২১), 'অজাতশত্রু' (১৯২২), 'স্কন্দগুপ্ত' (১৯২৮), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯২৯), 'ধ্রুব স্বামিনী' (১৯৩২), পাণ্ডেয় বচন শর্মার 'মহাত্মা ঈসা', গোবিন্দবল্লভ পন্থের 'বরমালা' (১৯২৫); জগন্নাথ প্রসাদ মিলিন্দের 'প্রতাপ প্রতিজ্ঞা' 'গৌতমানন্দ; উদয় শঙ্কর ভট্টের 'সিন্ধু পতন' (১৯৩৩); বৈকুণ্ঠনাথ দুগ্‌গলের 'সমুদ্রগুপ্ত' ইত্যাদি।

এই পর্বের ঐতিহাসিক নাটকের মূল প্রেরণা ইতিহাস না, সমাজ-মনস্কতা ও রাজনৈতিক চেতনা। সমকালের সমস্যাগুলিকে প্রতিবিম্বিত করার এবং সেগুলির প্রতিবিধানের প্রয়োজনেই প্রাচীনকালের পটটি ব্যবহৃত হয়েছে। যুগ-জীবনের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অতীত জীবন-চিত্রের মধ্যে ও মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ঐতিহাসিকনাটক রচনার প্রবল প্রেরণারূপে একদা এই কামনাটিই জয়যুক্ত হয়েছিল। সমকালীন রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার বন্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসকে আশ্রয় করে।

হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের স্মরণীয় স্রষ্টা জয়শঙ্কর প্রসাদ। জয়শঙ্কর প্রাচীন ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি সেই যুগের কাহিনীকেই নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন যে যুগ একদা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে সুখ্যাত।[৪] জয়শঙ্কর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর নাটকে ইতিহাসের মান ও মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করেছেন। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, অতীত ইতিহাসকে নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করেও তিনি তার মধ্যে সমকালীন চিন্তা ভাবনার সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিস্নাত অতীত ইতিহাস বর্তমানের যথার্থ প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রশংসার কথা এই যে, এটা করতে গিয়ে তাঁকে অতীত

ইতিহাসের অবমাননা বা পক্ষচ্ছেদ করতে হয়নি। তাঁর নাটকে ইতিহাসের মর্যাদা এবং যুগের দাবী তুল্যমূল্য পেয়েছে।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে জয়শঙ্করের নাটকগুলি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে। 'অজাতশত্রু'. 'চন্দ্রগুপ্ত' 'ধ্রুবস্বামিনী', 'স্কন্দগুপ্ত' এবং 'রাজ্যশ্রী' নাটকগুলির ঘটনা এবং প্রধান চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাস সম্মত। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অলকা এবং সিংহরণ ধ্রুবস্বামিনী' নাটকের কোমা এবং মিহিরদেব, 'স্কন্দগুপ্ত' নাটকের নায়িকা দেবসেনা এবং আরো দু একটি চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও উঠতে পারে। কেননা ইতিহাসের খাতায় এই সব চরিত্রের নাম লিপিবদ্ধ নেই। স্পষ্টতই এগুলি অনৈতিহাসিক অর্থাৎ কল্পিত চরিত্র। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতেই হয় যে, ইতিহাস এবং নাটক সর্বাংশে এক এবং অভিন্ন নয়। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকেও অনৈতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ করার অধিকার নাট্যকারের আছে যদি তা প্রধান চরিত্রের বা মূল ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক সত্য বা তাৎপর্য পরিস্ফুট করতে সহায়ক হয়। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রয়োজনেই রিক্ত স্থান পূর্ণ করার জন্য নাট্যকারকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। দেখার কথা শুধু এই যে, সেই কল্পনা যেন ইতিহাসকে নষ্ট করার পরিবর্তে পুষ্ট ও স্পষ্ট করে। জয়শঙ্করের কল্পনা ইতিহাসকে নষ্ট করেনি, পুষ্ট ও স্পষ্টই করেছে।

জয়শঙ্করের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে এবং গৌণ ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে কল্পনা নিজের কারুকার্য দেখিয়েছে। যেখানে নাট্যকার কল্পনার যদৃচ্ছ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও চাতুর্যের সঙ্গে ঘটনাগুলিকে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন এবং ইতিহাসকে বিকৃত বা বিপথগামী করার প্রবণতা বা প্রলোভন পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর 'স্কন্দগুপ্ত' নাটকটিতে অনৈতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রের বাহুল্য যাঁদের পীড়িত করে তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই নাটকের প্রধান কার্যটি অবশ্যই ঐতিহাসিক, শুধু কারণ টুকুই কল্পনা। ফলে কল্পনা এখানে ইতিহাসের সুদৃঢ় সৌধটির ক্ষয় বা ক্ষতি-সাধন করেনি।

অন্যান্য শ্রেণীর নাটক রচনা করলেও হিন্দী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপেই জয়শঙ্কর প্রসাদের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা। পরাধীন দেশের লেখকের পক্ষে প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাত

স্বাভাবিক কারণেই কিছু বেশী হয়ে থাকে। গ্লানিময় বর্তমানকে মুছে ফেলার তাগিকেই যেন গৌরবময় অতীতকে সমারোহে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তাছাড়া প্রসাদ রোম্যান্টিক প্রকৃতির লেখক ছিলেন। অতীতের প্রতি রোম্যান্টিক কল্পনার আকর্ষণ অত্যধিক। স্বাভাবিক কারণেই এই রোম্যান্টিক লেখক অতীত পুরাণ এবং ইতিহাসকে আধার ও অবলম্বন করে নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলিতে পৌরাণিক যুগ (জনমেজয় কা নাগযজ্ঞ) থেকে আরম্ভ করে হর্ষবধনের যুগ (রাজ্যশ্রী) পর্যন্ত ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সুবিপুল ভাণ্ডারটিকে সমকালের দৃষ্টিগোচর করার প্রয়াস করা হয়েছে। হিন্দী সাহিত্যের আর কোনো লেখক ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও সৌন্দর্যের এমন অপূর্ব সুন্দর চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না।[৫] তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে সমসাময়িক জীবন-সমস্যা মাঝে মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার প্রকৃতিতে রোম্যান্টিক হলেও অনস্বীর্যরূপেই সমাজ-মনস্ক ছিলেন এবং এই কারণেই ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থেকেও তিনি সমকালের দাবীকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে বর্তমান জীবনের তটভূমি বারে বারে প্লাবিত হয়েছে অতীত ইতিহাসের তরঙ্গস্রোতে। সেই প্লাবনে বর্তমান জীবনের রেখাচিত্র-গুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তাঁর 'ধ্রুবস্বামিনী' একই সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটক এবং সমস্যা নাটক।

এই যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন—গণেশ দত্ত ইন্দ্র, ভঁওরলাল সোনী, চন্দ্ররাজ ভণ্ডারী, জ্ঞানচন্দ্র শাস্ত্রী, বদরীনাথ ভট্ট. জিনেশ্বর প্রসাদ মায়াল, দশরথ ওঝা, জগন্নাথ শরণ, লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ, নখীমল উপাধ্যায়, জগন্নাথ প্রসাদ মিলিন্দ, চতুর সেন শাস্ত্রী, উদয়শঙ্কর ভট্ট, দ্বারিকা প্রসাদ মৌর্য, ঘনীরাম প্রেম, জগদীশ শাস্ত্রী এবং উমাশঙ্কর শর্মা। উল্লেখযোগ্য নাটকের তালিকায় আছে—গণেশ দত্ত ইন্দ্রের 'মহারাণা সংগ্রাম-সিংহ' (১৯২১), ভঁওরলাল সোনীর 'বীরকুমার ছত্রসাল' (১০২৩), চন্দ্ররাজ ভণ্ডারীর 'সম্রাট অশোক' (১৯২১), জ্ঞানচন্দ্র শাস্ত্রীর 'জয়শ্রী' (১৯২৪), বদরী নাথ ভট্টের 'দুর্গাবতী' (১৯২৫) এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯২৮), নখীমল উপাধ্যায় বেচৈনের 'অত্যাচারী ঔরঙ্গজেব' (১৯১৯) ; জিতেশ্বর প্রসাদ মায়ালের 'ভারত গৌরব অর্থাৎ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (১৯২৮), দশরথ ওঝার 'চিতৌড় কী দেবী' (১৯২৮) এবং 'প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক' (১৯৩৫), জগন্নাথ শরণের 'কুরুক্ষেত্র' (১৯২৮),

লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের 'মহারাণা প্রতাপ' (১৯২৯), জগন্নাথ প্রসাদ মিলিন্দের 'প্রতাপ প্রতিজ্ঞা' (১৯২৯), চতুর সেন শাস্ত্রীর 'উৎসর্গ' (১৯২৯) এবং 'অমর রাঠোর' (১৯৩৩), উদয়শঙ্কর ভট্টের 'বিক্রমাদিত্য (১৯২৯) এবং 'দাহর অথবা সিন্ধুপতন' (১৯৩৩), দ্বারিকাপ্রসাদ মৌর্যের 'হৈদার আলী য়্যা মৈসুর পতন' (১৯৩৪), ঘনীরাম প্রেমের 'বীরাঙ্গনা পন্না' (১৯৩৪) জগদীশ শাস্ত্রীর 'তক্ষশীলা' (১৯৩৭) এবং উমাশঙ্কর শর্মার 'মহারানা প্রতাপ'। অবশ্য এই সব নাটকের অধিকাংশই অতীত ইতিহাসের সংলাপ-রূপ মাত্র এবং এগুলিতে জয়শঙ্কর প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব লক্ষণীয়রূপেই প্রবল ও প্রকট।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যের এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের মূল প্রেরণা দেশভক্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। হরিকৃষ্ণ প্রেমী মুসলমান যুগের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে যে নাটক রচনা করেছিলেন তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। শিল্পের বিচারে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূল্য ও মর্যাদা যাই হোক না কেন, এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, দেশভক্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারে সেগুলি সর্বদাই তৎপর ছিল। এই প্রসঙ্গে সেঠ-গোবিন্দদাসের শেরশাহের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শেরশাহ ভারতকেই মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধনা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। তাঁর নিজের ভাষায়, "ম্যাঁ হুঁ হিন্দী. ইসী মুলুক মেঁ পয়দা হুয়া, য়ুঁহী কী আবোহাওয়া মেঁ পলা, য়হীঁ কী মিট্টী সে বনা অউর ইসী মিট্টী মেঁ মিলুঙ্গা। ....হিন্দুস্থান হী মেরে লিয়ে সব কুছ হ্যায়। য়ঁহা কে রহনেবালে চাহে ওহ কিসী ভী মজহব মিল্লত কে হোঁ, মেরে ভাই বিরাদর হ্যায়। ...[৬] এই ভাবে শেরশাহকে এক স্বাদেশিক, অসাম্প্রদায়িক, তেজস্বী বীরপুরুষরূপে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের অন্যান্য আদর্শ জাতীয় চরিত্রের তালিকায় পাই শশিগুপ্ত, সম্রাট অশোক এবং হর্ষকে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি চিরন্তন ভারতীয় মূল্যবোধগুলির ধারক এবং বাহক এই সব চরিত্র। এঁদের মধ্যে সম্রাট অশোকের স্থান সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চে। ভারতবর্ষের স্বপ্ন ও সাধনার মর্মবাণীটি মুখর হয়েছে জয়শঙ্কর প্রসাদের অশোকের মুখে—"অহিংসা অউর প্রেম কা মার্গহী ইস দেশ জম্বুদ্বীপ অউর সারে সংসার কে লিয়ে কল্যাণকারী হ্যায়—আজ নহীঁ তো কাল ইসী মার্গ-সে বিশ্বকল্যাণ সম্ভব হ্যায়।[৭] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বাবদে সম্রাট অশোকই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকেরও

রাজাধিরাজ।

এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, জয়শঙ্কর প্রসাদের পর হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই শূন্য প্রান্তরে ঐতিহাসিক নাটকের ধারা-স্রোতটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র মাথুর এবং মোহন রাকেশ।

বাংলা নাটকের যথার্থ ইতিহাস মধুসূদন থেকে শুরু। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি পুরোধা পুরুষ। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিই বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্যের বেদীমূলে প্রথম আরতি শিখা। টডের রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করে মধুসূদন বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ভাণ্ডারটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। টডের রাজস্থান কাহিনী হিন্দী ও বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বিশ্বস্ত বিচরণভূমি।

মধুসূদনের নাটক রচনার মূল প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য আদর্শে সার্থক নাটকের গোড়াপত্তন করা। তাহলেও লক্ষ্য করতে হয় যে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে স্বদেশপ্রেমের মহিমা ও মর্যাদা প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই বলা যেতে পারে যে, হিন্দী নাট্য সাহিত্যের মতো বাংলা নাট্যসাহিত্যেও স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা নিয়েই ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের পরবর্তী স্রষ্টারূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক রচনার নেপথ্যে ছিল হিন্দুমেলার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। নাট্যকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, হিন্দুমেলার পর দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত করার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই জন্যই তিনি নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তনের প্রয়াস করেছিলেন।[৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশুদ্ধ নাটকীয় প্রেরণাবশে নয়, স্বদেশপ্রীতির আবেশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক নাটকরূপে অভিহিত ও অভিযুক্ত হয়েছে।[৯] এ কথা সত্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমকালের বিশিষ্ট ভাব বা আবেগকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনাকে পরিমার্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে অনৈতিহাসিক চরিত্রেরও অবতারণা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে রোমান্টিক নাটকের তালিকায় স্থান প্রদানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কেন না বিশুদ্ধ

ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শে বিচার করলে বাংলা ও হিন্দী উভয় নাট্য-সাহিত্যের বহু নাটককেই ঐতিহাসিক নাটকের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে নাট্যকার যদি ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দিয়ে সমকালের চিন্তা-ভাবনা-আবেগের উৎসমুখ অনাবৃত করার প্রয়াস করে থাকেন তবে তাকে বাংলা ও হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের অনিবার্য চরিত্র লক্ষণ বলেই মেনে নিতে হবে। জাতীয় ভাব-সাধনায় উভয় নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক নাটকগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, একথাটি স্মরণ রাখলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে রোম্যান্টিক নাটকরূপে অভিহিত করার আবশ্যকতা থাকে না।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার একাধিক অল্পখ্যাত অথবা অখ্যাত নাট্যকার ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪), লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নন্দবংশোচ্ছেদ' (১৮৭৩) ও 'নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা' (১৮৭৬) ইত্যাদি নাটকগুলির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বীকার্য যে, জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই রচনাগুলির যে মূল্যই থাক না কেন, ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে এগুলি নিতান্তই অচল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের পুরু অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত্র এবং এই বীর চরিত্রটি শুধু বাংলা নয়, হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকেরও এক প্রিয় ও প্রার্থিত চরিত্র। এই নাটকে নাট্যকার স্বদেশীভাব উদ্বোধনের জন্য শুধু যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে পরিমার্জিত করেছেন তাই নয়, একাধিক কল্পিত ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটিকেও ইতিহাসের ভূখণ্ড থেকে অন্যত্র অপসারিত করেছেন। 'পুরুবিক্রমের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক (অথবা ইতিহাস নির্ভর জাতীয়তাবাদী নাটক) রচনার প্রয়োজনে টডের রাজস্থান কাহিনীর দ্বারস্থ হন। রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি ও সূচনা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী নাটক' (১৮৭৫) স্বাভাবিক কারণেই মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি। রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর নাটকটির শিরোনাম 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯)। জাতীয়তা-বোধ এই নাটকটি মূল প্রেরণা হলেও নাট্যদ্বন্দ্বটি দেশপ্রেম বনাম স্বাধীন প্রেমকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন এবং স্বদেশ চেতনার বিকাশলগ্নে যেসব ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রেরণা অনুভূত হয়েছিল তন্মধ্যে চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহ এবং মহারাষ্ট্রের বীর শিবাজী সর্বাগ্রগণ্য। বাংলা এবং হিন্দী উভয় নাট্যসাহিত্যেই চরিত্র দুটি সমভাবে স্মৃত এবং সমাদৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকটিতে ইতিহাসের ছায়া আছে, কায়া নেই। এই নাটকে অতীত ইতিহাসের ছায়াতলে নাট্যকারের স্বাধীনতা-স্পৃহার সুখ-স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে গুপ্তযুগ এবং মোগল যুগের কাহিনীই ছিল সর্বাধিক সমাদৃত। ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ এবং বাংলার মুসলমান শাসনকে অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছিল। দেশানুরাগই এই সব নাটকের মূল প্রেরণা এবং নাটক হিসেবে এগুলি প্রশংসার দাবী রাখে না।

বাংলার যশস্বী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম মৌলিক নাটক 'আনন্দ রহো' মোগল যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তাঁর 'চণ্ড' নাটকের কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। তাঁর 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'বাসর' (১৯০৬) এবং 'অশোক' (১৯১১) নাটকগুলিও ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত। এর মধ্যে 'অশোক' নাটকটি ঐতিহাসিক তথ্যভারে যে পরিমাণে পীড়িত, নাট্যরস সৃষ্টিতে সেই পরিমাণেই ব্যর্থ। এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, বাংলা এবং হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অশোকের চণ্ডাশোক এরং ধর্মাশোক—দুটি রূপেরই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ধর্মাশোকের পদপ্রান্তেই শ্রদ্ধার অর্ঘটুকু নিবেদিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকেও এই সত্যই সোচ্চার।

১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের সুখ্যাত 'প্রতাপাদিত্য' নাটকটিকে অবলম্বন করেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগের সূচনা। গিরিশচন্দ্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' এই যুগেরই সৃষ্টি। সিরাজ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে নাট্যকার যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তার একমাত্র তুলনা মেলে হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের জয়শঙ্কর প্রসাদের মধ্যে। জয়শঙ্কর প্রসাদের মতো গিরিশচন্দ্রও নাটকের ভূমিকায় তাবৎ ঐতিহাসিক সূত্র নির্দেশ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে সিরাজ প্রজাবৎসল, পত্নীপ্রেমিক, স্নেহময় পিতা এবং আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক শাসকরূপে চিত্রিত। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা অতঃপর রচিত বাংলা

ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্র নির্দেশিত রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইতিহাস যাই বলুক না কেন, বাংলার শেষ স্বাধীন প্রজাবৎসল শাসক এবং অন্যায় ষড়যন্ত্রের শহীদ সিরাজকে জনমানসে স্থায়ী আসন দানের নেপথ্যে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলির দান অসামান্য। গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসিম' (১৩১৩ সাল) এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৩১৪ সাল) নাটক দুটিতেও অনুরূপ প্রশ্রয়ের পরিচয় আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে জোয়ার এসেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' তারই প্রথম ঢেউ। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী' (১৩১৪), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), বাংলার মসনদ' (১৩১৭), 'আলমগীর' (১৩৩৮) ইত্যাদি। স্বীকার করতেই হয় যে, একমাত্র 'আলমগীর' ছাড়া আর কোনো নাটকে নাট্যকার লক্ষণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হননি।

এক হিসেবে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক মোগল ইতিহাস, বিশেষতঃ এই ইতিহাসের সর্বাধিক বিতর্কিত চরিত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে ঋণী। কারণ এই চরিত্রটি একাধিক নাট্যকারের নাট্যকল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের আলমগীর এক অপূর্ব দ্বন্দ্বময় চরিত্র যদিও সত্যের খাতিরে স্মরণ রাখতে হয় যে, ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' এবং 'সাজাহান' নাটকের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যটি প্রশংসনীয় রূপেই প্রস্ফুটিত।

বাংলা ঐতিহাসিক নাট্য সাহিত্যের আসরে সর্বাধিক উজ্জ্বল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শক্তি ও সৃষ্টির সাম্যে এবং সর্বোপরি জনপ্রিয়তার নিরিখে হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি নাম যুগপৎ উচ্চারণের যোগ্যতা রাখে। হিন্দীর তুলসীদাস ও বাংলার কৃত্তিবাস বা হিন্দীর প্রেমচন্দ ও বাংলার শরৎচন্দ্রের মতো হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের জয়শঙ্কর প্রসাদ ও বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজ নিজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রাধিপতি এবং উভয়েরই অবস্থান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সব ঐতিহাসিক নাটক মোগল যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র 'চন্দ্রগুপ্ত'। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ইতিহাসের মর্যাদা এবং নাটকের মান সমভাবে রক্ষিত। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাস ও নাটকের বেণীবন্ধন সার্থক ও সুন্দর।

'তারাবাই' (১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক এবং অত্যন্ত অপটু রচনা। তবে ভূমিকাটি মূল্যবান। নাট্যকার বলেছেন, "এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণকবি দ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে।...আশ্চর্যের কথা এই যে, এ মহিমময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকে বিষয়ভূত হয় নাই।

আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত 'রাজস্থান' হইতে লইয়াছি তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ নাটক ইতিহাস নহে। কোন কোন সমালোচক এইরূপ অনৈক্য লইয়া অনেক কালি ও কাগজ খরচ করেন দেখিয়া এ কথাটি বলা দরকার হইল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকের কাহিনী টডের রাজস্থাননির্ভর। পুনরুক্তি হলেও বলা প্রয়োজন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূল প্রেরণা ইতিহাস-প্রীতি নয়, স্বদেশ প্রীতি। রাজপুতানার গৌরবদীপ্ত অতীত ইতিহাস হিন্দীর মতো বাংলা ঐতিহাসিক নাটকেরও আনন্দিত আশ্রয়, একনিষ্ঠ অবলম্বন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটকটিও টডের রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার এবং 'সাজাহান' (১৯০৯) তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। অভিনয় ও জনপ্রিয়তার বিচারেও নাটকটির স্থান সর্বোচ্চে। মোগল যুগের প্রায় শতবর্ষের ইতিহাস তুলে ধরেছেন নাট্যকার তাঁর 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'নুরজাহান' এবং সাজাহান' নাটকগুলির মধ্যে। প্রথম তিনটি নাটকের কাল মোগলযুগ হলেও সেগুলি রাজপুত বীরদের গাথা, শেষ দুটিতে মোগল কথা। 'নুরজাহান' এবং 'সাজাহানে' তিনি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন এবং সেই সাম্রাজ্যের নানা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস এখানে প্রবলভাবেই উপস্থিত তবে নাটকের দাবীকে খর্ব বা ক্ষুণ্ণ করে নয়। প্রথম তিনটি নাটকে নাট্যকার আদর্শবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন, শেষ দুটিতে নাট্যরস সৃষ্টির প্রতি তিনি নিবদ্ধদৃষ্টি।

দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনা মৃত ইতিহাসের বুকে শুধু প্রাণ সঞ্চার করেনি তার মধ্যে যুগোচিত ভাব ও ভাবনাটিকেও ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। হিন্দীর

ঐতিহাসিক নাটকে এই কর্মটি সাধিত হয়েছে জয়শঙ্কর প্রসাদের লেখনীতে। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' মূলতঃ একই সঙ্গীত, একই রাগে ভিন্ন ভাষায় গীত। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য কাহিনীটি সমগ্র উত্তর ভারতে-যে ভাবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তার মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটির দান অসামান্য।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক নাট্যকার রূপেই সমধিক পরিচিত হলেও ঐতিহাসিক নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'রাখী বন্ধন' রাজপুতানার সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'অযোধ্যার বেগম' তাঁর আর একটি সুপরিচিত ঐতিহাসিক নাটক। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা এবং বাংলার নবাব মীরকাসেমের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। তবে নাটকটিতে ইতিহাস অপেক্ষা কিম্বদন্তীরই প্রাধান্য।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর সুখ্যাত 'দিগ্বিজয়ী'র জন্য বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। নাটকটি নাদির সাহের দুষ্কর্মের ইতিহাস এবং তাঁর গৃহদাহের কাহিনী। নাটকটি সম্পর্ক নাট্যকারের দাবী—"নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোন স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকেও অবহেলা করি নাই। ..."

এই যুগে আরো যাঁরা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত বসু রায় এবং মনোমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। নিশিকান্ত বসুর 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটি বাংলায় বর্গী আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত। মনোমোহন বসুর 'রিজিয়া' ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এগুলিতে ইতিহাসের তথ্য আছে, নাটকের সত্য নেই।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিজেন্দ্র-পরবর্তী যুগে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একটি সুখ্যাত নাম। তাঁর 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) মহারাষ্ট্রের বীর শিবাজীর জীবনচিত্র। স্মরণ করতে হয় যে, হিন্দী বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের একান্ত আপনজন এবং অত্যন্ত অনুরাগের পাত্র মহারাষ্ট্রের এই মহানায়ক। এই নাটকের শিবাজী যুগোপযোগী দেশাত্মবোধেরই মূর্ত প্রতীক। পরধর্ম সহিষ্ণুতা, হিন্দু মুসলমান—ঐক্য স্থাপন যুগেরই বিশিষ্ট দাবী। তাই শিবাজীর বিরোধ মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গে নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধর্মরাজ্যের সংজ্ঞা, তাঁর নিজের ভাষায়;... "যার প্রজারা জাতি

ধর্ম নির্বিশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।"

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা'র জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। এই নাটকের কাহিনী সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির দিন (১৫ এপ্রিল ১৭৫৬) থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুদিন (৪ঠা জুলাই ১৭৫৭) পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা ও বাঙালীর স্বদেশপ্রেমের পুরোধা পথিক রূপেই সিরাজ বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে আদ্যন্ত বিরাজমান।

আধুনিক কালে ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে মন্মথ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'অশোক' (১৯৩৩) একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক। চণ্ডাশোক কিভাবে ধর্মাশোকে পরিণত হলেন তারই কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকটিতে ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ যেমন আছে তেমনি আছে নাট্যিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অপূর্ব সমাবেশ। তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, ইতিহাস রসকে অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রেখেও নাট্যকার এই নাটকে জীবনরসের গাঢ়তা ও গূঢ়তাকে অপূর্বভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নাট্যকারের 'মীরকাশিম' (১৯৩৮) দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হলেও ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। নাট্যকারের দাবী "এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" নাট্যকারের বিশ্বাস মিথ্যা নয়। মন্মথ রায়ের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' এবং 'অমৃত অতীত' নাটক দুটি উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল পরগণার কাহিনী অবলম্বনে প্রথম নাটকটি রচিত। দ্বিতীয় নাটকটির উপজীব্য অষ্টম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের ইতিহাস। তবে 'অমৃত অতীত' শুধু ইতিহাস নয়, কিছুটা রূপকও। সমকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ভুল প্রতিধ্বনি অতীতের কণ্ঠস্বরে।

আধুনিক যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাট্যকারগণের মধ্যে নিশিকান্ত বসু রায়, রমেশ গোস্বামী, হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতে হয়। নিশিকান্ত বসু রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'দেবলা দেবী' এবং 'বঙ্গে বর্গী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' এবং হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'পলাশী' ইতিহাস নির্ভর নাটক। মহেন্দ্র গুপ্ত ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা রূপে খ্যাত। তবে ইতিহাস অপেক্ষা সমকালের দাবীটাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী তাঁর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। তাঁর 'টিপু সুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি নাটকগুলি সমকালের দাবী মানতে গিয়ে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক

নাটকের পরিচয় হারিয়ে ইতিহাস নির্ভর রোম্যান্টিক নাটক রূপে আত্ম পরিচয় দিয়েছে।

এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আধুনিক কালে হিন্দী এবং বাংলা উভয় নাট্য সাহিত্যেই ঐতিহাসিক নাটকের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আধুনিক কালের জলন্ত সমস্যাগুলি সামাজিক নাটকের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করছে। পরাধীন দেশে এসব অনেক কিছুর জন্য ইতিহাসের অবগুণ্ঠনটির প্রয়োজন ছিল। আজ আর তার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ঐতিহাসিক নাটক আজ এক বিলুপ্ত প্রজাতি। তবে জোয়ারের দিন যে আর নেই সে কথা মানতেই হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অনুরাগের কথা সর্বজনজ্ঞাত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শুধু যে তাঁর অনুরাগসিক্ত দৃষ্টির আনন্দ-বর্ধন করেছে তাই নয়, সেই সাহিত্য তাঁর দৃষ্টিস্নাত হয়ে নূতন মহিমা ও মধুরিমাও লাভ করেছে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের কাছ থেকে যে বার্তা তিনি পেয়েছেন বা তার যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা একান্তরূপেই একালের মহাকবির বার্তা ও ব্যাখ্যা, সেকালের 'মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।' কিন্তু সে প্রশ্ন থাক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মহাকবির চিন্তা ভাবনার পরিচয় গ্রহণই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

প্রথমেই একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের মতো মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যও তাঁর সাধনা ও সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। উভয়ক্ষেত্র থেকেই তিনি উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তা অনুকরণ হয়নি. হয়েছে স্বীকরণ। সব উপাদান উপকরণই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার রসে জারিত হয়ে এক অপূর্ব নূতন বস্তুতে পরিণত হয়েছে যা সর্বাংশে রাবীন্দ্রিক। বীজটি যেখান থেকেই আনা হোক না কেন, তার গাছ এবং ফুলটির ষোল আনা মালিকানা তাঁর। তৃতীয়তঃ মধ্যযুগের কাব্যসাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে প্রশংসা বা পরিবাদের সুরটি শ্রুত হয় তার প্রকৃত কারণটি সেই কাব্যদেহে নয় রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে। মনন এবং গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পথ হেঁটেছেন নিজস্ব প্রতিভার আলোকে। এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলির মধ্যে আমরা শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নয়, তাঁর মুখটিকেও প্রত্যক্ষ করি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা — মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্য, তন্মধ্যে শেষোক্তটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতার কথা আমরা জানি। তবে স্মরণ রাখতে হবে, কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতা নয়, নিষ্কলুষ ও নিরুপম মানবিকতাই এই দুর্বলতার একমাত্র কারণ। মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে তাঁর অনীহার কারণটিও এখানেই। তাঁর দৃষ্টিপথ অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, প্রবল শক্তিমদ মত্ততার নির্বিচার ও বিবেকহীন স্বেচ্ছাচারে মানবিকতা সেখানে শুধু যে বিপদ-গ্রস্ত তাই নয়, সম্পূর্ণরূপেই পর্যুদস্ত। তিনি বলেছেন, "বাংলার মঙ্গলকাব্য-গুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয়, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশী তৃপ্তি দিতে পারেন তাহলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উলটো। এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কি। গায়ের জোর। কি উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তারপরে যে সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে লজ্জিত কবি কৈফিয়ৎ দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কি করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "···মঙ্গল গান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমের স্বপ্ন।"[২] চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই সব হতভাগাদের স্বপ্ন থেকেই এই কাব্যধারার সৃষ্টি। স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নতেই যে তার অন্ত, তার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলছেন, "ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো ; কিন্তু হল কী। হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজ্যের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং

হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমন ভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে—মা মা মা।"[৩]

মঙ্গলকাব্যে মানুষের এই দৈন্য ও দুর্গতির উৎস অনুসন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেকালের রাজনৈতিক দুর্যোগের পটভূমিকায়। বলেছেন, "যখন মোগল পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। যেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তাহলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয়নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চার দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে ; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পূজা আদায় করবই। নইলে? নইলে আমায় প্রেস্টিজ যায়। ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। সাময়িক পত্রে একাধিক লোক প্রতিবাদ লিখেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি রাজ্যসভার কবি ভারতচন্দ্রের

অন্নদামঙ্গলে, শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা। ‥যে সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থান-পতন বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত হত। তখন চারদিক থেকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার কোন্‌দিন যে কী আছে, তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরে বিশেষ করে আঘাত করত।"[৫] মঙ্গলকাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উদ্ধৃতি এবং উদাহরণই মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল থেকে, কারণ এই কাব্যটি (বঙ্গবাসী সংস্করণ) কবি ভালো করেই পড়েছিলেন এবং স্থানে স্থানে নিজের মন্তব্য নোট করেও রেখেছিলেন। তবে মঙ্গলকাব্যের সব শাখার মধ্যেই তিনি একদিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা এবং অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফল কামনার অশুভ আঁতাত লক্ষ্য করে আতঙ্ক বোধ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়।.........মনসামঙ্গলের মধ্যে এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর ও ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।"[৬] বলাবাহুল্য যে, মানবতার এই লাঞ্ছনা কবিকে পীড়া দিয়েছে এবং যে কাব্যে এই লাঞ্ছনার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তা তাঁর চিত্তের প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। যে অবস্থায় এবং

মানসিকতায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও সৃষ্টি তন্মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল না বলেই তাঁর ধারণা। তিনি বলেছেন, "সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগবর্তী বেষ্টনীর মধ্যে নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখন সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে, তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখ ক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ, কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।"[৭] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যে সমসাময়িক দেশকালের প্রভাব ও পরিচয় প্রকট হলেও এই কাব্যশাখায় চিরন্তন সাহিত্যের ফুলটি প্রস্ফুটিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মতে মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধায় প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।[৮]

অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের কথা কবির চিন্তাভাবনায় বারংবার ছায়াপাত করেছে কিন্তু কাব্য দুটি সম্পর্কে প্রশংসার কথা তাঁর কণ্ঠে খুব বেশী শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এই দুটি কাব্য সম্বন্ধে তাঁর বিরাগের প্রধান কারণটি এই যে, "অন্নদামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল বাংলার ; তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে আকস্মিক প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবন যাত্রা।"[৯]

বস্তুতান্ত্রিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের বিবরণসর্বস্ব বাস্তবতা কবির বিরাগের কারণ হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দুটি পরিচিত পংক্তি (দুঃখ কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥) সম্পর্কে ১২৯৩ সালে তিনি বলেছিলেন, "আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই, ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি

কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'—সে তো আরো কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও... ... ...ইহা কাব্য নহে।"[১০] চার দশকের ব্যবধানেও দেখি তাঁর উপরোক্ত ধারণা থেকে একচুলও সরে আসেন নি। পৃথক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আর একজন কবি দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনা করেছেন। বিষয় হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়—তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়—দরিদ্র নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন...... ।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না, ভাব ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটা মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে'—দারিদ্র্য দুঃখের বিষয় হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।"[১১]

চণ্ডীমঙ্গলের কমলে-কামিনীর চিত্রটির মধ্যেও প্রশংসার কোনো কিছু পরিলক্ষিত হয়নি কবির চোখে। তিনি বলেছেন, "কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী যোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে. আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার এবং উদ্গীরণ কোনমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।"[১২]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিত্বের প্রশংসা না থাক, তাঁর চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য সম্পর্কে দু একটি ভালো কথা কিন্তু কবির কণ্ঠে শোনা গেছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান এই সিদ্ধান্তটির স্বপক্ষে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বৃহৎ স্থাণু-মাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।"[১৩] কৌতুকের বিষয় এই যে, অন্যত্র তিনি চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুরুষ চরিত্রকেই সাহিত্যে সার্থক চরিত্রসৃষ্টির উদাহণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে,

সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে ; এরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটা বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটা কৌতুক রস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশী কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকুমাত্র নয়—এই জন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"[১৪] দীর্ঘকাল পরে ভাঁড়ুদত্তের কথা কবির স্মরণপথে আবার উদিত হয়েছে এবং কবি বলেছেন, "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞানকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।"[১৫] দেখা যাচ্ছে যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভাঁড়ুদত্ত শুধু যে কবির চোখে ভালোলাগার মায়াঞ্জন মাখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তাই নয়, কবির সাহিত্যসম্পর্কিত একটি ধারণাকে বিপর্যস্ত করে দিতেও সমর্থ হয়েছিল।

সাহিত্যের শোভাযাত্রায় কবিকঙ্কণচণ্ডীর যে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, সেই শোভাযাত্রার-পথের সিংহভাগ চিরকাল ধরে জুড়ে থাকার অধিকার সে অর্জন করতে পারে নি। তাঁর ভাষায়—"আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তা হলে কি হত। পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরী ছাঁচে ঢালা হত, তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণচণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে। কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তা হলে সেই পথটাই মাটি আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে মানুষ থাকবে না।"[১৬]

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মতো ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যটির সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়েনি—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিত পরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়।" অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেননি।"[১৭]

ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পসুষমার প্রশংসা করেছেন কবি কিন্তু প্রকারান্তরে এই কাব্যের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশও করেছেন। বলেছেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"[১৮]

মঙ্গলকাব্য ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-মননে, বৈষ্ণব কাব্য কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর মননে, স্মরণে এবং স্বীকরণে। বৈষ্ণব ধর্মের মানবিক ঐশ্বর্য এবং বৈষ্ণব পদের কাব্যসৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই সূত্রেই শ্রীচৈতন্যের কথাও তাঁর ভাবনায় বারংবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছে এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, বর্ষাঋতুর আকাশের মতো শ্রীচৈতন্যের সময়ে বাংলাদেশের আকাশ ও ভাবের বাষ্পে পরিপূর্ণ ছিল, তাই তখন দেশের যেখানে যত কবির মন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সকলকেই সেই ভাবের বাষ্পকে আকর্ষণ করে কত অপূর্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে তাকে দিকে দিকে বর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে আবাল্য বৈষ্ণবপদাবলীর রসে নিমগ্ন ছিলেন এবং এ কাব্যের বার্তাটিকে তিনি যে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন মুক্ত করে একান্তরূপেই নিজের মানসিক বৃত্তি ও রুচির আনুরূপ্য দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন হেমন্ত-

বালা দেবীকে একটি চিঠিতে সেকথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রস-মাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করবে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি।"[১৯]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) অথবা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় সঙ্কলিত 'পদরত্নাবলী' (১২৯২) র প্রসঙ্গে না গিয়েও রবীন্দ্রনাথের পদাবলী প্রিয়তার অজস্র প্রমাণ তুলে ধরা যায়। তাঁর মানসগঠনে উপনিষদের প্রভাব যতখানি বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব তার চেয়ে একটুও কম নয় এবং যতদূর মনে পড়ছে এ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে যদিও এই মুহূর্তে তা হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না।

বৈষ্ণবের ভগবদ্‌প্রেমের মানবিক রূপটি তাঁকে নিরতিশয় মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছেন, "বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না; সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"[২০] বলা বাহুল্য যে, এই ব্যাখ্যা কালিদাসের মেঘদূত-ব্যাখ্যার মতোই বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক এবং রবীন্দ্রনাথের স্মরণে স্বীকরণে এই ব্যাখ্যাটিকেই প্রত্যক্ষ করি নানা রূপে নানা ভাবে।

বৈষ্ণব কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার-সুর সব কিছুই কবির প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিল। ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে।"[২১] অন্যত্র তিনি বলেছেন, "পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক উত্তমর্ণ গণনায় দুটি নাম অবশ্যস্বীকার্য—কালিদাস ও বৈষ্ণব পদাবলী। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, উপমার সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সঙ্গে বৈষ্ণব পদকর্তাকেও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, "সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।......আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কি একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, এই জন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে-একটি অনির্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কোনো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না।"[২৩] উপমা-রূপকের আলোচনায় এবং সাহিত্যে সেগুলির সার্থকতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বারে বারে বৈষ্ণব কবিকেই স্মরণ করেন। বলেন, "উপমাতুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরাম দাস কী না বলিরাছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।"[২৪] সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্যাপতির একটি পরিচিত পদ্যাংশ তুলে ধরে তিনি বলেন, "গোধূলি বেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন একে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।"[২৫]

রসের বিচারেও তিনি সাক্ষ্য মেনেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর। "নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে।"[২৬] সাহিত্যের সেই সুগভীর ব্যঞ্জনাধর্মের কথা বলতে গিয়ে কবি জ্ঞানদাসের দুটি সুপরিচিত পংক্তি স্মরণ করেছেন।

ব্রজবুলি ভাষা শিক্ষার জন্য কবির অধ্যবসায়ের কথা আমরা জানি। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ভাষাটি অনুভূতির অসাধারণতা প্রকাশের অনুকূল বলেই তিনি অভিমত দিয়েছেন।[২৭]

কবির মননে এবং সৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলী বারংবার ছায়াপাত করেছে এবং

প্রতিবারেই নব নব অর্থগৌরবে দীপ্ত ও রমণীয় হয়ে উঠেছে। একই কবির একই পদ বিভিন্ন অনুভবে ও অনুষঙ্গে কত অভাবনীয় চমৎকারিত্ব লাভ করেছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।[২৮] বর্ষা এবং বিরহের প্রসঙ্গে কালিদাস এবং বিদ্যাপতির কথা রবীন্দ্র-মননে ও সৃষ্টিতে সর্বদাই অক্ষয় ও অমলিন। ১৩১৩ সালে তিনি বলেছেন, "বর্ষার চারিদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে"।[২৯] আবার জীবনের অপরাহ্নে যখন তিনি কাব্য রচনা করেন তখনও শুনি—

"প্রবল বরিষণে
নদী পারের নীলিমা হায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারালো সীমা,
হারালো পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।"[৩০]

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস ইত্যাদি বৈষ্ণব পদকর্তাগণের কথা ও উদ্ধৃতি নানা ভাবে ও অনুভবে রবীন্দ্র মনন ও সৃষ্টিতে সোচ্চার ও সমুজ্জ্বল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে একাধিক প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি এবং উভয়ের মধ্যে চণ্ডীদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলে ঘোষণা করেছেন। যে ব্যঞ্জনাধর্ম মহৎ কাব্যের প্রাণ চণ্ডীদাসের পদে তা প্রতি পদে উপলব্ধ এবং সেটাই কবির প্রীতি ও প্রশংসার প্রধান কারণ। 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্নরূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। এই জন্য ছন্দ-সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এই জন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের

আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সংগীতধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে কিন্তু সুখদুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ নয় দুঃখ, হয় মিলন নয় বিরহ, এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ। চণ্ডীদাসের মতো সুখেদুঃখে বিরহ মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেই জন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।"

প্রবন্ধটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে, প্রগাঢ় প্রেমের রূপ-চিত্রণেও বিদ্যাপতির অবিসংবাদিত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপতি ভেল" পদটির আলোচনা-সূত্রে তাঁর মন্তব্য – "নবীন প্রেম একবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।"

এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, শাক্তসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে বিরূপতার মাত্রা বেশী হলেও শাক্তপদাবলীর মাধুর্যের ভাবটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহ-লক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে – মাতা পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই মঙ্গলসুন্দর রূপে – দরিদ্র বাঙালীর ঘরে.... রসসঞ্চার করিয়াছেন···মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে ও স্নিগ্ধরসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।"

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যচর্চার কথা উল্লেখ করা আবশ্যক বলেই মনে করি। স্বীকার্য যে, লোকসাহিত্য সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট সন তারিখ খুঁজে বের করা আদৌ অসম্ভব। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসটি স্মরণে রেখে, এগুলিকে মধ্যযুগের সৃষ্টি বলে গ্রহণ করলে খুব একটা অপরাধ হবে না বলেই আশা করি। এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথই আমাদের লোকসাহিত্য চর্চার উৎসাহী পথিকৃৎ। তিনি বলেছেন, "আমাদের হাতে যে ছড়াগুলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কি নূতন নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না। কিন্তু দু-এক শত বৎসরে এ-সকল কবিতার

বয়সের কমবেশী হয় না। আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীর কবি যে ছড়া রচনা করিয়াছে তাহাকে এক হিসাবে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়; কারণ, গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী সাহিত্য বহুকাল বিনা পরিবর্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।"৩১

রবীন্দ্রনাথ লোকগীত এবং ছড়া দুইই সংগ্রহ করিছিলেন কিন্তু সবগুলিকেই তিনি ছড়া বলেই উল্লেখ করেছেন। ছড়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিমত এই যে, এই অলিখিত সাহিত্যের আধারেই মধ্যযুগের বাংলার লিখিত সাহিত্যের সৌধ গড়ে উঠেছে এবং মধ্যযুগের লিখিত বা শিষ্ট সাহিত্যের (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "উচ্চ সাহিত্যের") যথার্থ পরিচয় পেতে হলে লোকসাহিত্যের (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নিম্ন সাহিত্যের") সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেছেন, "নীচের সহিত উপরের এই যে যোগ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু, অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভায় কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।"৩২

ছেলেভুলানো ছড়া ছাড়া অন্যান্য ছড়া (গীত) গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ভেদে দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করেছেন—হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। তাঁর নিজের ভাষায়—"হরগৌরী-বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্য বন্ধন, আর এক দিকে সমাজ বন্ধনের অতীত প্রেম।"

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, "হরগৌরীর সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি"তে রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একদিকে

জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর যে বর্ণনা আছে তাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নেই, তাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। "তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।"

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনাগুলির বিষয় 'সর্বগ্রাসী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেম।' এই প্রেম গানের বার্তা সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক বা সমাজের পক্ষে অহিতকর বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। পক্ষান্তরে তিনি মনে করেন যে, "আমাদের দেশে যখন বন্ধনবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে কখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য। বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন।"

সত্যনিষ্ঠ গবেষকের মতোই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, "বাংলার গ্রাম্য-ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় অল্প।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপটুকু অকারণ বা অবান্তর নয়। তিনি বলেছেন, "রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত।...সর্বতো-ভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেলেভুলানো ছড়াগুলির আদি সংগ্রাহক ও অদ্বিতীয় সমালোচক। মায়ের মুখ থেকে সাহিত্যের বুকে এগুলিকে সগৌরবে অভিষিক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার সবটুকু কৃতিত্বই তাঁর। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নবরসের অতিরিক্ত

যে আরো একটি রস আছে—সেই অত্যন্ত সরস, স্নিগ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গতিহীন বাল্যরসটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তাঁরই কল্যাণে। তাঁর মতে, "এই ছড়াগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতরস জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নুপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে।"

ছেলেভুলানো ছড়াগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্ন কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন!

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ "উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞান ও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।"

এক অসামান্য প্রতিভার আলোকপাতে আমাদের লোকসাহিত্যের একটি দিক এক অভাবনীয় সামাজিক তাৎপর্য ও এক অপূর্ব সাহিত্যিক মহিমা ও

মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলার লোক-সাহিত্যের আর একটি ধারা—বাউল গান সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাই। বাউল গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ভারতী পত্রিকায় (১৯২০ বৈশাখ) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, লোকসাহিত্যের মধ্যেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথা স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় প্রকাশ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাউল গান সংগ্রহও করেছিলেন এবং বাউলদের সাধনাদর্শনের সঙ্গে নিজ সাধনাদর্শের একটি নিগূঢ় সাদৃশ্যও উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের রচনায় তিনি প্রয়োজন মতো বাউলগানের পদ উদ্ধৃত করেছেন এবং বাউলসুরে গানও রচনা করেছেন। এ সবই বাউল গানের প্রতি কবির গভীর অনুরাগের অনস্বীকার্য প্রমাণ।

বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে হৃদয়ের সহজ অনুভূতি ও সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানবধর্মের অনুপম উপলব্ধির কবিত্বময় প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, এর মধ্যে ভারত ইতিহাসের মৌল অভিপ্রায়টির অপূর্বসুন্দর প্রকাশও দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়ের।...এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দুমুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।" বাউল দর্শনটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কত গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর 'The Religion of Man' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দুটিতে তার অজস্র প্রমাণ ও পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়' গানটি কবির চিন্তাভাবনায় বারংবার ঝংকৃত হয়েছে। ১৩১৪ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে গানটি উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যত্র এই গানটির মধ্যে তিনি উপনিষদের বাণীর লোকায়ত প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে বলেছেন, "এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষির সঙ্গে একমত; আমাদের কাব্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়; তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন, বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন।"

বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্যসাধনার শেষ সুর কবিগান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবি-ওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবিগানও সেইরূপ। এক সময় বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়েছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"[৪২] রবীন্দ্রনাথের মতে, কলহ ছলনাই কবিগানের একমাত্র বিষয় এবং "উপস্থিতমত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভাব লইয়া কবিদলের গান—ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুঁটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে; ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধে তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।"[৪৩]

কবিগানের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য কাব্যশ্রীর নিতান্ত অসদ্ভাব লক্ষ্য করেও এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করে পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করেছে এই গানগুলি তারই প্রথম পথপ্রদর্শক।

সীমান্ত বাংলার লোকগীতে ননদিনী কথা

ক্রন্দনরতা ফুল্লরাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে কালকেতু একদা বলেছিল—

'শাশুড়ী ননদ নাই নাই তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।'

সেকালে বধূজীবনের মূর্তিমান পাপগ্রহ ছিল এই তিনটি প্রাণী—শাশুড়ী, ননদ এবং সতীন। একালেও অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রথমার ভূমিকা যে অদ্যাপি অপরিবর্তিত সংবাদ-পত্রের সর্তক পাঠক মাত্রেই সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য। দ্বিতীয়াও যে নখদন্তহীন নয় অন্ততঃ সাম্প্রতিক কালের একটি কুখ্যাত বধূহত্যার ঘটনায় সেকথা সন্দেহাতীত রূপেই প্রমাণিত। সীমান্ত বাংলার লোকগীতে শাশুড়ির যে উল্লেখ পাই তাতে কালকেতুর বক্রোক্তির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে। টুসুগীতের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, বধূ নির্যাতনে তিনি প্রচণ্ড পারঙ্গমা এবং এ বাবদে অবশ্যই প্রথমা।

ই চালের পুই সে চালের পুই
পুইয়ে ধরে মেচড়ি
আর যাব না শশুর ঘরকে
ধইরে মারে শাউড়ি।

শারীরিক নির্যাতনে শাশুড়ির যে ভূমিকা মানসিক নির্যাতনে সেই ভূমিকা ননদিনীর। সীমান্ত বাংলার লোকগীতে ননদের সঙ্গে নববধূর সম্পর্ক অহিনকুল না হলেও আদায় কাঁচকলায় অবশ্যই। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না এবং সে কারণেই একের অদর্শনে অপরের আনন্দ ও আহ্লাদও চাপা থাকে না।

আশ্চর্য এই যে, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকগীতে দাদা বা ভাইটির জন্য বোনটির প্রাণে স্নেহ ভালোবাসার সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু তার

বৌটিকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মনস্তত্ত্বের কোন গভীরে এই মানসিকতার মর্মমূল তার কিছু ইঙ্গিত পাই নিম্নোক্ত বিবাহ গীতটিতে—

পিপড় পাতা লড়ে চড়ে
দাদার মনে খনেক পড়ে গ
আপনার বহিন পরকে দিয়ে
পরের বহিন ঘরে গ।

যে ঘরে একদা ছিল তার একচ্ছত্র অধিকার, যে ঘরের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক সেই ঘর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে অথচ অন্য একটি ঘরের সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি মেয়ে এসে তার সেই শৈশব-কৈশোরের রাজধানীতে রাজরাণী সেজে বসবে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। নববধূ তাই কোনদিনই ননদের চোখের কাজল হতে পারল না, চোখের বালি হয়েই রইল।

অপর দিকে বৌদি বা ভাজের কাছেও ননদ চক্ষুশূল ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু যে 'প্রতিবোল ননন্দ কাছে' তাই নয়, স্বামীর সংসারে ষোলআনা প্রতিষ্ঠা-লাভের পথে প্রধান বাধা ও এই ননদ। ননদ নববধূর স্বামীর জীবনের স্নেহ-ভালোবাসায় অনেকটা অংশই অধিকার করে আছে। অন্ততঃ স্বামীর জীবনের একটা অংশে ননদেরই একচ্ছত্র অধিকার, সেখানে বধূটির কোনো স্থান নেই, থাকার কোনো কারণও নেই। ভাইবোনের সেই 'স্নেহ সুশীতল' শৈশব খেলাঘরের নিভৃত প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশ নিষেধ। সেই ঈর্ষার যন্ত্রণাটুকু যে কত ক্ষুরধার তার সুসংস্কৃত রোম্যান্টিক রূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'রাজা ও রাণী' নাটকের ইলা কুমারকে বলেছে,

'যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করি রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আমার কাছে।'

শুধু কথা শুনেই যদি এই হয় তাহলে কাছাকাছি থাকলে আরো যে কত কি হতে পারে তা অনুমান করতে খুব বেশি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সমস্যাটির মূল যে অত্যন্ত গভীরে সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

পুনরুক্তি প্রয়োজন যে, সীমান্ত বাংলার বোনেরা দাদা-ভাইয়ের জন্য এক বুক ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগীতের দাওয়ায়। সীমান্ত বাংলার

কোনো লোকায়ত সমাজে বিবাহের পর কন্যা যখন স্বামীগৃহে যাত্রা করে তখন পিত্রালয়ের গ্রামপ্রান্তের জমিতে দু মুঠো ধান ছড়িয়ে দিয়ে বলে—'বাপের ক্ষেতে বুনলাম', 'ভাইয়ের ক্ষেতে বুনলাম।' ভাইয়েরা ধনে বংশে বৃদ্ধিলাভ করুক এ কামনা তাদের আন্তরিক ও অকুণ্ঠ। পিতৃগৃহে 'এক পাত ভাতের আশা' দুর্মর হয়েই বাস করে তাদের বুকের মধ্যে। অন্তত: পরবের সময় ভাই যেন তাদের পিতৃগৃহে নিয়ে আসে বোনেদের এই কাতর আবেদনটুকু শুধু ভাইয়ের প্রাণকে নয় বিবাহগীতের বিদায় পর্বটিকেও করুণায় আর্দ্র ও অশ্রুজলে সিক্ত করেছে।

মনে যদি করিস ভাইরে পিঠেক বহিন হো
পরব পেছু আনোবে ঘুরায়।

বলাবাহুল্য ভাই আদরের বোনটিকে আনতে যায়! কিন্তু 'শ্বশুরঘর' বড়ো কঠিন ঠাঁই। পিতৃগৃহে যাবার পথে হাজার বাধা। শ্বশুরের অনুমতি চাইতে গেলে তিনি শাশুড়ির কাছে যেতে বলেন, শাশুড়ি বলেন ভাসুরের কাছে যেতে ভাসুর বলেন স্বামীর অনুমতি নিতে। স্বামীর কাছে এসে সমস্যার সমাধান হয় না, সঙ্কট ঘনীভূত হয়।

মাচিলায়েঁ বসিয়েঁ সসুর তুঁহেঁ বড় লক গ
দেহ সসুর হামারে বিদায়।
হামি কি দিভ বহু তুমহারে বিদায় গ
বুঝি লিহা আপনা সাহড়ী।
মাচিলায়েঁ বসিয়েঁ সাসু তুঁহেঁ বড় লক গ
দেহ সাসু হামারে বিদায়।
হামি কি দিঁভ বহু তুমহারে বিদায় গ
বুঝি লিহ আপনা ভেঁসুর।
মাচিলায়েঁ বসিয়েঁ ভেঁসুর তুঁহেঁ বড় লক গ
দেহ ভেঁসুর হামারে বিদায়।
হামি কি দিভ বহু তুমহারে বিদায় গ
বুঝি লিহ আপনা সঞা।
মাচিলায়েঁ বসিয়েঁ সঞা তুঁহেঁ বড় লক গ
দেহ সঞা হামারে বিদায়।
আন গ মজুরা ভাঙ্গি দিব টেংরি গ
ছাড়াঁই দিভ নৈহরকা আশ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামী যদিবা অনুমতি দেন সেও শুধু আড়াই দিনের জন্য। অন্ততঃ করমগীতে সে কথাই শুনি—

বার বছর বাদে পরভু ভাই আইল লিতে গ
দেহ পরভু হামরা বিদায়।
রঙ পরহ সিঁদুর পরহ পাটের শাড়ি
আঢ়াই দিনের কবুল রাইখ্যে যাও বাপের বাড়ি।

কিন্তু কমলা ছাড়লেও কমলি ছাড়ে না। আইবুড়ো ননদ এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

লহর লহর পরবে দাদা লেগে আইল গ
ননদ কুমারী ছেঁকল ডহর
ছাড়ু ছাড়ু ননদী হামরি ডহর গ
আইজ বড় শুভদিন ঘুরহ পরব।

আনন্দ পথের প্রধান বাধাটির প্রতি রাগ হবারই কথা।

বৌদি বা ভাজের মুখে ননদ সম্পর্কে যে কথাগুলি শুনি তা কারুর পক্ষেই সুখের নয় এবং সেগুলি সর্বাংশে শ্লেষ সিক্ত।

সইরসা ফুল সইরসা ফুল সরু গাঁথনি
ঘরে আছে ননদমাগী লাচনী।

যে কোনো অজুহাত পেলেই ননদ বৌদি বা ভাজের উপর এক হাত নেয়; বেড়াল যদি হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যায় দোষ পড়ে বৌয়ের ঘাড়ে। বৌকে গালাগালি দেবার সময় শাশুড়ির সঙ্গে গলা মেলায় ননদ।

বিড়ালে ভাঙিল হাঁড়ি
গাইল দিছে ননদ রাঁড়ি।
গাইল দিচ্ছে শাশুড়ি অমেলা
শ্বশুর ঘর করাই বড় জ্বালা।

ননদ যেমন বৌদির কাজ পছন্দ করে না, বৌদিও তেমনি ননদের সমালোচনা করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। করমগীতে শুনি—

আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঝিঙা
ঝিঙায় ধরে জালি।
ননদ মাগী ছলছলি
তুলে ডালি ডালি।

'নাচনী' বা (নাচনী,) 'ছলছলি' ইত্যাদি বিশেষণগুলিতে বিষের মাত্রা কতটা তা জানতে হলে এখানের মাটির বুকে এসে দাঁড়াতে হবে।

ননদ মাত্রেই চায় ঘরের এবং বাইরের আয়াসসাধ্য সব কাজ বৌই করুক। করমগীতে বোন আব্দার করে দাদাকে বলছে,

ছুটুমুটু ডুংরি তাহেই ফলে কুঁদরি
দেন দাদা ঠেঙ্গা কাটি
বহু যাবেক বাগালি।

লহনার জন্য খুল্লনাকে ছাগল চরাতে যেতে হয়েছিল। অবশ্য নেপথ্যে দুর্ব্বলার প্ররোচনা ছিল। লোকায়ত সমাজে লহনা দুর্ব্বলার ভূমিকা নিয়েছে সবলা এবং সুচতুরা ননদিনী।

এই ননদ ভ্রাতৃবধূর কতখানি চোখের বিষ তার শেষ প্রমাণ বিবাহগীতে।

ননদ কুমারী যখন বধূবেশে স্বামীগৃহে যাত্রা করছে তখন মা, বাবা, ভাই এবং বাল্যসঙ্গিনীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে—

কে তুমার কাঁদে সুনু বাহিরাতে সামাতে গ
কে তুমার কাঁদে সুনু লক বুঝাইতে গ।
মা তুমার কাঁদে সুনু বাহিরাতে সামাতে গ
বাবা তুমার কাঁদে সুনু লক বুঝাইতে গ।
মাইয় কাঁদে বাপ কাঁদে কাঁদে পিঠেক ভাই গ
খেলিবার সঙ্গতি কাঁদে ধুলাতে লুটায়ে গ।

পিতৃ গৃহের বিচ্ছেদ বেদনায় ছোট মেয়েটি পথে না জানি কত কাঁদবে—এই চিন্তায় কাতর হয় মা বাবা এবং দাদা।

মাইয়ে বলে বিদায় বিদায়
মায়ের অন্তর যায় পুইড়ে।
দাদা বলে বিদায় বিদায়
দাদার অন্তর যায় পুইড়ে
বাবায় বলে শিশুবিটি
পাছে রাস্তার যায় কাঁইদে।
দাদায় বলে শিশু বহিন
পাছে রাস্তায় যায় কাঁইদে।

বিদায় লগ্নে মা বাবা দাদার সঙ্গে বাল্যসঙ্গিনীরাও বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়,

কান্নায় ভেঙে পড়ে।

যাইছ যাইছ সঙ্গতি
ভাঙ্গা পাল্‌খীতে বইসে গ
পেছন দিকে ভাইলে দেখ
সব কাঁদিছে গ।

এ সময় সকলেই কাঁদে শুধু একজন ছাড়া সে ঐ বধূটি দজ্জাল ননদিনী যার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সেই পাপগ্রহের বিদায় লগ্নে শুধু ঐ একটি মুখেই হাসি। স্বাভাবিক কারণেই সে হাসি তাকে হাসতে হয় নিজের মান ও প্রাণ বাঁচিয়ে সঙ্গোপনে।

কেহু কাঁদে কোণায় কোণায়
কেহু কাঁদে ছামড়াহী হো
কেহু কাঁদে ধুলায় লইটে হো
এবের সঙ্গতি ছুইটল নইহর রে।
মায়ে কাঁদে কোণায় কোণায়
বাপো কাঁদে ছামডাহী হো
সাতো সঙ্গতি কাঁদে ধুলায় লুইটে
সাতো ভোইজী হাঁসে বাঁধে ঘাটে।
ঘরেক মুইদা বাহির ভেলা হো।

এই বাল্যসঙ্গিনীরাও জানে ননদ কি বস্তু। তাই সঙ্গিনীকে বিদায় দিতে গিয়ে তারা মর্মান্তিক পরিহাস করে বলে যে স্বামীর ঘরে ননদকে নতুন সঙ্গী পেযে তাদের বাল্য সঙ্গিনী তার পুরানো বান্ধবীদের কথা অবশ্যই ভুলে যাবে।

শ্যামসুন্দর নন্দরাণী
কুথায় যাছ সুমু বইলে রাখ।
ননদ পালে ভুইলে যাবে সুমু
সঙ্গতির নাম আঁচলে লিইখে রাখ।

কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কুব্জাকে পেয়ে রাধাকে ভুলে যাবেন শ্রীমতীর মুখে এমন অভিমানাহত অভিযোগের কথা পদাবলীর পথে আমরা অনেক শুনেছি। ননদকে পেয়ে বাল্য সঙ্গিনীদের ভুলে যাবার খোঁচাটুকুতে আঘাতের পরিমাণ তার তুলনায় অনেক বেশি।

ননদ-বিদায় বা আপদ বিদায়ের সেই বহু প্রার্থিত লগ্নে নির্বাসিত ভাইয়ের বৌটি তার শেষ নমস্কার নিবেদন করতে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহের সুদূরতম পার্থক্যটি এক পলকেই মুছে দেয়।

ননদ যাচ্ছ গ শ্বশুরবাড়ী
টুকুন দাঁড়াও দণ্ডবৎ করি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হার মানা বা পরিহার করার অর্থে এই অঞ্চলে 'দণ্ডবৎ' শব্দটির প্রয়োগ লোক-সিদ্ধ। 'তখে দণ্ডবৎ', 'তর চোদ্দ পুরুষকে দণ্ডবৎ' ইত্যাদি প্রয়োগগুলি স্মরণীয়। ভ্রাতৃবধুর 'দণ্ডবৎ' টুকুও এই অর্থেই পঠনীয়, এই আলোকেই দর্শনীয়। আমার কথাটি ফুরালো। নটে গাছটি—না, ওটা এখনো মুড়োয় নি। যে এক ঘরে ননদ, সেই তো অন্য ঘরে বৌদি বা ভাজ। যে আজ দয়াপ্রার্থী বধু, সেই তো কাল দজ্জাল শাশুড়ি। তাহলে?

ত্রিভুজে ত্রয়ী

শিরোনামটি গোয়েন্দা কাহিনীর উপযুক্ত হলেও বক্তব্যে রোমাঞ্চ সৃষ্টির বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই। তবে রহস্য কিছুটা আছে। এক নিঃশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং সমরেশ বসুর নামোচ্চারণে কিছুটা রহস্যের আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। বিবাহিত, মধ্যবয়স্ক সুখী মানুষের জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমনকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব (এক্ষেত্রে একটি পুরুষ দুটি নারী) সেই দ্বন্দ্ব মীমাংসায় এই ত্রয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনার এক অক্ষম প্রয়াস আলোচ্য প্রবন্ধটি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এবং সমরেশ বসুর 'প্রকৃতি' এই তিনটি উপন্যাসেই বিবাহিত পুরুষের জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয় নারীর আগমনে। সর্বত্রই সেই জটিলতা অপসারিত হয়েছে আগন্তুকার অপসারণে। কিন্তু আগমন এবং অপসারণের প্রকৃতি, রীতি পদ্ধতি প্রতিক্ষেত্রেই পৃথক্। পুরুষ চরিত্রটি মোটামুটি একরকম হলেও নারী চরিত্রগুলি একেবারেই আলাদা। তার কারণ শুধু লেখকদের বিশিষ্ট মানসিকতা নয়, কালেরও মর্জি। স্মরণ রাখতে হবে যে, এই তিনটি উপন্যাসের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১২৮০, ১৩০৯ এবং ১৩৯৪ সাল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' বিষবৃক্ষ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৯ সালে এবং রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শনে' চোখের বালি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৮-৯ সালে। প্রকৃতির প্রথম প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধে মনুষ্যমাত্রকেই পতঙ্গবৃত্ত বলে অভিহিত করে বলেছিলেন, "মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।

…রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি।"

স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাব্যশব্দে সাহিত্যকেই ব্যঞ্জিত করেছেন এবং যদ্যপি তিনি রূপ-বহ্নির সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বহ্নিরও উল্লেখ করেছেন তথাপি এই দুটি বহ্নিকে পৃথক করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। মূলতঃ এই দুটি বহ্নি শব্দের সঙ্গে অর্থের মতো আক্ষরিক অর্থেই অবিচ্ছেদ্য। রূপের শিখার প্রতি ইন্দ্রিয় পতঙ্গের অমোঘ আকর্ষণে যে দাবানলের সৃষ্টি হয় তাকে রূপ-বহ্নি বা ইন্দ্রিয় বহ্নি যাই বলি না কেন দহন জ্বালার বিন্দুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। আমাদের আলোচ্য এই তিনটি উপন্যাসেই রূপ-বহ্নি এবং / অথবা ইন্দ্রিয়-বহ্নির দাহ ও দীপ্তি। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো বলতেন, এগুলি রূপ-বহ্নির কাব্য। তা উপন্যাস তো আমাদের আধুনিক জীবনেরই মহাকাব্য।

এই রূপ-বহ্নির আলম্বন বিভাব রূপে দাঁড়িয়ে আছে যে নারী সে একশো ভাগ ক্ষেত্রেই পরনারী—অর্থাৎ বিবাহ সম্পর্কের বাইরে দ্বিতীয় কোনো নারী, পুরনারী বা বারনারী যাই হোক না কেন সে ঘরের নয়, বাইরের। শান্ত নিস্তরঙ্গ দীঘিতে সে হঠাৎ বানের জল। যখন যায় তখন সঞ্চিত জলটুকু কেও আলোড়িত আতঙ্কিত করে দিয়ে যায়। স্বস্তির কথা এই যে, যেতে তাকে হয়ই।

রূপ-বহ্নির প্রতি ইন্দ্রিয়-পতঙ্গের আকর্ষণের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী সঙ্কেত 'বিষবৃক্ষের' প্রারম্ভেই। নগেন্দ্র দত্ত যে নদীপথে নৌকারোহণে যাত্রা করেছেন সে নদীতে "ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি সংক্ষেপে অথচ সুকৌশলে বলতে চেয়েছেন যে, 'এই যদি মুক্তাচার মানুষ তো ছার।'

নগেন্দ্র দত্ত ধনী জমিদার। বয়স ত্রিশ বছর এবং সুপুরুষ। কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নে দেখা "দেবনিন্দিত পুরুষ মূর্ত্তি"—তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট ; সরল, সকরুণ কটাক্ষ ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা" এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মহাপুরুষ লক্ষণ। তিনি বিবাহিত এবং পত্নী-প্রেমিক। স্ত্রী সূর্যমুখীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। সূর্যমুখী সুন্দরী, "দেবদারুতুল্য দেহতরু" এবং সে দেহে যৌবনের জোয়ার কানায় কানায় বর্তমান। সে পতিগত প্রাণা সাধ্বী

রমণী। অর্থাৎ নগেন্দ্র দত্তের দেহের বা মনের অসুখ বা অস্বস্তির কোনো কারণ ছিল না। তবু নগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নারীর দিকে মুখ তুলে এবং প্রাণ ভরে চাইলেন। এই দ্বিতীয় নারীটির নাম কুন্দনন্দিনী এবং তাকে নারী না বলে বালিকা বলাই ভালো। নগেন্দ্রনাথের হিসেব মতো "তাহার বয়স তের বৎসর।"

নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে উদ্ধার করে কোলকাতায় সহোদরা ভগিনী কমলমণির আশ্রয়ে রাখলেন। সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর কথা জানতে পেরে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে তারাচরণের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাইলেন। নগেন্দ্রনাথও এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দের কচি সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও অনুরক্ত, প্রিয় সুহৃদ হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে তার স্বীকারোক্তি আছে। হরদেব ঘোষালের কাছে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকের বিবাহিত নায়কের প্রিয় বয়স্য বিদূষকের কাছে সদ্যদৃষ্ট কোনো কুমারী সম্পর্কিত অনুরাগমণ্ডিত প্রস্তাবনার আক্ষরিক মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা গৃহ খর্জুরে বিরাগ এবং বন্য তিন্তিড়ীতে অনুরাগ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাইহোক যথা সময়ে কুন্দ বিধবা হল এবং নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে অসংখ্য আত্মীয় পরিজনের মাঝখানে তার ঠাঁই হল। উদ্ভিন্ন যৌবনা কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হলেন। এই আকর্ষণ দুর্বার ও দুরন্ত।

কুন্দ বিবাহের তিন বৎসর পরে বিধবা হয়। নগেন্দ্রনাথের দেওয়া হিসেবের কথাটা মনে রাখলে কুন্দর বয়স তখন ষোল এবং নগেন্দ্রনাথ তেত্রিশ। একদিকে যৌবনের জোয়ারের আসন্ন লগ্ন, অপর দিকে ভরা ঢল।

কিছুদিনের মধ্যেই (কমলমণিকে লিখিত পত্রে সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর বয়সের যে হিসেবটা দিয়েছে তাতে মনে হয় বছর খানেকের মধ্যেই) স্বামীর ভাবান্তরটুকু সূর্যমুখীর চোখে পড়ে। কমলমণিকে সে জানায়—"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী ; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।" সেই সঙ্গে সূর্যমুখী একথাও জানিয়েছে যে, "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার

নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।"

"এখনও" শব্দটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সূর্যমুখীর মনের কথাটা এই যে, এখনও তাঁর স্বামীর চরিত্রে কোনো কলঙ্কের দাগ লাগেনি, কিন্তু লাগতে কতক্ষণ!

কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজের প্রতি, কাজকর্মের প্রতি এবং সূর্যমুখীর প্রতি চরম শৈথিল্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে কুন্দ বাড়ি ছেড়েছে এবং হীরার অভিসন্ধি মূলক চক্রান্তে বাড়ি ছাড়ার কারণ যে সূর্যমুখী সে কথা নগেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর কাছে স্বীকারোক্তি করেছেন, "সূর্যমুখী! অপরাধ সকল আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাস হন্তা। যথার্থই আমি তোমাদের ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টাকরি নাই, তাহা ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।" সেই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা—"আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ি ঘর সংসারে আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যা হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যগত প্রাণ হইয়াছি সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

এইবার নগেন্দ্রনাথ যথার্থ ই পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ইতিপূর্বে নানা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তঃকরণে সূর্যমুখী ছাড়া অন্য কোনো নারীর অস্তিত্বমাত্র ছিল না। এবং তাঁদের বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি বা অসন্তোষের কারণ মাত্রও ছিল না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ এবং তার অদর্শন যখন তাঁর কাছে মর্মান্তিক হয়েছে তখন তিনি সে কথা স্ত্রীর কাছে অকপটে কবুল করেছেন। হীরার

প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি সূর্যমুখীর প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে বিরত থেকেছেন। অবশ্যই তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য সূর্যমুখীকে দুঃসহতম আঘাত দিয়েছেন কিন্তু তজ্জন্য তাঁর অসহায়তার কথাটিও আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

সূর্যমুখী এই চরমতম দুঃসংবাদটি শোনার পরেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে এবং স্বামীর কাছে একমাস সময় চেয়ে নিয়েছে। এই এক মাসের মধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায় তাহলে তাঁর স্বামী গৃহত্যাগ করতে পারবেন।

এর পরের ঘটনা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্র নাথের বিবাহ। এ বিবাহের ঘটক স্বয়ং সূর্যমুখী। এই বিবাহের কথা জানিয়ে দুটি চিঠি লেখা হয়েছে। একটি লিখেছে সূর্যমুখী কমলমণিকে, অপরটির লেখক নগেন্দ্রনাথ প্রাপক হরদেব ঘোষাল। নগেন্দ্রনাথের পত্রে বিধবা বিবাহকে শুধু যে শাস্ত্র সম্মত ও সমাজ সম্মত করার প্রয়াস আছে তাই নয়, পুরুষের বহুগামিতার স্বপক্ষে কথাও আছে এবং এ বাবদে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনঃস্মরণও আছে। তদুপরি এই বিবাহের স্বপক্ষে আছে তাঁর দুটি মোক্ষম যুক্তি। প্রথমতঃ তিনি নিঃসন্তান, অতএব পুত্রার্থে দ্বিতীয় ভার্যা গ্রহণের অধিকার তাঁর আছে। দ্বিতীয়তঃ এই বিবাহে যার স্বার্থহানি হবার সম্ভাবনা প্রবল সেই সূর্যমুখী স্বয়ং এর উদ্যোক্তা। শেক্সপীয়র বলেছিলেন যে, প্রয়োজনে নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শয়তানও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে। নগেন্দ্রনাথকে শয়তান বলার অভিপ্রায় আমাদের নেই, কিন্তু একথা বলার প্রয়োজন আছে যে, তাঁর যুক্তিগুলি, এক চক্ষু হরিণের মতো, নিজ স্বার্থরক্ষার প্রতিই নিবদ্ধ দৃষ্টি।

সূর্যমুখীর মনের কথাটি, তার অন্তঃকরণের গোপন ব্যথা ও যন্ত্রণাটি বোঝার জন্য তার মুখের দুটি কথাই যথেষ্ট। দুটি কথাই সে বলেছে কমলমণিকে — একটি প্রত্যক্ষে অপরটি পত্রে। কুন্দনন্দিনীর সংগে নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর কমলমণির সংগে একান্ত সাক্ষাতে সূর্যমুখীর প্রশ্নটি "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?" অন্তর্গূঢ় বেদনায় করুণ এবং সূর্যমুখীর তৎকালীন মানসিকতার নিরতিশয় বিপন্নচিত্র। তার দ্বিতীয় কথাটি গৃহত্যাগ করার কালে কমলমণিকে লেখা পত্রে, "যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে তাঁর আর কিছুমাত্র সুখ নাই। তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেইদিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব।

কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব ; কেননা আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না।

……কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। …আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। …আমি এখন চলিলাম।….কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না। আমি এখন পথের কাঙালিনী হইলাম……আমি টাকাকড়ি সংগে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোনা রূপা সংগে লইয়া যাইব ?" কোনো যোগাযোগ নেই, সম্পর্ক আলাদা, প্রসঙ্গ ও পৃথক্, তবু মনে পড়ে যায় কুন্তীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কর্ণের সেই শ্লেষ সুন্দর, প্রত্যাখ্যান কঠোর উক্তিটি। "যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।" আঁচলের স্পর্শমণি যে হারিয়েছে সামান্য সোনাদানাতে তার প্রয়োজন বা প্রার্থনা না থাকারই কথা। এই পত্রের শেষ দুই ছত্র এইরূপ—"আরও আশীর্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ু শেষ হয়। আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।" যে বেদনা মৃত্যুরও অধিক সেই বেদনা সূর্যমুখীর বুকে। অথচ হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথ এই বলে আনন্দ প্রকাশ এবং কৃতকর্ম্মকে সমর্থন করেছিলেন যে, এ বিবাহের উদ্যোক্তা স্বয়ং সূর্যমুখী। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর মুখের কথাই শুনেছেন, তার মনের কথাটি জানার চেষ্টামাত্র করেননি। অথবা সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ বলেই সে কথা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এ সমাজের পুরুষ তো মনে প্রাণেই বিশ্বাস করে যে, "এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

কুন্দনন্দিনীর সংগে নগেন্দ্রনাথের বিবাহের দিন পর্যন্ত সূর্যমুখীর আচার আচরণ প্রথাসিদ্ধ। সুদূর পৌরাণিক যুগের কুৎসিত রোগাক্রান্ত স্বামীকে মাথায় করে বারনারীর কাছে পৌঁছে দেবার দুঃসহতম দৃষ্টান্তের কথা বাদ দিলেও অদূর ইতিহাসের সংস্কৃত রোম্যান্টিক নাটকগুলির মহারাণীদের আচার আচরণের সংগে, এতোদূর পর্যন্ত, সূর্যমুখীর আচার আচরণের মিলের কথা মনে পড়বেই। স্বামীর কাছে নিজের অস্তিত্ব এবং অধিকারটুকু বজায় রাখার জন্য রাজার (পড়ুন, জমিদারের) বহুগামিতাকে বিবাহের মন্ত্র পড়ে বিশুদ্ধ এবং বিপন্মুক্ত করে

নেবার প্রয়াস নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিবাহের পর সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ সম্পূর্ণ নতুন বস্তু। নারীর স্বাধিকার হরণ মামলায় হাকিমের নতুন রায় এবং তা একান্ত রূপেই যুগ সম্মত। তবে পুরুষেরবহুগামিতার বিরুদ্ধে নারীর এই প্রথম প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদে আত্মসম্মান অথবা অধিকার সচেতনতা থেকে অভিমানের মাত্রাই বেশি।

কাহিনীর শেষাংশটুকু সকলেরই জানা। সূর্যমুখীহীন গৃহে কুন্দকে নিয়ে নগেন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, 'সকল সুখেরই সীমা আছে।' সূর্যমুখী আবার ফিরে এল। কুন্দ 'আমার সাধ মিটিল না' বলে বিষপানে আত্মহত্যা করল। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর মিলন হল। লেখক 'গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে' এই আশায় বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আশাকে আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু সেই সংগে স্বীকার করি যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে। বিষবৃক্ষের সমাপ্তি হয় নি, সূচনা মাত্র হয়েছে এবং কালক্রমে বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ফল-ফুলের আসবে সমাজ যেন ক্রমেই মাতাল হয়ে পড়ছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ যে 'চোখের বালি' লিখেছিলেন তার একাধিক প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র সূচনায় বলেছিলেন, "আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।
শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা ··।"

'চোখের বালি'তে দ্বন্দ্বটা যদিচ ক্বচিৎ কখনো ত্রিভুজের সীমানা ছাড়িয়ে চতুর্ভুজে পরিণত হয়েছে কাহিনীর প্রারম্ভাংশটি কিন্তু বিষবৃক্ষের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। অবশ্য ক্ষেত্র আলাদা। বিষবৃক্ষ জমিদার বাড়ির আঙ্গিনা থেকে শহরের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষের দোতালা বাড়িতে শিকড় মেলেছে। বিষবৃক্ষ হয়েছে চোখের বালি। বিষবৃক্ষ এসেছিল পুরুষের হাত ধরে, চোখের বালি এনেছে স্বয়ং নারী সাধ করে।

বিনোদিনী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। মহেন্দ্রের মায়ের ইচ্ছে ছিল নিজের ছেলের সংগে বিনোদিনীর বিয়ে দেওয়া। মহেন্দ্র রাজি না হওয়াতে তিনি তাঁর জন্মভূমি বারাসতের গ্রাম সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সংগে উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিয়ে দেওয়ালেন। অনতিকাল পরেই বিনোদিনী বিধবা হল।

বিষবৃক্ষও বিধবা, চোখের বালিও বিধবা। কিন্তু তবু বিনোদিনী এবং কুন্দের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। কুন্দ ভীরু, শান্ত, মুগ্ধা। বিনোদিনী শিক্ষিতা, সাহসিকা এবং প্রগলভা। কুন্দ শুধু কাঁদতে জানে, বিনোদিনী কাঁদাতেও জানে।

বিষবৃক্ষে দুইনারী, এক পুরুষ। চোখের বালিতে দুই নারী, দুই পুরুষ। এবং দুটি নারীকে নিয়ে উভয় পুরুষের চিত্তে ভাব ও ভাবনার নানা দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ। এই দুটি পুরুষ আবার সমবয়স্ক এবং বাল্যবন্ধু। নগেন্দ্রনাথেরও এক বন্ধু ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন অসমবয়স্ক এবং দূরবর্তী অবস্থানে। অপরদিকে বিহারী মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলে ডাকত এবং প্রায় সময় তাদের বাড়িতেই থাকত। আশার সঙ্গে প্রথমে বিহারীর বিয়ের কথা হয়েছিল। মহেন্দ্র এবং বিহারী দু'জনেই মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। মেয়েটিকে দু'জনেরই পছন্দ হয়েছিল।

আশার অবস্থান যদিও কুন্দনন্দিনীর বিপরীত বিন্দুতে, বয়স এবং স্বভাবে আশা অনেকটা কুন্দেরই মতো। তার বয়স, আত্মীয়রা বলতেন,—বারো, তেরো। "অর্থাৎ চৌদ্দ, পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহ-পালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরুভাবে তাহার নব যৌবনারম্ভকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।"

আশাকে দেখে আসার পর মহেন্দ্র জিদ ধরল যে সে তাকেই বিয়ে করবে। বিহারী প্রথমটায় সম্মত না হলেও পরে কাকীর অনুরোধে সম্মত হল এই শর্তে যে, তাকে আর কখনো কারুর সঙ্গে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করা চলবে না।

আশা মহেন্দ্রের ঘরে এল। মহেন্দ্র তখন এম,এ, পাশ করে ডাক্তারী পাঠরত। নব-বধূকে নিয়ে যতটা বাড়াবাড়ি করা যায় মহেন্দ্র ততটাই করল এবং তা করতে গিয়ে "কাজের প্রতি দৃক্‌পাত বা লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করিল না।" আশাও স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হয়ে নব-বধূযোগ্য লজ্জা ভয় দূর করে দিয়ে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদ-প্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করল। মহেন্দ্রের মায়ের চোখে এটা ভালো লাগল না।

মহেন্দ্রের মা দেশের বাড়ী থেকে যখন এলেন তখন বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। দেশে থাকাকালীন মহেন্দ্র মাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে আশার কথাও ছিল। সে কথা 'মহেন্দ্র রঙ্গে রহস্যে আনন্দে মাতাল' হয়ে

লিখেছিল। চিঠির সেই অংশটুকু বিনোদিনী মহেন্দ্রের মায়ের কর্ণগোচর করেনি। কিন্তু তার নিজের অন্তরে এক তীব্র বঞ্চনা এবং বেদনা বোধ করেছিল। "বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।" অর্থাৎ কালবৈশাখীর কালো মেঘ বায়ু কোণে জমা হল।

সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপণা এবং সর্ব্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন আশার প্রণয় প্রার্থনা করল আশা তখন প্রায় হাতে স্বর্গ পেল এবং তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে গঙ্গাজল, বকুলফুল জাতীয় একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। বিনোদিনী হেসে' চোখের বালি' সম্পর্কটির প্রস্তাব রাখল। আশা "বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, 'চোখের বালি' বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।" বঙ্কিমচন্দ্র হলে বলতেন, "এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।"

আশা মহেন্দ্রের অন্তরঙ্গ কথাগুলি আশার মুখ থেকে শোনার জন্য বিনোদিনী ব্যগ্র হয়ে থাকত। এক বুক ক্ষুধা নিয়ে অযোগ্যের পাত্রে পরিবেশিত অপর্যাপ্ত সুধার দিকে সে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখত। সে ভাবত— "এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম।....আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।"

বিনোদিনীর তুলনায় আশা যথার্থ-ই কচি খুকি, খেলার পুতুল এবং এখানেই বিনোদিনী কুন্দের দূরবর্তী পর। বিনোদিনী একথা ভুলতে পারে না যে, এই মহেন্দ্রের সঙ্গেই একদা তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল এবং আশার চেয়ে সে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। বিনোদিনীর বুকে তৃষ্ণা এবং ঈর্ষার মিশ্রণে যে বিষ উগ্র হয়ে উঠছিল তাকে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত তার শান্তি ছিল না।

মহেন্দ্র পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে বেশিদিন বাড়িতে রাখার পক্ষপাতী ছিল না। মহেন্দ্রের মা ছেলের কথা শুনে বিহারীকে ভার দিলেন যাতে ও মহেন্দ্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করায় বিনোদিনীকে তাঁর সেবা যত্নের জন্য ঘরে রাখতে। "বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল। কহিল, 'মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?' মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, 'ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করো না আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।' আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, 'বল কি। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।'

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্ম চুনি ছটফট করিতেছে। ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভর্ৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল, 'বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও—বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।"

লক্ষ্য করতে হবে যে, বিষবৃক্ষে কুন্দের ভবিষ্যৎ দর্শন আলৌকিক উপায়ে, 'চোখের বালি'তে ভবিষ্যৎ বর্ণন নিছক লৌকিক উপায়ে। দুই বন্ধুর পরিহাস সূত্রে শুধু যে বিষবৃক্ষের প্রসংগ এসেছে তাই নয়, ভবিষ্যৎ ঘটনার অসংশয়িত আভাসও প্রদত্ত হয়েছে। প্রসংগত স্মরণীয় যে, আশার অনুপস্থিতিতে পাঠরতা বিনোদিনীর আঁচলের তলা থেকে মহেন্দ্র যে বইটি টেনে বার করেছে সেটিও "বিষবৃক্ষ"। সূর্যমুখী কুন্দকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল—নিজের খালের কুমীর অন্য খালে চালান করে দিয়ে নিরাপদে থাকতে; আশা নিজেই খাল কেটে কুমীর এনেছিল বিনোদিনীর সংগে আলাপ করার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করে। আশা সরলা সহৃদয়া এবং ছেলেমানুষ। কিন্তু ছেলেমানুষ খেলাচ্ছলে আগুনে হাত দিলে আগুন তার স্বধর্ম পালনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা করে না। বিনোদিনীর রূপ-বহ্নিতে মহেন্দ্র পতংগ ঝাঁপ দিল, নিজে পুড়ল, অপরকেও পোড়াল।

বিহারী আশাকে স্নেহ এবং সেই কারণেই বিনোদিনীকে ভয় করত। সে একদিন বিনোদিনীকে বলেছিল "বিনোদ বৌঠান, আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।" বিনোদিনীর প্রকৃত লক্ষ্য মহেন্দ্র নয়, বিহারী। অথচ বিহারীর সবটুকু উৎকণ্ঠা আশার জন্য। "বিনোদিনী নিজে কেহই নহে। আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসাতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত

ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে! দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ। প্রতিকূল ভাগ্যবশতঃ বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহার মূর্ত্তি ধরিল।"

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর 'আঁতের কথা' টেনে বের করেছেন এবং জলবাহী মেঘ কেমন করে বিদ্যুৎবাহী হয়ে উঠল তার কারণ পরম্পরা বিশ্লেষণ করেছেন। বিনোদিনী মহেন্দ্রের বুকে ইন্দ্রিয়-বহ্নি প্রজ্জলিত করেছে কিন্তু নিজের বুকের ভালোবাসার সবটুকু আলো দিয়ে বিহারীর আরতি করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত এই আলোটুকুর জন্যই সর্বাধিক অশুচিতা ও পঙ্কিলতার হাত থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। দাবাগ্নি গৃহপ্রদীপে পরিণত হয়েছে।

মহেন্দ্র একদা ভেবেছিল, "আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে।" সেই আশায় সে অভিসার করেছিল বিনোদিনীর ঘরে। কিন্তু সতর্ক বিনোদিনী সে রাত্রে ঘরের বারন্দায় রাজলক্ষ্মীর সংগে শয়ন করেছিল। মহেন্দ্র মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেল। লজ্জারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে লজ্জাও নির্লজ্জ হয়ে পড়ে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে সংসার ছাড়ার সংকল্প নিল।

এর পরেই বিনোদিনী এল বিহারীর কাছে। বিহারী তাকে এই সর্ব্বনাশ ঠেকানোর অনুরোধ জানালে সে বলে, "ঠেকাইব কাহার জন্য! তোমার নিজের সুখ দুঃখ কিছুই নাই! তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই—ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।" বিহারীর কাছে বিনোদিনীর এই প্রকাশ্য প্রেম নিবেদনের যুক্তিতর্ক আবেগের মাথায় এক সমুদ্র ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বিহারী তাকে দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দিল এবং বিনোদিনী তা মেনেও নিল।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর সন্ধানে তার দেশের বাড়িতে গেল। অনেকটা পরিস্থিতিগত কারণেই বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে ঘর ছাড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ নিজেই সমাজপতি বলে সমাজের তোয়াক্কা করেন

নি। তাছাড়া বিষবৃক্ষের পারিবারিক জীবনের বাইরে বৃহত্তর সমাজ বস্তুত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু 'চোখের বালি'তে সমাজ মাঝে মাঝেই মাথা তুলে কথা বলেছে। বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ি মহেন্দ্রকে প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিলেন, "ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ। ভদ্র সমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।" মহেন্দ্রকে মানতে হয়েছে যে তার মা আছে, স্ত্রী আছে, এবং ভদ্রসমাজ আছে। এরপর মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে একই গাড়িতে স্টেশনে যাবার সাহস পায়নি, গ্রামের পথ ছেড়ে মাঠ পথে নতশিরে স্টেশনে গিয়েছিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে এসে পটলডাঙার বাসায় উঠেছিল এবং কিভাবে মহেন্দ্রের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায় তা নিয়ে চিন্তায় ছিল। মহেন্দ্র যে নারীর পক্ষে নিশ্চিন্ত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভরযোগ্য আশ্রয় নয় একথা সে জানত এবং এইরূপ আশ্রয় যে একমাত্র বিহারীই তাকে দিতে পারে এ সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত ছিল। আসলে "যেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছে হইতে সে ফিরিয়া লইয়া আসিয়াছে জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘের ন্যায় দেবতার উদ্দেশ্যে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, 'আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" তার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, বিহারী তার পূজা তার প্রার্থনাপত্র সমেত গ্রহণ করেছে। বিনোদিনীর উদ্যত চুম্বন বিহারী গ্রহণ করেনি কিন্তু সেই ঘটনা তার পৌরুষকে প্রদীপ্ত এবং চিত্তকে নব চেতনায় জাগ্রত করেছিল। "বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে।" বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহ করার কথা বলল। এবার পিছিয়ে এল স্বয়ং বিনোদিনী। বিহারীকে শ্রদ্ধার সুউচ্চ আসন থেকে টেনে নামাতে সে কিছুতেই পারে না। ভূমিষ্ঠ হয়ে বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করে বিনোদিনী বলল, "পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন

করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।" বিনোদিনী ভালো করেই জানে যে, বিহারী চিরদিন নির্লিপ্ত ও প্রসন্ন। সে চির দিন তাই থাকুক, এটাই বিনোদিনীর আন্তরিক এবং অন্তিম কামনা। বিনোদিনী শুধু নিজেকে বাঁচায়নি, মহেন্দ্র এবং বিহারীকেও বাঁচিয়েছে। বিদ্যুৎবাহী মেঘ অজস্র জল ধারায় রুক্ষ ধরণীকে শ্যামল ও শান্ত করেছে। চিরকালের মতো কাশী যাবার দিনে তাই সে এক সংগে মহেন্দ্রের প্রণাম এবং আশার ভালোবাসা পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেপথে যাননি। তিনি চোখের বালিকে মনের মানুষে রূপান্তরিত করে তার মহীয়সী মূর্তির সম্মুখে বিহারীকে শ্রদ্ধানত এবং মহেন্দ্রকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছেন।

স্বামীর সংগে কুন্দনন্দিনীর বিয়ের পর সূর্যমুখী স্বামীর ভালোবাসা হারিয়েছে বলে অভিমানে ঘর ছেড়েছিল। বিনোদিনীর সংগে স্বামীর বাড়াবাড়ির দিনেও আশা কিন্তু ঘর ছাড়েনি। একবার সে কাশী গিয়েছিল সেও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস করে নয়, স্বামীর প্রতি তার অটল বিশ্বাসের প্রমাণ দিতেই। কিন্তু যেদিন বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রেখে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে মহেন্দ্র বাড়িতে এসেছিল সেদিন "সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্য স্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্ক পারাবারের মধে তাহার হৃদয় দেবতাকে বিসর্জন দিল ··। বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক—এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনো মতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।"

অন্যাসক্ত পুরুষের প্রতি এই দুই নারী (সূর্যমুখী ও আশা)-র মনোভাবের মধ্যে দিয়েই কাল প্রবাহের গতিটিকে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। আশার এই নীরব প্রতিবাদ অভিমানিনী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের তুলনায় নারীর আত্মসচেতনতা, অধিকার ও সম্মান বোধের দিক দিয়ে অনেক বেশী আধুনিক। পতি হলেই যে পূজ্য নয়, আশার এই নীরব প্রতিবাদ তারই সোচ্চার স্বীকৃতি। এতোদিন আমরা সীতাদেরই সতীত্ব পরীক্ষা করে এসেছি। এখন থেকে আমাদের সীমা-স্বর্গের মহেন্দ্রদেরও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। 'সতীর

দেবতা পতি' — সূর্যমুখীর কথা, সতীর দেবতা সৎ পতি' — আশার কথা। কিন্তু আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, সমাজ এখনো পুরুষ-শাসিত।

সমরেশ বসুর 'প্রকৃতি' উপন্যাসের নায়ক ক্ষৌণীশ সেই পুরুষশাসিত সমাজেরই মুখপাত্র। তার বিশ্বাস — "চেতনে আর অবচেতনেই হোক, অন্তরে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহুগামী। দীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্কারে, কথাটা মানতে চায় না কেউ। অতএব বিতর্কিত।…স্ত্রীপুরুষ উভয়ে নির্বিশেষে অন্তরে বহুগামী হলেও পুরুষ যতো বেশি এর সুযোগ নেয়, স্ত্রীরা সেক্ষেত্রে লাখে না মিলল এক। তুলনায় স্ত্রীরা একগামিতারই সমর্থক। তাদের জীবনেও সেটা লক্ষণীয়। কারণটা হয়তো যত না বেশি বন্ধনের, সংস্কারের বাধাটা তাদের মনে অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ফলে সমাজে সংসারে শুভ ও শান্তির দিকটা রক্ষা পেয়েছে বেশি, আর পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষই বহুবল্লভাচারী, ইতিহাসের এটাই এক কৌতুক।… সেই কোন দূর অতীতকালের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজে সে যে বহুগামিতার স্বাধীনতা ভোগ করে স্ত্রীলোকদেরও একদা সেই অধিকার ছিল। এবং সেই স্বাধীনতা অনুযায়ী ইচ্ছেমাত্র ভোগ বাসনা চরিতার্থ করতো। বিশেষভাবে পুরুষ তার দৈহিক সুযোগের সাহায্যে বহুমুখী কাম প্রবৃত্তিকে একমুখী করার প্রয়াস পেয়েছিল। শৃঙ্খলার নামে দৈহিক শুচিতার নামে নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছিল। স্ত্রীরা হয়েছিলেন সতী সাধ্বী 'পতি সোহাগিনী।' পুরুষ তার নিজের শক্তিতে বহুগামিতাকে বজায় রেখেছিল। আজও রেখেছে।"

এই উপন্যাসের বহুগামী পুরুষগুলি (তন্মধ্যে নায়কও একজন) সমাজের কৃতবিদ্য মধ্যবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ। ক্ষৌণীশ অর্থাৎ নায়কের ছেলে-মেয়েও আছে। নায়ক প্রসঙ্গে আসার আগে অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলির দিকে তাকানো যাক্। বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টার এবং প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের মালিক সুপ্রিয় রায়চৌধুরী ক্ষৌণীশের বন্ধু। সুপ্রিয় বিবাহিত এবং সুখী দম্পতি। কিন্তু অভিজাত পল্লীর মধ্যে, এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী গৃহস্থের ঘরে, দেহের ব্যবসা যেখানে জাঁকিয়ে বসেছে সেখানে তার যাতায়াত ছিল। ক্ষৌণীশ জানত যে, সুপ্রিয় মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটে যান। সে নিজেও একবার সেখানে গিয়েছিল। ক্ষৌণীশ সুপ্রিয়কে সেখানে যেতে মানা করেছিল এই বলে যে, "…মিসেস চাকলাদার যতোই ধড়িবাজ মহিলা হোন, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া

কঠিন। তাঁর সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ ঘটেছে। পুলিশের দয়ার ওপরেই তার এখন রমরমা ব্যবসা। কিন্তু পুলিশ কী বস্তু তা আপনি আমার চেয়ে কম জানেন না। আপনাকে যদি একদিন ফাঁদ পেতে ধরার ব্যবস্থা করে, সম্মান বাঁচাবার জন্য, এক ঘায়ে কতো টাকা বেরিয়ে যাবে, আপনি এখনই হিসেব করতে পারবেন না। তাছাড়া, গায়ে একটা দাগ লেগে থাকবে।" সুপ্রিয় ক্ষৌণীশের যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করেছিল, ভয় পেয়েছিল এবং সেখানে যাওয়া বন্ধ করেছিল। "সুপ্রিয় রায়চৌধুরী কি তার পরে বেলকাঠ ব্রহ্মচারী হয়ে গিয়েছিল? আদৌ না। বয়স হয়েছিল বটে। কিন্তু একেবারে সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন নি। স্থান এবং পাত্রী বদল হয়েছিল। এবং অবিশ্যিই সমস্ত ব্যাপারটি ছিল একটা সীমার মধ্যে।"

নগেন্দ্রনাথের চেয়ে হরদেব ঘোষাল বয়সে বড়ো ছিলেন। সুপ্রিয় চৌধুরীও ক্ষৌণীশের চেয়ে বয়সে বড়ো। "উভয়ের শ্রেণীগত চরিত্রে মিল ছিল। সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর চেয়ে ক্ষৌণীশ কোনো অংশেই চরিত্রবান ছিল না। তবে ওর একটাই মানসিক দ্বন্দ্ব। সেটা হলো দেহক্রয় এবং নির্বিচার ভোগ।"

"'ক্ষৌণীশ ওর পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও রমণী সঙ্গ যদি 'পদস্খলন' বলে গণ্য হয় তাহলে ওর জীবনে তা বার কয়েক ঘটেছে। কিন্তু সেই সব কোনো ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। ঘটনা গুলোকে প্রেম আখ্যাও দেওয়া যাবে না।" এগুলি এক ধরণের সখ্যতা যার মধ্যে দৈহিক বিষয়টিও ছিল। এই সব নারীর মধ্যে অধিকাংশই ছিল দূরবর্তী স্থানের— বোম্বের মহীশূরের। দূরের সংবাদ বাড়ি পর্যন্ত পৌছত না। অন্ততঃ ক্ষৌণীশের সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু নারীর বিশেষতঃ বিবাহিতা নারীর একটি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক! সেই ইন্দ্রিয়ের মারফৎ ক্ষৌণীশের স্ত্রী অমলা স্বামী সম্পর্কে বিপদের আভাস পেয়েছিল।

ক্ষৌণীশের সর্বশেষ শিকার ইন্দ্রাণী। কথাটাকে আর এক ভাবেও বলা যেতে পারে। ইন্দ্রাণীর অন্যতম শিকার ক্ষৌণীশ। উদ্ধত যৌবনা এই নারীর দৃঢ় বিশ্বাস, পুরুষ মাত্রেই প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। তার পরিষ্কার কথা "নারী হয়ে জন্মেছি, অথচ ছলনা করবো না, তা কেমন করে হয়।" তার কথা এই যে, "আধুনিক কেতায় ওসব উইমেনস লিব-এর নামে যতো কথাই বলা হোক, যে আমরাও 'মানুষ' কিন্তু আমি তো নিমেষের জন্যও ভুলতে পারিনে, মানুষ তো বটে! তবে মেয়ে। এটা হোল বাস্তব। আর এ বাস্তব বোধের

মধ্যে কোনো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেরও ব্যাপার নেই। তাহলে আর অধিকার বা স্বাধিকারের আগে, স্ত্রী কিংবা নারী জাতির নামটা বলার দরকার হতো না। সুতরাং আমি মেয়ে। একশো ভাগ মেয়ে। মেয়েমানুষ। যেমন পুরুষ মানুষ। মহিলা না বলে মেয়ে মানুষ বললেই আমাদের মান চলে যায় না। আর মেয়েদের যেসব বৈশিষ্ট্য পুরুষদের তা নেই। মেয়েরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টটাকে কাজে লাগাবেই। যেমন পুরুষরাও তাদের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়।"

প্রথম থেকেই ইন্দ্রাণী তার শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিকে কাজে লাগিয়েছিল এবং একটিমাত্র জায়গা ছাড়া সর্ব্বত্রই সফল হয়েছিল। ইন্দ্রাণীর সেই পরাজয়ের জায়গাটাই একটি পুরুষের অকলঙ্কিত চরিত্রের বিজয় নিকেত। সেই চরিত্রের নাম সুধাকর এবং সেও ক্ষৌণীশের বন্ধু যদিচ তার অবস্থান সুপ্রিয়-ক্ষৌণীশ থেকে শত যোজন দূরে। সুধাকরের কাছে নারীর সব ছলনাই ব্যর্থ হয়েছে। ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েকেও এক্ষেত্রে হার মানতে হয়েছিল। পারদমন-বাংলোর নির্জনতায় রাত্রির অন্ধকারে নিজের শয়নকক্ষে সুধাকরকে আহ্বান করেও, শত ছলনার জাল বিস্তার করেও, সেই দুর্ভেদ্য পুরুষ চরিত্রের দুর্গে কিছুমাত্র ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে। সুধাকর বিহারীর উত্তর পুরুষ এবং মুক্ত পুরুষ। মোহিনী নারীর ছলনাজালকে অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারে এই পুরুষ। ক্ষৌণীশের কাছে সুধাকর প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে "ইন্দ্রাণী অসংকোচে স্বীকার করেছে, সুধাকরকে দিয়ে পুরুষ সম্পর্কে ওর জন্মগত একটা ভুল ভেঙ্গেছে। পুরুষ মাত্রেই একান্ত প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক না। ইন্দ্রাণী নিজের পরাজয় স্বীকার করেছে। এবং সুধাকর ওর জীবনে একটা শুধু অভিজ্ঞতা না। আবিষ্কারও বটে।"

ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষার নোট কায়দা করে আদায় করে নিয়েছিল ইন্দ্রাণী এক পিতৃপ্রতিম অধ্যাপকের কাছ থেকে এবং অবশ্যই নিজের বৈশিষ্ট্যকে সার্থক ও নিখুঁতভাবে কাজে লাগিয়েই 'ইউনিভারসিটির শেষ বছরের পরীক্ষার জন্য জোর প্রস্তুতি চলছিল। তবে প্রস্তুতি চলছিল যে – অধ্যাপকের কাছে, তাঁর একটু নেকনজর ছিল ওর ওপর। নেকনজরের কারণটা ইন্দ্রাণীর ভালোই জানা ছিল। তার জন্যে যতোটুকু উসুল করে নেওয়া দরকার তা ও করে নিয়েছিল। ঐ সেই, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয় বিশ্বাসেই। "অধ্যাপক দম্পতির একমাত্র কন্যা ইন্দ্রাণীর চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের ছোট। ওকে অধ্যাপকের

স্ত্রী যতোটা না বুঝতেন, তাঁর মেয়ে ততোটাই বুঝতো, বাবার ছাত্রীটির ওপর স্নেহাধিক্য একটু মাত্রাতিরিক্ত। অধ্যাপক যখন বেথুয়াডহরির বনবাংলোয় সপরিবারে বেড়াতে গেলেন তখন ইন্দ্রাণীকেও আমন্ত্রণ জানালেন সঙ্গে যেতে। ইন্দ্রাণী গিয়েছিল একথা জেনেই যে, স্ত্রী কন্যার উপস্থিতিতে স্যর খুব একটা স্নেহে বিগলিত হবার সুযোগ পাবেন না। অবশ্য যাবার আগে প্রয়োজনীয় নোটস-গুলি আদায় করে নিয়েছিল কিছু খুচরো আদরের বিনিময়ে। মনে মনে বলেছিল, "স্নেহ করো, কিন্তু মালটি ছাড়ো। ফার্স্ট ক্লাশ না হোক, সেকেণ্ড ক্লাশটা পেতে দাও। ট্রামে বাসে তোমার চেয়ে বেশী সুযোগ নেয় ভিড়ের যাত্রীরা।"

সুপ্রিয় চৌধুরীর 'প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে' ম্যানেজারেসের চাকরিটাও ও পেয়েছিল 'কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়' এই বিশ্বাসের জোরেই। মানুষকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে ওর জীবনে বিস্তর। যার পরিণতিতে এই সাতাশ বছর বয়সেই ও হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। অবিশ্যি বেপরোয়া হবার মতো সাহস ওর আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের পা রাখার জায়গাটা যে যথেষ্ট শক্ত রাখার দরকার, সেই বাস্তব বোধটা ওর টনটনে।" কাজেই সুধাকরের মধ্যস্থতায় যেদিন সুপ্রিয় চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্ষৌণীশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল সে পা রাখার শক্ত জায়গাটা চিনতে ভুল করল না; নিজেকে এগিয়ে দিল ক্ষৌণীশের দিকে। বহ্নি পতঙ্গ চিনতে কখনো ভুল করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এবার কিন্তু বলা গেল না যে, 'এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।" কারণ "ক্ষৌণীশের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ব্যতিরেকে ইন্দ্রাণী প্রথম রমণী না। সংখ্যার গণনার বিবরণে না গিয়ে বলা যায়, একাধিক রমণীর একজন।" কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় যে, এবার বিষবৃক্ষ ফলবান হল। এই ইন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করেই ক্ষৌণীশের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির সৌধটি ভেঙ্গে পড়ল।

কুন্দ বা বিনোদিনী দু'জনেই বিবাহিত পুরুষের ঘরে এসেছিল। ইন্দ্রাণী অবশ্য অমলার বাড়ীতে আসেনি কিন্তু বাড়ির লোকটিকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। বাংরিপোষি বাংলোর নির্জনতায় সে ক্ষৌণীশকে নিয়ে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করেছিল। মদ খেয়েছিল, এমনকি মাথায় সিঁদুর পরেছিল। ক্ষৌণীশ অবশ্য বলেছিল, "আজকাল সবাই জানে, মিছিমিছি সিঁদুর লাগিয়েও বউ সাজা যায়। অনেক বিবাহিতা মহিলাই আজকাল সিঁথিতে সিঁদুর দেয়

না।” মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশকে ‘অসভ্য’ বলে মৃদু তিরস্কারও করেছিল কিন্তু তার অসভ্যতাগুলি প্রাণ ও দেহ-ভরে উপভোগ করেছিল।

কিন্তু ইন্দ্রাণী শতবর্ষ পূর্বের কুন্দনন্দিনী বা বিনোদিনী নয় সে, একালের বিনোদিনী এবং একান্ত রূপেই যৌবনবিলাসিনী। শাখা-সিঁদুরের সংস্কার তার কাছে পবিত্র কোনো কিছু না, একান্তই আত্মরক্ষার একটা সহজ উপায়। তাই জঙ্গলে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েই ক্ষৌণীশের প্রতি তার সব আকর্ষণ মুহূর্তে অন্তর্হিত হল এবং সে সরাসরি চ্যালেঞ্জের সুরে ক্ষৌণীশকে বলল, “এটা আমাকে খুন করার কূট পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি একটা জঘন্য খুনী আর লম্পট ছাড়া আর কিছু নও। তুমি আমাকে জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল যেমন খুশি ভোগ করার জন্য।” ক্ষৌণীশ তাকে বলেছে, “আমি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসিনি। তুমিই আসতে চেয়েছিল, আর ব্যস্তও হয়েছিলে। এখন এসব কথা বলছো। কী করেই বা আমি জানবো, এ সময়ে বর্ষা হবে. জঙ্গলের অবস্থা এরকম হবে।” পাঠক জানেন, ক্ষৌণীশ জানে না যে ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েরা শুধু সুখের পায়রা। বঙ্কিমচন্দ্র হলে বলতেন, এরা বসন্তের কোকিল, গ্রীষ্ম-বর্ষার কেউ নয়। চাহালার বাংলোয় প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওরা যখন আটকে পড়েছিল, শুধু খিচুড়ি আর ডিমভাজা খেয়ে রাত কাটল, তারপরেও দুদিন বৃষ্টি থামল না তখন থেকেই ইন্দ্রাণী মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি ক্ষৌণীশের সঙ্গে কথাও বলেনি। “ক্ষৌণীশ আদর করে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে গিয়ে ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। পরিষ্কার বলেছে, ‘আয়াম নট আ বিচ ফর আ ডগ ইন দ্য রেইনি ডেজ।’ ইন্দ্রাণীর এই অস্বীকারটিই তার আত্ম-স্বীকারোক্তি। অবশ্যই অজ্ঞাত সারে। শেকৃসপীয়রের নাটকের একটি চরিত্র যেমন গাধার মুণ্ডু নিয়েই বলে উঠেছিল, সে কি সব গাধার মতো ভাবছে। যশিপুর বাংলোয় কলকাতা-জামশেদপুর মোটর র‍্যালি প্রত্যাগত চারটি মোটর সাইকেলে ছ’জন তরুণের মধ্যে পরিচিত সুখেনকে দেখে ইন্দ্রাণী মুক্তির আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিল এবং সুখেনের মোটর বাইকে চেপে কলকাতার পথ ধরেছিল। ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েদের দেহে প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদ যতদিন অক্ষত বা অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন সাহায্যের হাতের অভাব হবে না। তবে এদের শেষ ঠিকানা বোধহয় মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটে।

কলকাতা শহর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে, এখানে কেউ কারোর খবর রাখে না। "কিন্তু এ নগর সমাজে, সমাজ বলে কিছু না থাক, কোনো ক্ষেত্রে সমাজ যেন কোথা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সহসা তার গোয়েন্দা দৃষ্টি খুলে যায়। সারমেয় সুলভ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ওয়ে হঠে অতি তীব্র।" গুপ্ত প্রণয় তার শ্রেষ্ঠ শিকার। অতএব কৌণীশ যত সাবধানীই হোক ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তার বাড়াবাড়ির ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে তার স্ত্রী অমলার কানেও এসেছিল। কৌণীশ কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেনি যে, অমলা হল সেই জাতের মেয়ে যে নিজের সম্পর্কে অন্ধ বা অচেতন নয়। অধিকারের মধ্যেই স্ত্রীর যাবতীয় বিষয় সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন বদ্ধমূল ধারণা ওর ছিল না। নিজের রূপ যৌবনের চিন্তা থেকে ও মুক্ত ছিল না। সে ক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কে ওর একটা পরিষ্কার বোধ ছিল। "সে বোধটা হলো, সংসারে ওর চেয়ে সুন্দরী রূপসী আছে বিস্তর। কিন্তু সৌন্দর্য আর রূপ মানেই, ওৎ পেতে পুরুষ ধরা না। কিন্তু পুরুষ যে অন্যায় ক্ষমতা ভোগ করে, সেই ক্ষমতার দ্বারা তারা স্ত্রীকেও বঞ্চিত করে। অমলা জানতো কৌণীশ একজন সেই জাতেরই পুরুষ। কৌণীশ গুণী মানুষ। সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। ওকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী মুগ্ধ হয়, অন্তরে ঈর্ষা হলেও, অমলা অসহায়। এবং সমানই অসহায়, যদি কৌণীশ মুগ্ধ হয়। কেবল অসহায় না, কষ্টও অনিবার্য। সেই অসহায় কষ্টের মধ্যে একটা অপমান বোধের কাঁটা বিঁধেই থাকে। কিন্তু এই সমাজে এটাই বোধহয় অনিবার্য। অমলা এই পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল।" কিন্তু মানতে পারল না তখন যখন স্বামীর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর সম্পর্কটি সমাজে আলোড়ন তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার সহ্যের সীমাও অতিক্রম করল। তাছাড়া সুপ্রিয়ের স্ত্রী যখন তাকে জানাল যে, ইন্দ্রাণীর জন্য কৌণীশ তাকে পরিত্যাগও করতে পারে তখন সে পালটা আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হল।

"কৌণীশ ইন্দ্রাণীতে যতই মেতে থাকুক, অমলা নিতান্ত বুদ্ধিহীন ছিল না। ওর সঙ্গে অমলার একটা দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। দেহ সেখানে অনুপস্থিত থাকতো না। প্রায় নিয়মিত একটা যোগাযোগ ওদের ছিল। অমলা যতোদিন অন্ধকারে ছিল, ততদিন ও স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপরে ও আস্তে আস্তে কৌণীশের শয্যার অংশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, স্বামী তা খেয়াল করেনি।" অথবা খেয়াল করার মতো প্রয়োজন বা অবসর তার

ছিল না। কাজেই মমতা রায়চৌধুরীর কাছে কথাটা শুনে এবং স্বামীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে তার অধিকার রক্ষায় সচেতন হয়ে উঠল। সেই সচেতনতার অঙ্গ হিসেবেই স্বামীকে না জানিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুরী যাবার ব্যবস্থা করেছে। এবং এতোদিনে ক্ষৌণীশ জানতে পারল যে, সংসারের কোনো সম্পর্কই স্বতঃসিদ্ধ নয়। প্রতিটি সম্পর্ক বেঁচে থাকার জন্য সযত্ন মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। বিবাহিত স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দিয়েছি, ছেলে-মেয়ে দিয়েছি, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিচয় দিয়েছি, এটাই যথেষ্ট নয়। একটি রক্ত মাংসের মানুষ নিছক বেঁচে থাকার জন্যই আর একটি রক্ত মাংসের মানুষের অখণ্ড মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। দাম্পত্য জীবনের মূল কথা এটাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই দাম্পত্য জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করেছিলেন। শিল্পের দোহাই দিয়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যত হৈ-চৈ করি না কেন, সে দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র এক মহৎ সামাজিক দায়িত্বই পালন করেছিলেন। এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথও বিনোদিনীকে পূজারিনী সাজিয়ে এক বিধ্বংসী অগ্নিশিখাকে পূজারতির স্নিগ্ধ শিখায় রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েরা শুধু যে সংখ্যায় বেড়েছে তাই নয় তারা ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং তাদের প্রশ্রয় দাতাদের সংখ্যাও লক্ষণীয় রূপে বৃদ্ধিলাভ করেছে। ভোগমুখী উচ্চবিত্ত সমাজে এদের প্রয়োজনও বেড়েছে। কাজেই আজকের দিনের অমলাকে তার আত্ম-সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে এবং অমলা তা নিয়েছে। সে বিস্মিত, বিমূঢ় স্বামীকে নাম ধরে ডেকে বলেছে, "কিন্তু ক্ষৌণীশ বাবু, আমার কথা যতোই নাটকীয় শোনাক, বিশ্বাস কর, তোমাকে আর আমি স্বামী বলে ভাবিনে। বিশ্বাসও করিনে। বিচ্ছেদ আমাদের হয়ে গেছে। এখন আমি কি করবো, কোথায় যাবো না যাবো, সে সবই আমার নিজের ব্যাপার।" চোখের বালির আশাও একরাত্রে মহেন্দ্রকে স্বামী বলে ভাবতে, বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু সেদিন তার অবিশ্বাস শুধু তার অন্তরকেই বিদ্ধ করেছে, মহেন্দ্রের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। অমলা তার পাকাপাকি সিদ্ধান্তের কথাটা কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে। ক্ষৌণীশ যখন তার শ্রেণী চরিত্রের অহঙ্কার ও আস্ফালনের তূণ থেকে শেষ বাণটি প্রয়োগ করে অমলাকে বলেছে, "তোমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নিচ্ছে জানতে পারি?" শান্ত

অমলার হাসি উদ্ধত হয়ে কৌণীশের এই ব্রহ্মাস্ত্রটিকে ব্যর্থ করে দিয়ে বলেছে, "কেউ যদি নেয়ও তার কথা তোমাকে বলতে যাবো কেন? তবে আপাতত এ সংসারে আমার প্রাপ্য অধিকারেই আমি বাঁচবো।" তার জন্য যদি আমাকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়, হবো।" অমলার কথা শুনে স্বর্গ থেকে সূর্যমুখী বা আশা কি ভাবছে সে কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে।

চিত্রাঙ্গদা-শতবর্ষের আলোকে

শতাব্দীর সুদীর্ঘ কালসীমা অতিক্রম করে তাঁর কালের বসন্তগান অনাগত দিনের অজানা পাঠিকার প্রাণে প্রতিধ্বনিত হবে, রবীন্দ্রনাথের এই আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রিয় বাসনাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। ১৪০০ সালের (যথার্থ বিচারে, কবিতাটির রচনাকালের সময় ধরে, ১৪০২ সালের) পাঠিকা আনন্দিত বিস্ময়ে এবং সুবিপুল কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ব্যর্থ হয়নি কবির বার্তা, ঘটেনি কোনো কারণ কবির আশাভঙ্গের। সুদীর্ঘ কালসীমার এপারেও কবির কাব্যের মন্ত্রগুঞ্জরণ সমানে দোলা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের দক্ষিণ সমীরণের বুকে।

তবে একথা যদিবা বলি "রবীন্দ্রনাথ তো নামেই আছেন আমরা আছি বেঁচে", এ কথা কিছুতেই বলা যাচ্ছে না যে, "দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি এই আধুনিক বিনোদিনী মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।" এখানে সেকালের মহাকবিকে হার মানতে হয়েছে এ কালের মহাকবির কাছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিনোদিনীকে চিনতেন তাই নয়, চিত্রাঙ্গদার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে। চিত্রাঙ্গদার রচনাকাল ১৮শে ভাদ্র, ১২৯৯ সাল। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই রচনাটি আজও প্রাসঙ্গিক। শতবর্ষ পুর্বের চিত্রাঙ্গদা সর্বার্থেই সমকক্ষতা দাবী করেছে পুরুষের। শুধু নর্ম সহচরী রূপে নয়, মর্ম সহচরী রূপে পেতে চেয়েছে প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত দুঃসাহসের কথা। চিত্রাঙ্গদা অসমসাহসিকা এবং অত্যাধুনিকা।

সাহিত্য যুগের স্থষ্টি না স্রষ্টা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সে তর্কের গভীরে যেতে চাই না ; তবে একথা অবশ্যই বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ অনস্বীকার্যরূপেই যুগস্রষ্টা এবং সত্যদ্রষ্টা। সেদিনের পটভূমিকায় চিত্রাঙ্গদা কেবল কল্পনা, শুধু কল্পলোকের সত্য। এ দিনের পটভূমিকায় চিত্রাঙ্গদা প্রচণ্ডভাবে প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব। প্রামাণিক হয়ে উঠবে হয়তো আরো কিছুকাল পরে। সেদিন আমরা থাকব না। চিত্রাঙ্গদা থাকবে। থাকবে নারীমুক্তি ইতিহাসের এক অসামান্য

দলিল হয়ে, সত্যদ্রষ্টা কবির অসামান্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অবিনশ্বর অভিজ্ঞান হয়ে। 'শুধুমাত্র পুরুষের জন্য'—এই মরচে পড়া বিজ্ঞাপনপত্রটি আজ বহুক্ষেত্র থেকেই তুলে নিতে হচ্ছে। হারেমের লৌহকপাট ভেঙ্গে পড়ছে। মেয়েমানুষও যে মানুষ—এই ধারণাটি ক্রমেই বলবৎ হচ্ছে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের আসর ছেড়ে কোলাহল মুখরিত জীবনের পথে দৃপ্ত পদভরে হাঁটতে শুরু করেছে। চিত্রাঙ্গদার জয় হোক।

শতবর্ষ পূর্বের কালটিকে যখন ফিরে তাকাই তখন দেখি যে, বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হলেও নারীকে পুরুষের সমকক্ষ রূপে ভাবার মতো মন এবং সে কথা সরবে বলার মতো কণ্ঠ সেদিন নিতান্তই দুর্লভ। পুরুষের নর্মসহচরী রূপেই নারীর তখন যেটুকু আদর। সেই আদর পেতে হলে নারীকে রূপসী হতেই হয়। অন্যথা অনাদর তার বিধিলিপি। ১২৮২ সালে দেখছি গুণবতী ভ্রমরকে হার মানতে হয়েছে রূপবতী রোহিণীর কাছে। তারও তিনবছর পূর্বে সূর্যমুখী নীরব অভিমানে ঘর ছেড়েছে স্বামীর হাতে সাধের সদ্যফোটা কুন্দকলিকে তুলে দিয়ে। সেদিন পর্যন্ত নারীকে নীরবে চোখের জলই ফেলতে হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলার কথা ভাবা সেদিন পর্যন্ত নারীর নিভৃত স্বপ্নের পক্ষেও অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল। আশ্চর্যের এবং আনন্দের কথা এই যে, কয়েকটি বছরের ব্যবধানে চিত্রাঙ্গদার আবির্ভাব ঘটল আপন ভাগ্য জয় করার প্রতিজ্ঞাপত্র হাতে নিয়ে। সে সেবাদাসী নয়, পুরুষের প্রকৃত সহধর্মিনী হতে চায় সব অর্থে, সব কর্মে এবং সর্বদা।

সাহিত্যে এবং সমাজে নারীর পুষ্পপেলব কোমলতারই জয়গান। সেটা অকারণে নয়। পুরুষের স্বার্থরক্ষার তা এক প্রধান অস্ত্র, তার ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের এক সুচতুর কৌশল। রবীন্দ্রনাথ এমন এক নারীকে সৃষ্টি করলেন যার নয়নে কুসুমশর, হাতে ধনুঃশর। সে শুধু পুরুষের বাসরসঙ্গিনী হয়ে বাঁচতে চায় না, চায় তার যথার্থ সহধর্মিণী হতে। অবহেলা এবং অতিরিক্ত সোহাগ দুটোতেই তার সমান অনাগ্রহ ও অনীহা।

চিত্রাঙ্গদায় ফুল এবং ফলের কথা আছে। কল্পকথা নয়, যথার্থ কথা। যে গাছে ফুল ফোটে সেই গাছেই ফল ধরে। ফুলবতীর সঙ্গে ফলবতীর কোনো বিরোধ বা অসঙ্গতি নেই। মদনের ব্যাপারটা নেহাৎই রূপক। অথচ এই নিয়েই একদিন চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল বই কি! মেয়ে হয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, পুরুষের

সেবাদাসী হয়ে, বাসরসঙ্গিনী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে অস্বীকার করবে, পূর্বজাদের পন্থানুসরণে 'দৈবাগত দিনে ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি' নীরবে পথ চেয়ে থাকবে না, ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা যাঞ্চা করবে না, এর মধ্যে শ্লীল কোথায়? এ সবই ছোট মুখে বড়ো কথা। কাজেই অশ্লীল, ঘোরতর অশ্লীল। যে দেশের একলব্যদের গুরুদক্ষিণা দিতে হয় নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিসর্জন দিয়ে, অনধিকার শাস্ত্রচর্চা করতে গিয়ে এক শূদ্রকে প্রাণ দিতে হয় মর্যাদা-পুরুষোত্তমের হাতে, শুধু শয্যাকক্ষের একনিষ্ঠতায় নয়, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে মাথায় করে বারাঙ্গনার কাছে পৌঁছে দিয়ে নারীকে নিতে হয় সতীত্বের শিক্ষা সে দেশে সূর্যমুখীদের তবু মেনে নেওয়া যায়, চিত্রাঙ্গদাদের বিরুদ্ধে কথা উঠবেই। আজও ওঠে।

আশ্বাসের কথা এই যে, "যে তপস্যা সত্য তাকে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে" এবং "মরে না মরে না কভু সত্য যাহা বিস্মৃতির তলে।" সমকালের অন্যায় অবিচার মহাকালের বিচারালয়ে একদিন না একদিন নাকচ হয়েই থাকে। এইতো সেদিন এক অসামান্য বৈজ্ঞানিক সুদীর্ঘকালের অবিচারের হাত থেকে মুক্তি পেলেন মহামান্য যাজকের আদালতে। নারীরও যাজক হওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিল আর একটি ধর্ম সম্প্রদায়। নারী আজ আর শুধু সৌন্দর্যের পুত্তলিকা নয়, শক্তির প্রতিমা, তথাকথিত পুরুষোচিত প্রতিটি কর্মেই তার প্রশ্নাতীত প্রতিভা ও দক্ষতা। শক্তি ও সৌন্দর্যের মণিকাঞ্চন সংযোগেই চিত্রাঙ্গদার সৃষ্টি। অন্ততঃ ব্যাপারটাকে আমি এইভাবেই দেখি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে, চিত্রাঙ্গদা প্রদর্শিত পথেই আছে নারীর আপন ভাগ্য জয় করার অক্ষয় অধিকার।